ভারতবর্ষ ও ইসলাম

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

শঙ্কর প্রকাশন
১৫।১এ, যুগল কিশোর দাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ: ১৯৬০

শঙ্কর প্রকাশন ১৫।১এ, যুগল কিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে নিতাই মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬৩এ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদ: ইন্দ্র মুখোপাধ্যায় (শোভন)

বিষয় সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ ... ১

[ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও নরতাত্ত্বিক পরিচয়—অনার্য ও আর্য-ভাষীদের সম্পর্ক—ধর্মস্থান লুণ্ঠনের অভ্যাস ও তার কারণ—ধর্মের স্বরূপ ও সংজ্ঞা—এক হাতে শাস্ত্র আর এক হাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচার—ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত—ভারতীয় দৃষ্টান্ত-জাত কতকগুলি প্রস্তাব।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ... ২১

[ইসলামের উৎপত্তি, তাৎপর্য ও প্রসার—উমায়াদ ও আব্বাসিদ খলিফাদের আমল—মাহমুদ কর্তৃক আর্যাবর্ত চেতনার ধ্বংসসাধন ও সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ... ৩৭

[ইসলামীয় ধর্মসাধনার গূঢ় কথা—ভারতবর্ষে মরমী মুসলমান সাধকদের ধর্ম প্রচার।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ... ৫০

[বিদেশজাত ধর্মের আগমনে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিক্রিয়া।]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ... ৫৬

[বিদেশজাত ধর্মের আগমনে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে গূঢ়তর প্রতিক্রিয়া—ভক্তিবাদী আন্দোলন — লোকসত্য ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ... ৭৬

[ইসলামের আগমনে সৃজনশীল ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া—স্থাপত্য—চিত্র—সংগীত—ভাষা ও সাহিত্য।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ ... ৯১

[বাংলার পরিপ্রেক্ষিতের বিচার—লোকসত্য ও ব্রাহ্মণসত্য —ইসলামের আগমন ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব কর্তৃক বাংলার

লোকসত্যের পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—বাংলার লোকসাধনা।]

অষ্টম পরিচ্ছেদ .. ১১৫

[বহিরাগত ধর্মের প্রসঙ্গে কেরলের পরিপ্রেক্ষিত—ইসলাম প্রসঙ্গে রাজপুতানা বা রাজস্থানের দৃষ্টান্ত।]

নবম পরিচ্ছেদ ... ১৩৭

[ইংরেজদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও প্রথম জনউত্থান—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নতুন জমিদার শ্রেণী—ওয়াহাবী ও ফরাজী আন্দোলনের শ্রেণীগত রূপ।]

দশম পরিচ্ছেদ ... ১৫৩

[ইংরেজদের পক্ষ ও বিপক্ষ—১৮৫৭-র জন-অভ্যুত্থানের ধর্মীয় রূপ।]

একাদশ পরিচ্ছেদ ... ১৫৯

[রাজনৈতিক চেতনার জন্ম ও রামমোহন—ভারতীয় বোধের জন্ম ও কেশবচন্দ্র—আধ্যাত্মিক সমন্বয়বাদ ও রামকৃষ্ণ—জাতীয়তাবাদের জন্ম ও তার ধর্মীয় রূপ।]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ... ১৮৪

[হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও বিবেকানন্দ—বাঙালী মুসলিমের সমন্বয়বাদ ও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুত্ব সম্প্রদায়বাদ—হিন্দুত্বের প্রচারক ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ—সুরেন্দ্রনাথ ও কংগ্রেস গঠনের পশ্চাতে ব্রিটিশ-অভিসন্ধির ব্যর্থতা।]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ... ২০০

[ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠন প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন ও হিন্দু নেতাগণ—মুসলিম দুর্দশা ও সৈয়দ আহমদের প্রয়াস—আহমদের ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে পরিবর্তন—আলিগড় আন্দোলন ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ।]

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ... ২১৬

[ব্রিটিশ রাজনীতির চরিত্র ও স্বরূপ—বঙ্গভঙ্গ—জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতির সংযোগে মুসলিম লীগের জন্ম—সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার।]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ... ২৩৪

[হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ—মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা—ব্রিটিশ শাসকদের সুবর্ণ সুযোগ—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম ও বিস্তার—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্নোত্তর।]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ... ২৫৫

[মধ্যবিত্ত মানসিকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশক শরৎচন্দ্র—সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ও রাজনৈতিক শরৎচন্দ্র—ব্রিটিশ স্বার্থের অভীষ্ট সিদ্ধকারী শরৎচন্দ্র—নবীন সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ... ২৬৫

[কংগ্রেস লীগের চুক্তি—মণ্টফোর্ড রিপোর্ট—অসহযোগ আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার—সাইমন কমিশন ও সর্ব-দলীয় সম্মেলন—হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি—শিখ লীগের উৎপত্তি ও শিখ নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি—অনুন্নত শ্রেণীর নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি—সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ—১৯৩৫-এর আইন।]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ২৮৫

[ভারতীয় ইতিহাসের পর্ববিভাগ—ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ—ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদের বিভিন্ন রূপ—লোকসত্য হলো বিভেদকে স্বীকার করে সমন্বয়ের সাধনা—বিদেশী রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা—লোকসত্যের বিপরীতে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম ও বৃদ্ধি—লোকসত্যের থেকে বিচ্ছেদ এবং বিভেদের থেকে বিরোধের উৎপত্তি।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

[ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও নরতাত্ত্বিক পরিচয়—প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে ঐতিহাসিক পর্বে প্রসরণ—অনার্য ও আর্য-ভাষীদের সম্পর্ক—ধর্মস্থান লুণ্ঠনের অভ্যাস ও তার কারণ—ধর্মের স্বরূপ ও সংজ্ঞা—এক হাতে শাস্ত্র আর-এক হাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচার—ইয়োরোপের দৃষ্টান্তের সঙ্গে ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তের প্রতিতুলনা—ভারতীয় দৃষ্টান্ত-জাত কতকগুলি প্রস্তাব।]

প্রথমেই আসে ভারতের ভৌগোলিক সংজ্ঞা ও নামের তাৎপর্য অন্বেষণ। বর্তমান ভারতের সংবিধানের প্রথম বাক্যটি হলো, 'India, that is Bharat, will be a Union of States.' যার নাম ইণ্ডিয়া তারই নাম ভারত। যেমন যার নাম ইরান তারই নাম পারস্য, যার নাম আবিসিনিয়া তারই নাম ইথিওপিয়া। লক্ষ করার বিষয়, ভারতের সংবিধানের কোথাও একে ভারতবর্ষ বলা হয়নি। ভারত-ই বলা হয়েছে। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়—এক ভাগের নাম হয় ভারত, আর এক ভাগের নাম পাকিস্তান। তখনই ওই বিভাগ বা অঙ্গচ্ছেদ বোঝাবার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে 'বর্ষ' শব্দটা বাদ যায়, কাটাছাঁটা রূপের নাম হয় ভারত। অবশ্য আগেও ভারতবর্ষ শব্দটাকে ছোট করে ভারত বলা হতো, সুতরাং এটা কোনও সর্বৈব নতুন নামকরণ হলো না। এখন রাজনৈতিক অর্থে ভারতবর্ষের কোনও অস্তিত্ব নেই, যা আছে, ভাবগত ও ভৌগোলিক অর্থে-ই শুধু আছে। ভাবগত অর্থকে নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু ভৌগোলিক অর্থ টাকে সহজেই নিরূপণ করা যায়। তাছাড়া এব্যাপারে ভারতবর্ষ বিশেষ ভাগ্যবান। সব দেশের প্রাকৃতিক সীমারেখা থাকে না এবং পোল্যাণ্ডের মতো দেশকে প্রাকৃতিক সীমানার অভাবেই বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষ বলতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত মিলে হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র ভূখণ্ডকেই বোঝায়। বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত যে সীমারেখা তার ওপারে আফগানিস্তান, ইরান ও রাশিয়া। উত্তরের সীমারেখার ওপারে আছে নেপাল, তিব্বত, প্রভৃতি পার্বত্য দেশ। পূর্বের সীমা আসামের ওপারে চীন ও ব্রহ্মদেশ। বাকি সীমানা সমুদ্র দিয়ে সুনির্ধারিত। ভারতবর্ষের দক্ষিণে সিংহল এক বৃহৎ দ্বীপ। নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সিংহল ও ভারতবর্ষের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তা রাজ-

নৈতিক দিক থেকে আফগানিস্তানের মতোই মোটামুটি ভাবে স্বতন্ত্র একটা সত্তা বজায় রেখেছে। ১৫,৮১,৪১০ বর্গমাইল জুড়ে এই বিশাল দেশ। পুরাণ অনুসারে এই ভারতবর্ষ সাতটি দ্বীপের অন্যতম জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত এবং মর্তলোকের কেন্দ্রভূমি।

কেউ কেউ ভারতবর্ষকে হিন্দুস্তান বলে উল্লেখ করে থাকে। সংক্ষেপে এই উপমহাদেশকে হিন্দ্ বলাও হয়েছে এবং ভারতবর্ষের জয় অর্থে-ই প্রথম জয় হিন্দ্ ধ্বনির উৎপত্তি। মাত্র বিংশ শতাব্দীতেই ফারসী হিন্দুস্তান শব্দটা রূপান্তরিত হয় হিন্দী হিন্দুস্থান শব্দটিতে এবং কারও কারও কাছে হিন্দুস্থান শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের স্থান বা দেশ হিসেবে। অথচ হিন্দ্ বা হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান শব্দগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনও আবশ্যিক সম্পর্ক নেই।

হিন্দুস্তান বলতে দৃঢ় বা সংকীর্ণ অর্থে উত্তর ভারতকে বোঝায়, একদা যাকে আর্যাবর্ত বলা হতো। এই অঞ্চলের সন্তানরা ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই হিন্দুস্তানী। পরাক্রান্ত মুঘল বাদশাহদের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবদুল্লা খান ও হুসেন আলী খান নামে সয়ীদ ভ্রাতৃদ্বয় মসনদে কে বসবে না-বসবে তার নির্ধারক হয়ে ওঠেন—এঁরা সগৌরবে সর্বদা নিজেদের হিন্দুস্তানী বলে পরিচয় দিতেন, তাঁদের পরিচালিত গোষ্ঠী পরিচিত ছিল হিন্দুস্তানী গোষ্ঠী নামে এবং এই গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রভাবশালীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু হিন্দুস্তানী বলেই নিজেদের পরিচয় দিতেন। হিন্দুস্তানী গোষ্ঠীর প্রতিপক্ষরা তুরানী বা পরদেশী গোষ্ঠী নামে পরিচিত ছিল এবং তাদের নেতা ছিলেন চিন-কিলিচ-খান বা নিজাম-উল মুল্ক। স্পষ্টতই ভাগাভাগিটা ছিল স্বদেশী ও বিদেশী হিসেবে। পরে যখন নাদীর শাহ হিন্দুস্তান অভিযানে আসেন তখন তাঁর পক্ষভুক্তদের বা সৈন্যদের বলা হতো তুরানী। ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানে উভয় ধর্মাবলম্বী নেতারাই ভারতীয় অর্থে হিন্দুস্তানী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এইসব দৃষ্টান্ত অভ্রান্ত রূপে প্রমাণ করে যে হিন্দুস্তান শব্দটির কোনও ধর্মীয় তাৎপর্য নেই, যা আছে তা বিশুদ্ধ ভৌগোলিক তাৎপর্য।

হিন্দুস্তান বা হিন্দ্ শব্দটির মূলে আছে সিন্ধু নদ। 'স'-এর উচ্চারণ প্রাচীন পারস্যবাসীদের জিহ্বায় 'হ' হয়ে যায় যেমন 'প'-এর উচ্চারণ আরবদের জিহ্বায় হয় 'ফ' এবং তার থেকেই পারসী শব্দটি রূপান্তরিত হয় ফারসী-তে। পারসীরা সর্ব শক্তিমানকে বলত অহুর মাজদা—অহুর মানে দৈহিক বলে বলীয়ান আর মাজদা মানে বুদ্ধির তেজে দীপ্তিমান। ভারতীয়ের জিহ্বায় অহুর-এর 'হ' হয়ে যায় 'স' এবং তার থেকে আসে অসুর শব্দটা। এভাবেই সিন্ধু নদের তীরবর্তী

অধিবাসীরা অভিহিত হয় হিন্দু বলে। ইতিহাসের পরিহাসে আজকের যুগে ভৌগোলিক অর্থে যারা হিন্দু তারা রাজনৈতিক অর্থে পাকিস্তানী নামে পরিচিত। সিন্ধুর উচ্চারণ যেমন পারসীদের জিহ্বাতে হিন্দু হয় তেমনই গ্রীকদের জিহ্বাতে হয় ইন্দু এবং ইন্দু থেকেই ইণ্ডিয়া শব্দটির উৎপত্তি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 'দি হিন্দু ভিউ অফ লাইফ' বক্তৃতামালায় গোড়ার দিকেই স্পষ্ট করে বলে নিয়েছেন, 'The term "Hindu" had originally a territroial and not a credal significance. It implied residence in a well-defined geographical area.' অর্থাৎ সংকীর্ণ অর্থে হিন্দুস্তান মানে শুধু উত্তর ভারতকে বোঝালেও প্রকৃতপক্ষে শব্দটির আধারে সমগ্র ভারতবর্ষই বিধৃত। রাধাকৃষ্ণণের বিশ্লেষণ অনুসারে এই হিন্দুস্তানে প্রস্তরযুগীয় সভ্যতার মানুষ থেকে শুরু করে সুসংস্কৃত দ্রাবিড়, বৈদিক আর্য এবং আরও অনেক ভাষাভাষীর বাস।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি অস্ট্রিক, দ্রাবিড়ীয়, আর্য প্রভৃতি ভাষা-গোষ্ঠীগুলোর সমন্বিত উদ্যমের ফসল এবং এদের সমন্বিত ধর্ম-রূপটাই পরে হিন্দু ধর্ম বলে পরিচিত হয়; অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে একাধিক ভাষাগোষ্ঠীর ধর্ম-চিন্তার মিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু এই মিশ্রিত ধর্মে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য থেকে বোঝা যায় যে হিন্দু ধর্মের বিকাশে সংস্কৃতভাষী আর্যরাই নেতৃত্ব দিয়েছে, তবে এই নেতৃত্ব কোন মতেই তাদের একাধিপত্য প্রমাণ করে না। একালে যাকে হিন্দু সমাজ বলে সেই সমাজে সংঘটিত সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ও কৃষ্ণ বাসুদেবের সম্পর্কের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পিতা পরাশর ব্রাহ্মণ, মাতা সত্যবতী মৎস্যজীবী দাস বা দস্যু অর্থাৎ অনার্য কন্যা আর মাতামহী চণ্ডালকন্যা, পক্ষান্তরে কৃষ্ণ বাসুদেব বার্ষ্ণেয়-র পিতা বাসুদেব ক্ষত্রিয় আর মাতা দেবকী দস্যু বা অনার্য কংসের ভগ্নী। ব্যাস মানে যে-রেখা বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করে দুদিকের পরিধি স্পর্শ করে এবং ব্যাসদেব তো প্রকৃতপক্ষে সে-ই ব্যক্তি যিনি একদিকে আর্যদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বৈদিক তথা শ্রুতির মন্ত্রগুলোকে একত্রে সংকলন করে চতুর্বেদ লিপিবদ্ধ করেন, অন্য দিকে অনার্যদের মধ্যে প্রচলিত কথা-গাথা সংগ্রহ করে পুরাণ রচনার ধারা প্রবর্তন করেন, তদুপরি তিনি-ই কৃষ্ণ বাসুদেব বার্ষ্ণেয়-র শিক্ষা ও বাণীকে ভগবদগীতা রূপে মহাভারতের জটিল বিশাল দুর্গে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন। হিন্দু সমাজের ধর্মীয় আদর্শ এবং ধ্যানধারণা শ্রুতি স্মৃতি আর গীতার মধ্যেই সবচাইতে বেশি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট।

তাহলে হিন্দু বলতে আমরা সংক্ষেপে কী বুঝব? শুধু একটা ধর্মীয় সমাজ বা দৃষ্টিভঙ্গি বুঝব, না বিশেষ ভৌগোলিক অভিব্যক্তিতে বসবাসকারীদের বুঝব?

অদ্যাবধি ভারতবর্ষের সবচাইতে কার্যকর ইতিহাস গ্রন্থমালা হলো রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'দি হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচর অফ দি ইণ্ডিয়ন পীপল'—এই গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ড 'দি স্ট্রাগল ফর এমপায়ার'-এ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে; 'রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ফিলজফি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং লিখেছেন, 'In any case the term Hindu comes into general use during this period and it would be convenient to refer henceforth to the Indians, cther than Muslims, and their religion as Hindu. As is well known, Hindu, a modified form of Sindhu, was originally a georgraphical term used by the western foreigners to denote, first the region round the Sindhu river, and then the whole of India. The Indians, however, never called themselves by this name before the Muslim conquest. It was re-introduced after that event, with the added significance of a particular form of religious persuasion. Historically, therefore, "Hindu" really signifies the aggregate of peoples in India and their culture and religion, as distinguished from Muslims.' উদ্ধৃতিটির মধ্যে সত্য এবং অস্পষ্টতা দুটো-ই আছে। 'হিন্দু' বলতে তিনি একই সঙ্গে বোঝাচ্ছেন এমন এক জনসমষ্টিকে যারা এক বিশেষ ভূখণ্ডের অধিবাসী, যারা এক বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী এবং এক বিশেষ ধর্মের অনুসারী। কিন্তু মুসলিম বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন? মুসলিম বলতে বোঝাচ্ছেন শুধুই এক বিশেষ ধর্মের অনুসারীদের অর্থাৎ ভূখণ্ড ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গকে বাদ দিচ্ছেন। এটাই রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত বর্ণনার অস্পষ্টতা।

এবার প্রাচীন ভারতবর্ষের জনসমষ্টির রূপ কী ছিল তা দেখা যাক।

গ্রীক আলেকজণ্ডরের হিন্দুস্তানে আসার আগে দৈহিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে স্থানীয় জনসমষ্টির রূপ কী ছিল সে সম্বন্ধে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত জাতীয় সংহতি বিষয়ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর এক ভাষণ থেকে খুব সহজে ও সংক্ষেপে ধারণা করা যায়। 'We have in India, to start

with, the **Negritos**, probably the earliest people who came to India, and made this land their home. This was apart from some likely prehistoric autochthones, who are problematical. Then came the **Austrics** possibly a very clear offshoot of a Primitive Mediterranean people, who became charaterised within India as **Kols** (or **Mundas**) and **Mon-khemers** (including the Khasi and the Nicoborese). Then after them arrived the Dravidians, who are generally considered to be a branch of the Mediterranean race, but some hold them as having been of unknown origin, as a **Melanindian** or Black Indian People, finding home in India from prehistoric times. Then we have the Aryans of Indo-European origin, related to the Iranians.' প্রাচীন ভারতীয় জনসমষ্টির দৈহিক গঠন ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুনীতিকুমার 'কিরাত-জন-কৃতি', 'বল্‌ট্‌স্‌ অ্যাণ্ড এরিয়ান্‌স্‌', 'ইণ্ডিয়ানিজম', 'ইরানিয়ানিজম' 'ইণ্ডিয়া : এ পলিগ্‌লট্‌ নেশন' প্রভৃতি বইগুলিতে আরও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই জনসমষ্টিকে নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বর্তমানে চারটি সাধারণ ভাগে ভাগ করা যায়—নিষাদ, দ্রামিড় বা দ্রাবিড়, কিরাত বা ভারতবর্ষের মঙ্গোলীয় এবং আর্য।

প্রাচীনতম আর্য ভাষীদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থবোধক নামে ইয়োরোপে ও এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের কিউয়েলটই বা পর্যটক মানুষ, টিউটই বা বিবর্ধমান মানুষ, সেলেইনেস বা নৃত্যপরায়ণ মানুষ প্রভৃতি নাম কেল্ট, টিউটন বা ডয়েটশ্‌, হেলেনেস প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হয়। এই রকম একটি দল তাদের ভাষা অনুসারে শুধু আর্য বা আরিয় নামে উত্তর-পশ্চিম হয়ে ক্রমে ইরানে ও আরও দক্ষিণে এগোতে থাকে। এই জনগোষ্ঠীকে ইণ্ডো-ইরানিয়ান বলতে পারি এবং বেদে ও আবেস্তা-তে এদের দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার বলটিক উপসাগরের তীরবর্তী বলটদের লোকসংগীতের ভাব ভাষা ও ধ্বনির সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের ভাব ভাষা ও সংস্কৃত ধ্বনির গভীর সাদৃশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। স্পষ্টতই বলটিক উপসাগরের তীরবর্তী আর্যদের সঙ্গে সিন্ধু তীরবর্তী আর্যদের কোনও এক সময়ে নিকট আত্মীয়তা ছিল। অনুমান করা যায় দক্ষিণগামী আর্যরা কিছুকালের জন্যে ইরানে স্থিতি লাভ করে। কোনও এক সময়ে দৈব বা দেব এবং অসুর বা অহুরের পূজা নিয়ে

এদের মধ্যে মতভেদ হয়, ফলে তারা দুটি দল হয়ে যায় এবং একটা দল চলে আসে ভারতবর্ষে। যারা ভারতবর্ষে চলে আসে তারা দৈব বা দেবের পূজারী ছিল, কিন্তু তবু ঋগ্বেদের সবিতৃসূক্তে সূর্যকে অসুর বলা হয়েছে।• তবে সাধারণভাবে সংস্কৃত ভাষী বা ভারতবর্ষে আগত আর্যদের কাছে অসুর শব্দটা প্রীতি বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপক নয় এবং দেব বা দেবতার বিপরীত স্বভাব-দ্যোতক। তেমনই ইরানে দেব বা দয়েব ভীতি বা বিরাগের সঙ্গে জড়িত, দানবার্থে ব্যবহৃত এবং তার থেকেই 'ডেমন' শব্দটার উৎপত্তি। 'ইরানিয়ানিজম' গ্রন্থে সুনীতিকুমার নিশ্চয়তার সঙ্গে লিখেছেন যে এই মত পার্থক্যের আগে ভারতীয় আর্য আর ইরানী আর্য নিঃসন্দেহে একই জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসেবে একাত্মবোধ করত। পরশু বা পারশ্ব নামে কুঠারজীবী একটা সম্প্রদায় হিন্দুস্তানী জনসমষ্টির মধ্যে মিশে গেছে —এরা কোনও সময়েই একটা উল্লেখ্য সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কিন্তু ইরানে এই পারশ্বরা অর্থাৎ কুঠারজীবী বা কুঠারধারীরা একটা সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে ওঠে এবং এদের নামের ধ্বনি অনুসারে গ্রীকরা এদের বসবাসের স্থানকে পারসিয়া বলত। যেভাবে ইন্দুদের বাসস্থান ইণ্ডিয়া হয় সেভাবেই পারশ্বদের বাসস্থান হয় পারসিয়া যা আবার বাংলায় হয় পারস্য।

পারস্য বা ইরান থেকে আগত বৈদিক আর্যদের পরে বহু বিদেশী দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে, এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত করেছে, এখানকার আচার প্রথাকে পরিবর্তিত করেছে আবার নিজেরাও বহুদিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে, এখানকার বহু আচারপ্রথা স্বীকার করে নিয়েছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে এখানকার জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। এই বিদেশীদের অনেকেই ছিল আর্যভাষী, কিন্তু বিভিন্ন কোম, কুল, যূথ বা সম্প্রদায়ের সাধারণত বিভিন্ন নাম থাকত আর সেসব নামের বিশেষ বিশেষ অর্থও থাকত। যেমন মদ্র বলতে তাদের বোঝানো হতো যারা গর্বিত বা প্রমত্ত বা প্রফুল্ল; শব্দটা এসেছে গর্ব বা প্রফুল্লতা বোধক সংস্কৃত মদ শব্দ থেকে; মহাভারতে উল্লিখিত মদ্রদেশ হলো একালের পাঞ্জাবের উত্তরাংশ। শকরাও আর্যদেরই একটি শাখা অর্থাৎ আর্যভাষী; শক্ত বা শক্তিমান অর্থে শকরা নিজেদের পরিচয় দিত। বৈদিক আর্যদের আগেও ভারতবর্ষে আর্যদের কোন কোন শাখা এসে থাকতে পারে, কিন্তু তা প্রমাণ করা কঠিন। তাদের পরে আর্যদের আরও অনেক শাখা তো এসেইছে। কিন্তু বৈদিক আর্যরাই বোধকরি সর্বপ্রথম 'রিলিজিয়ন' অর্থে একটা সুস্পষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে এদেশে আসে।

ভারতীয় জনসমষ্টির মধ্যে কত বিভিন্ন ধরনের শোণিত সংমিশ্রিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নিষাদ, দ্রাবিড়, কিরাত প্রভৃতি জাতির অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, তাদের পরে এসেছে বৈদিক আর্যরা, এবং ঐতিহাসিক যুগে যবন গ্রীকরা এসেছে সৈনিকের বেশে, রোমানরা এসেছে বণিকরূপে, গুর্জর প্রতিহার কুষাণরা এসেছে, হূণরা এসেছে, আরব ও তুরস্কের সেমবংশোদ্ভূতরা এসেছে, আবিসিনিয়া ও ইথিওপিয়া থেকে হাবশী ও কাফ্রীরা এসেছে, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদীরা এসে কেরলের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গেছে, গোয়া ও সুন্দরবনের মতো সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে পোর্তুগিজ শোণিত এবং আরও পরে অন্যান্য ইয়োরোপীয় শোণিতও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ধমনীতে মিশে গেছে। এত বিভিন্ন ধরনের শোণিতের সংমিশ্রণের ফলে ভারতবর্ষের নরতাত্ত্বিক চিত্র খুবই বিভ্রান্তিকর। সেকালের সমাজতাত্ত্বিকরা অবশ্য এই পরিস্থিতির সরল সমাধান করেছিলেন বর্ণ প্রথা প্রবর্তন করে। তবে সে-সমাজ বিন্যাসে স্বভাবতই বুদ্ধিমানরা নিজেদের জন্যে সুবিধাজনক সংস্থান নির্দেশ করেছিলেন।

একটু আগেই বলেছি এবং একথা সর্বজনবিদিত যে বৈদিক আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। শুধু, হরপ্পা ও মহেনজোদরোতে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই প্রস্তর যুগীয় সভ্যতার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। অলচীন দম্পতী 'দি বার্থ অফ ইণ্ডিয়ন সিভিলিজেশন' বইটিতে যেসব স্থানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে বৈজ্ঞানিক রেডিও-কার্বন পদ্ধতিতে সেগুলির কাল-পরম্পরা নির্দেশ করে স্টুয়র্ট পিগটের আরব্ধ কাজকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ক্রমশ উন্নত রূপ অর্থাৎ তাম্র সভ্যতার রূপ লাভ করতে থাকে সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর রাজপুতানা বা রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে। বালুচিস্তান থেকে উত্তর রাজস্থান পর্যন্ত ভূভাগে এই সভ্যতা একটা পর্যায়ে উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। অলচীন দম্পতীর গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে প্রাক্-হরপ্পা যুগের জনপদগুলি বিদেশীদের আক্রমণের আশঙ্কাতে প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করা হতো এবং এর সব চাইতে স্পষ্ট প্রমাণ হলো কোটডিজি-র ধ্বংসাবশেষ। যাদের পরবর্তীকালে অনার্য নামে অভিহিত করা হয় তাদের উপর আক্রমণ ও আগ্রাসন আর্যদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। তা না হলে অনার্য জনপদগুলিকে প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত না এবং বিধ্বস্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষে আর্যদের' ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যেত না।

আমরি, কোটডিজি, কলিবঙ্গন প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আরও প্রমাণ করে যে প্রাক-হরপ্পা এবং মূল-হরপ্পা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে মসৃণ ধারাবাহিকতা ছিল। মনে হয় তখন থেকেই পিপুল-পত্র চিহ্ন, স্বস্তিক চিহ্ন, লিঙ্গপূজা, বৃক্ষপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতীক ও বিচার চলে আসছে। যোগীর মতো সমাসীন, মাথায় সাপের ফনার মতো লম্বা বাঁকানো শিঙ, চারপাশে নানারকম জন্তুজানোয়ার—এইরকম যে-দেবতার কল্পনা সেযুগের মানুষ করেছিল সেই দেবতা পরবর্তী যুগে পশুপতি বা মহাদেবে রূপান্তরিত হন এবং কালে কালে অনার্যদের শিব আর আর্যদের রুদ্র এক হয়ে যান। শব সংস্কারের প্রথার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য ছিল এবং যেভাবে তারা মৃতের প্রতি আহার্য প্রদান করত তাতে স্পষ্ট হয় যে এরা আত্মার পুনরাগমনে বিশ্বাসী ছিল—তার থেকেই পরে পুনর্জন্মবাদের উদ্ভব। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ যে বৈদিক আর্যদের ভারতবর্ষে আসার অনেক আগে থেকেই অনার্যদের একটা নিজস্ব ধর্মীয় জীবন ছিল। তার রেশ এখনও ভারতীয় সমাজের নিম্নতর স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। আবার বহু অনার্য আচার প্রথা উচ্চতর স্তরে চলে আসে, যেমন বসন্তের শুরুতে হোলি বা দোল খেলার প্রথা। বসন্তের আগমনে নিসর্গ জগতে নতুন জীবন সঞ্চারের রহস্য-চেতনার সঙ্গে নরনারীর সঙ্গমে গর্ভ সঞ্চারের রহস্য-চেতনা মিলে গিয়ে অস্ট্রিক ভাষীদের মধ্যে দোল উৎসবের প্রথা প্রবর্তিত হয়—দোল উৎসবের উৎস ও বিবর্তন সম্বন্ধে নির্মলকুমার বসু বিশদ আলোচনা করেছেন 'হিন্দু সমাজের গড়ন' বইটিতে। দোলের সময় সঙ্গমমূলক অঙ্গভঙ্গি ও সঙ্গমসংক্রান্ত ভাষা ব্যবহার করা সুপ্রচলিত।

যা হোক, ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতার উপর বিদেশীদের আক্রমণ চলতেই থাকে। পাথর বা ইঁটের তৈরি আমরি ও কোটডিজি ভস্মীভূত হয় বিদেশীদের অগ্নিসংযোগের ফলেই। চানহুদারো ও ঝুকরে বিদেশী আক্রমণের অকাট্য প্রমাণ মিলেছে, তবে মহেনজোদারোতে তার যে প্রমাণ মিলেছে তাকে পরোক্ষ সাক্ষ্য বলাই সমীচীন। এই বিদেশী কারা ছিল তা অনুমান করা সোজা। এসব স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির ভিত্তিতে ঋগ্বেদ পাঠ করলে তখনকার একটা সুসমঞ্জস ইতিহাস পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যদের আগে এখানের অধিবাসীর গায়ের রং ছিল কালো, নাক চওড়া, তারা শিশ্ন দেবের পূজা করত, দস্যু বা দাস নামে তারা উল্লিখিত হয়েছে, তারা বাস করত প্রাচীর বেষ্টিত জনপদে অর্থাৎ পুরে এবং নগর অর্থে পুর শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকেই সংস্কৃতে সংগৃহীত হয়। বৈদিক আর্যরা এই পুরগুলো ধ্বংস করেছিল বলেই তাদের সংগ্রামী

দেবতা ইন্দ্র পুরন্দর বা পুর ধ্বংসকারী নামে অভিষিক্ত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সঙ্গে ঋগ্বেদের বর্ণনা ও প্রার্থনা মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় যে প্রাচীনতর ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধ্বংস করার দিকে এবং পুরের অধিবাসীদের হত্যা করার দিকে বৈদিক আর্যদের প্রবল প্রবণতা ছিল— এসব কাজে তারা উল্লাস ও গৌরব বোধ করত। আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বৈদিক দেবতা অগ্নিকে বলা হয়েছে যে ইতস্তত ধ্বংসস্তূপগুলোতে একদা যারা বাস করত তারা অগ্নির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অন্যান্য স্থানে চলে গেছে। যারা এভাবে বৈদিক আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তাদের নাগরিক বাসস্থান-গুলো ত্যাগ করে চলে যায় তারা ভারতবর্ষের গভীরতর অঞ্চলগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করতে থাকে, কিন্তু আর পুর গড়ে তোলেনি সম্ভবত এই কারণে যে তাতে ধ্বংসকারী বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। অর্থাৎ সিন্ধু নদের উপত্যকা থেকে তাদেরকে উৎখাত করতে সমর্থ হলেও বিশাল ভারতবর্ষ থেকে তাদেরকে নির্মূল করতে বৈদিক আর্যরা সফল হয়নি। অধিকৃত জনপদে যারা থেকে যায় তারা বিজয়ীদের সেবাতে নিযুক্ত হয় এবং এইভাবে দাস শব্দটার অর্থান্তর ঘটে, সেবার জন্যে নিযুক্ত ভৃত্যের অর্থে দাস শব্দটার ব্যবহার হতে থাকে।

পুর-আশ্রিত সভ্যতা ধ্বংস করা যতটা সোজা ধর্ম-আশ্রিত সংস্কৃতি ধ্বংস করা অতটা সোজা নয়। বিজিতদের সংস্কৃতি অগোচরে খুব আস্তে আস্তে বিজয়ীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বৈদিক আর্যরাও অনুভব করে যে দাসদের ধর্ম-সংস্কৃতিকে সমূলে উৎপাটন করা অসম্ভব ব্যাপার এবং অধিকাংশের ধর্ম-সংস্কৃতিকে কিছু পরিমাণে স্বীকার করে নিলে তাদের উপর আধিপত্য রক্ষা করা সোজা। এব্যাপারে বৈদিক আর্যরা সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতার পরিচয় কতখানি দিয়েছে বলা কঠিন, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তারা বিলক্ষণ বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। এতে দাসদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদিক আর্যদের পক্ষভুক্ত হয়ে যায় এবং তাদের সাহায্যে বৈদিক আর্যরা গঙ্গার তীরে ধরে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে।

ভারতবর্ষ অভিযানে বৈদিক আর্যদের প্রধান সহায় ছিল ঘোড়া আর লোহা। তারা ঘোড়াকে পোষ মানাতে পারত আর লোহার ব্যবহার জানত। ভারতবর্ষে তারাই ঘোড়া নিয়ে আসে। সম্ভবত তারা তখনও ঘোড়ায় চড়তে শেখেনি, কিন্তু ঘোড়ায় টানা গাড়ি বা রথ যুদ্ধের সময় বৈদিক আর্যদের অধিকতর ক্ষিপ্রতা নিঃসন্দেহে জুগিয়েছিল। অনার্যরা হাতি ধরতে আর পোষ মানাতে জানত।

কিন্তু যুদ্ধের সময় হাতির চাইতে ঘোড়ার গতি ও ক্ষিপ্রতা অনেক বেশি কার্যকর। আলেকজণ্ডর আর পুরুর যুদ্ধের সময়ও দেখা গেছে যে হস্তী বাহিনীর চাইতে অশ্ব বাহিনীই বেশি সুবিধাজনক এবং উন্নত। অনার্যরা তামার ব্যবহার জানত, কিন্তু লোহার ব্যবহার জানত না। ঘোড়া ও লোহা বৈদিক আর্যদের সামরিক সাফল্যের একটা খুব বড় কারণ। পরবর্তীকালে তুর্কী আক্রমণের সময় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়—তুর্কীরা ঘোড়ার পিঠে জিনের সঙ্গে পাদানী বা রেকাব লাগাত এবং সেজন্যে পাদানীর উপর ভর দিয়ে অনেক জোরে হাতের অস্ত্র চালাতে অথবা এক হাতে অস্ত্র ও অন্য হাতে বিপক্ষের আঘাত ঠেকাতে পারত। আবার সমরোপকরণের শ্রেষ্ঠতার জন্যে বাবর অনেক সহজে ইব্রাহিম লোধীকে পরাস্ত করেন—মুঘল বাবরের সৈন্যবাহিনী বারুদের ব্যবহার জানত এবং বারুদের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দূর থেকে তারা লোধীর ভারতীয় বাহিনীর উপর ভয়ঙ্কর আঘাত হানতে পেরেছিল। একালেও দেখা যায়, সমরাস্ত্রে শ্রেষ্ঠতা দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্যের বিচার করা হয়।

সামরিক সাফল্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতার কোনও আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, তবে বিজিতরা যে বিজয়ীদের সংস্কৃতিকে অনুকরণে আগ্রহী হয় তার নিদর্শন একালে যেমন প্রচুর তেমনই সেকালেও। সাধারণভাবে বলা যায় যে অনার্যদের একটা বড়ো অংশই আস্তে আস্তে বৈদিক আর্যদের যাগ-যজ্ঞ দেব-দেবী ইত্যাদিকে মেনে নেয়। আর রামায়ণ থেকে জানতে পাই যে জনৈক ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রের কাছে বলেন, তাঁর পুত্র অকালে মারা গেছে, কারণ দেশের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গভীর অনাচার চলছে। এরপর রামচন্দ্র অনাচার অনুসন্ধান করতে দক্ষিণ দিকে এসে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তর পাশে এক বিশাল সরোবর দেখলেন, সেই সরোবর তীরে অধোমুখে লম্বমান তপঃপরায়ণ তাপসকে দেখে এগিয়ে গেলেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক নানা সম্ভাষণ করে তাঁর জাতি জানতে চাইলেন। যেই সেই উৎকৃষ্ট তপোনিরত তপস্বী নিজেকে শূদ্র বলে পরিচয় দিলেন অমনই রামচন্দ্র সুরুচিরপ্রভ বিমল খড়্গ নিষ্কাশিত করে শূদ্রের মস্তক ছেদন করলেন। শূদ্র নিহত হলে ইন্দ্র অগ্নি বায়ু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ সাধু সাধু বলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রশংসা করতে করতে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে শম্বুকের মতো আরও অনেকে বৈদিক আর্যদের তথা উচ্চ বর্ণের অনুকরণে আচার-তপস্যা করে বিজয়ীদের সন্তোষ বিধান করতে চেয়েছিল, কিন্তু শম্বুকের আকাঙ্ক্ষা ছিল বড়ো বেশি, সে একেবারে সশরীর প্রবেশ করতে চেয়েছিল আর্যদের দেবলোকে। এই আকাঙ্ক্ষা স্পর্ধারই

নামান্তর। কিন্তু উচ্চবর্ণ বা আর্যদের পক্ষে সহনীয় এরকম অনেক অনুকরণ যে শূদ্ররা বা বিজিত অনার্যরা করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। যে-অনার্যরা পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল তারাই সংখ্যায় বেশি বলে মনে হয় এবং আধুনিক কাল পর্যন্ত তারা নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়ে তাদেরকে বরাবরই ভারতীয় সমাজের নিম্নতর স্তরে পড়ে থাকতে হয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রেও সাধারণ সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত থাকতে হয়েছে।

রামচন্দ্রের কাছে যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের সমান হওয়ার জন্যে নিম্নবর্ণের আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে তেমনই বুদ্ধদেবের কাছে আর্য-সমাজের বহু বিচারই ঘোর নিন্দার যোগ্য বিষয় বলে মনে হয়েছে। ধম্মপদ-গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হলেই বা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ঘরে জন্ম নিলেই কাউকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না, কারণ সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয় তাহলে সে আসলে ভোবাদী হবে অর্থাৎ ভো, ভো, আমি ব্রাহ্মণ এরকম কথা বলবে। প্রথম পর্বে মুখ্যত আক্রমণকারী ও আগ্রাসী হিসেবে ভারতবর্ষে এসে বৈদিক আর্যরা যেসব ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিচার, ধারণা ও সংস্কার প্রচলন করেছিল সেসবের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্য ও দর্শন একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ এবং একটা পর্যায়ে সে-বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতবর্ষে। কিন্তু বৈদিক আর্যরা এক সময় যে-কৌশলে প্রাচীনতর তথা অনার্য ধর্ম-সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছিল সেই কৌশলেই আস্তে আস্তে বিদ্রোহের থেকে উদ্ভূত মনোভঙ্গি এবং তার ধর্ম-সংস্কৃতিকে গ্রাস করে। অগত্যা পুনরুত্থিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্যের ক্ষেত্র থেকে বৌদ্ধ ধর্মকেই অপসরণ করতে হয় ভারতবর্ষের দুর্গম পূর্বাঞ্চলে এবং এই এলাকাতে বহুকাল পর্যন্ত বৌদ্ধ জীবনধারা আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। একটা সময়ে বাংলায় আসার কথা বৈদিক আর্যরা আদপেই কল্পনা করতে পারত না এবং বাংলায় যাতে কোনও সাহসী অভিযাত্রীদের দল না এসে পড়ে সেজন্যে এদিকে আসা সম্বন্ধে তারা অনেক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বৈদিক আর্যদের রক্ত বাংলায় কতটা প্রবেশ করেছে বলা কঠিন কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আদিশূরের আগে থেকেই বৈদিক আর্য ধর্ম অনুপ্রবেশ করতে থাকে। সুতরাং পূর্বাঞ্চলেও বৌদ্ধ জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল ভাবা ভুল হবে। নালন্দা, সোমপুর, ময়নামতী প্রভৃতি মহাবিহারগুলোর গঠন-বিন্যাস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে এইসব ধর্মস্থানগুলোকে অনার্য পুরগুলোর মতোই দুর্গের ধরনে প্রাচীর পরিখা ঘিরে

সুরক্ষিত করা হতো। মেগাস্থিনিস নালন্দা মহাবিহারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা একটা দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত দুর্গেরই বর্ণনা। তুর্কীরা দুর্গ বলে ভুল করেই নালন্দা ধ্বংস করেছিল। অবশ্য ময়নামতী ধ্বংস হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের হাতে। ভোজবর্মার বেলাবলিপি থেকে জানা যায় যে পরম বিষ্ণুভক্ত জাতবর্মা সোমপুরের মহাবিহার ধ্বংস করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলোও একটার পর একটা প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করা হতো এবং প্রাচীরের দরজাকে বলত গোপুরম। দুর্গের চাইতেও বেশি দুর্ভেদ্য করে মন্দির গঠন-প্রণালী এটাই নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভারতীয় ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে প্রবেশ শুরু করার অনেক আগে থেকেই বিহার বা মন্দির নির্মাতারা স্বদেশীয় আক্রমণকারী ও লুণ্ঠনকারী সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত থাকত এবং তাদের প্রতিরোধ করার জন্যে ধর্মস্থানগুলিকে দুর্গের মতো প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করত। এছাড়া বিহার ও মন্দিরকে দুর্গের মতো সুরক্ষিত করার অন্য কোনও ব্যাখ্যাই করা যায় না। একথা সত্য যে এটা পরোক্ষ প্রমাণ। কিন্তু কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' থেকে জানা যায় যে কাশ্মীরের হিন্দু রাজারা পররাজ্য জয় করার সময় বিজিত রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করে ধনসম্পদ লুঠ করত। তবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে প্রাচীনকালে মঠ-মন্দির ধ্বংস করা সম্বন্ধে লিখিত প্রমাণ খুবই নগণ্য। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে সমকালীন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার প্রথা তখনও প্রচলিত হয়নি এবং এই প্রথা তারাই ভারতবর্ষে প্রচলন করে যারা বৈদিক আর্যদের ভারত-জয়ের প্রায় আড়াই হাজার পরে বিদেশী ধর্ম নিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। সুতরাং সে-যুগের এক-আধটা ঘটনার উল্লেখও বহুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত বহন করে। সেই সব উল্লেখের সূত্র ধরে সহজেই অনুমান করা যায় যে পরিখা-প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত ধর্মস্থানগুলির উপর প্রতিবেশী রাজা-মহারাজাদের লোলুপ দৃষ্টি থাকত। এই ধর্মস্থানগুলিতে দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের ধনসম্পদ জমা রাখত অথবা ধর্মস্থানগুলি ছিল স্বকীয় মাহাত্ম্যে দেশের প্রধান ধনাগার। হরিণ যেমন নিজের মাংসের গুণে শিকারীকে প্রলুব্ধ করে তেমনই এই ধর্মস্থানগুলিও ধনাগার রূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে পরাক্রান্ত পুরুষদের প্রলুব্ধ করত এবং এর ফলে ধর্মস্থান ধ্বংসের সঙ্গে ধর্মবিদ্বেষের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা অন্ধ সংস্কার-প্রণোদিত হয়ে যায়, তার পেছনে বাস্তবতার সমর্থন নেই।

একথা ভাবাও ভুল যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ধর্মীয় অথবা সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধরা কিংবা তামিল দেশে

জৈনরা যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শিকার হয়েছে তার লিখিত প্রমাণ সুলভ। স্বয়ং রামানুজকেও সশিষ্যবৃন্দ শ্রীরঙ্গম ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল, কারণ তাঁর উদার মতামত দেশের রাজার কাছে প্রাণদণ্ডের যোগ্য ভয়ঙ্কর অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই গৌরবময় প্রাচীন যুগেও ধর্মের নামে ভেদাভেদ ছিল—এই ভেদাভেদকে দূরীকরণের একটা প্রক্রিয়া ছিল বটে, কিন্তু অনুচ্চ ভেদাভেদকে উচ্চে নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তও ছিল।

বৈদিক আর্যধর্ম প্রবেশের পর থেকে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ পর্যন্ত মধ্যের আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে বহুতর ধর্মীয় বোধ ও বিশ্বাস উদ্ভূত হয় এবং পারস্পরিক ভেদাভেদ সত্ত্বেও এগুলির মধ্যে সমন্বয়ের একটা সাধনা চলতেই থাকে—সবগুলো ধর্মীয় পন্থার মধ্যে যদি পরিপূর্ণ ঐক্যমত থাকত তাহলে সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠতই না অর্থাৎ সমন্বয়ের প্রয়াসটাই ভেদাভেদের সব চাইতে বড়ো প্রমাণ। অস্বীকার করার উপায় নেই যে মধ্যবর্তী আড়াই হাজার বছরে ভারতীয়তার একটা ধর্মভিত্তিক সংজ্ঞা দাঁড়িয়ে যায় আর স্বাভাবিক কারণেই ভারতবর্ষের সেই ধর্মীয় বোধ বা চেতনা ছিল সম্পূর্ণতই মিশ্র প্রকৃতির। যদি সেকালে আধুনিক অর্থে জাতি বা 'নেশন' শব্দটির ব্যবহার থাকত তাহলে ওই মিশ্র প্রকৃতির ধর্মাবলম্বী সকলেই ভারতীয় জাতি বলে অভিহিত হতো। আবার এই মিশ্র প্রকৃতির ভারতীয় ধর্মকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধারাটাই সব চাইতে প্রশস্ত ও দীর্ঘ।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিধানগুলি মূলতম মনুস্মৃতি আশ্রিত। মনুতে বলা হয়েছে, কোনও অদ্বিতীয় নীরক্ত নিষ্প্রাণ পুঁথি নয়, কোনও একজন মাত্র মানুষের আদেশ বা প্রত্যয় বা প্রত্যাদেশ নয়, সমস্ত মানুষের যা আচার তা-ই পরম ধর্ম—আচারঃ পরমঃ ধর্মঃ। ধর্মের এই সংজ্ঞা নিরূপণের পেছনে আশ্চর্য বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের আচার অনাদ্যন্ত নয়, শাশ্বত নয়, দেশ-কাল-পাত্র থেকে নিরপেক্ষও নয়—দেশে দেশে কালে কালে পাত্রে পাত্রে তার ভেদাভেদ অবশ্যম্ভাবী, একই দেশে দু রকম আবার একই দেশে কালে দুটি পাত্র-গোষ্ঠীর মধ্যে দু রকম আচার হতেই পারে।

সুতরাং আচারের বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও বিভিন্ন হতে বাধ্য। ধর্মে ধর্মে অবিরোধ বা সুসামঞ্জস্য একটা আদর্শ অবস্থা হতে পারে, কিন্তু আদর্শ অবস্থা আর বাস্তব অবস্থা এক নয়। দেশ-কাল-পাত্রের প্রয়োজন অনুসারে কিংবা সামাজিক শান্তির প্রতি অধিকাংশ মানুষের স্বভাবজ আকর্ষণে অথবা বৃহত্তর মনুষ্যধর্মের দাবিতে ধর্মে ধর্মে সংগতি বা সংহতি রক্ষা করা যায়, কিন্তু তা দিয়ে

আলাদা করে কোনও ধর্মের সর্বগ্রাহিতা বা সর্বসহিষ্ণুতা প্রমাণিত হয় না। মহাভারতের বনপর্বে ধর্মে ধর্মে অবিরোধিতাকে কল্পনা করা হয়েছে ঈপ্সিত বা আদর্শ অবস্থা হিসেবে। কিন্তু সে আদর্শ অবস্থার কল্পনা ভেঙে গেছে কুরুক্ষেত্রে, অতঃপর যুদ্ধের শেষে শান্তিপর্বে স্বীকার করা হয়েছে, 'ন হি সর্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সম্প্রবর্ততে। তেনৈবান্যাঃ প্রভবতি সোঽপরং বাধতে পুনঃ।।' সকলের পক্ষে হিতকর এমন কোনও ধর্ম কখনই প্রবর্তিত হয় না, যা প্রবর্তিত হয় তা অপরের আচরণে বাধা দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এভাবেই অনার্য আচরণে বাধা দিয়ে আর্যধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছে, আবার ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যকে খর্ব করে বৌদ্ধ ধর্ম একদা প্রভাব বিস্তার করেছে। মনে রাখা দরকার যে এভাবে প্রভাব বিস্তারের কালে প্রভাবশালী ধর্মও পরাস্ত ধর্ম দিয়ে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে—আর্য ধর্ম যখন এভাবে অনার্য ধর্ম দিয়ে প্রভাবিত হলো তখন অনার্য ধর্মের আচার-সংস্কারকে নিজ ধর্মের অঙ্গীভূত করল আর তার প্রতিফলন দেখা গেল প্রাচীন পুরাণে ও মহাকাব্যে ; পরে যখন বৌদ্ধ ধর্ম দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত হলো তখন তার প্রতিফলন দেখা গেল বৃহদ্ধর্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ, তন্ত্রসার, মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে। প্রাচীনতর অনার্য ধর্ম ও পরে বৌদ্ধ ধর্মর বহু অঙ্গকে গ্রহণ করার ফলে আর্য ধর্মর সংজ্ঞা ও সীমানা আরও প্রসারিত হলো। পরবর্তীকালে যা হিন্দুধর্ম বলে অভিহিত হয় তা ওইসব শাখা-প্রশাখাতে বহু বিস্তারিত আর্যধর্মেরই এক অনির্দেশ্য অবয়ব—প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা মনোবৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট শাস্ত্রের আধারে বিধৃত নয়।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ধর্ম বলতে কী বোঝেন সে-সম্বন্ধে একটা ধারণা উপরে দেওয়া হলো। কিন্তু সে ধারণার সঙ্গে অন্যান্যধর্মাবলম্বীদের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা পুরোপুরি মেলে না। 'দি কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারি' গ্রন্থে ধর্মের প্রচলিত অর্থ দেওয়া হয়েছে, 'One of the prevalent systems of faith & worship. Human recognition of superhuman controlling power and esp. of a personal God entitled to obedience, effect of such recognition on conduct & mental attitude. Action that one is bound to do.' রুশ ভাষায় রচিত ও ইংরেজীতে অনূদিত 'এ ডিকশনারি অফ ফিলজফি'তে ধর্মের যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার সংজ্ঞাত্মক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—'A fantastic reflection in people's minds of external forces dominating over them in everyday life, a reflection in which earthly forces assume non-earthly

forms. From the theological point of view (which philosophical idealism attempts to justify) Religon is linked with the eternal inner feeling of man, expressing his connection with some spiritual principle. Religion is a specific form of social consciousness, characterised by a unity of world outlook, feelings, and cult (ritual-magic ceremonies). The basic and and decisive feature of Religion is belief in the supernatural.' আরও দেখা যায় যে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মের একজন প্রবক্তা থাকে এবং অধিকাংশ ধর্মের একটি অবশ্যমান্য শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সেই গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক ধর্মের মূল সত্য ও সূত্র লিপিবদ্ধ থাকে।

আর্যধর্মের পরে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকে উপরে বর্ণিত ধারণা অনুসারী প্রথম যে-ধর্ম একটা সুনির্দিষ্ট অবয়ব নিয়ে এদেশে এল তা হলো ইসলাম ধর্ম। বৈদিক আর্যধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ভারতবর্ষে এসেছিল অনেকটা সেইভাবেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও এখানে আসে। তবে বৈদিক আর্যধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভারতবর্ষে বসবাসকারী বিভিন্ন অনার্যধর্মাবলম্বীদের প্রথম পরিচয় ধ্বংস ও সংঘাতের মাধ্যমেই হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু ইরানী আরব তুর্কী প্রভৃতি মধ্য ও পশ্চিম প্রাচ্যের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অনেক আগেই তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটে ভিন্নতর মাধ্যমে। তাছাড়া তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং ভারতবর্ষে মুসলিমদের সশস্ত্র অভিযানগুলো শুরু হওয়ার আগেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী বণিকরা ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে, বিশেষত কেরলে, একটা নিজস্ব সমাজ গড়ে তুলেছিল। যেমন মুসলিম সৈনিকদের অভিযান শুরুর আগেই মুসলিম বণিকদের আসা-যাওয়া শুরু হয় তেমনই উত্তর ভারতে মুসলিমদের প্রথম অনুপ্রবেশ নিরস্ত্র ও প্রেমিক সুফী সাধুসন্তদের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায়। সে-ইতিহাস বিশদ ভাবে যথাস্থানে আলোচিত হবে। স্থানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস সাধনের ব্যাপারে পরবর্তীকালে সৈনিকের বেশে আগত বিদেশী মুসলিমরা মোটামুটিভাবে বৈদিক আর্যদের পদাঙ্কই অনুসরণ করে। তবে অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্যে আর্যরা যতখানি সাফল্য দাবি করতে পারে মুসলিম যোদ্ধারা ততখানি সাফল্য দাবি করতে পারে না।

এটা একটা প্রচলিত ধারণা যে এক হাতে কোরান অন্য হাতে কৃপাণ

নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়েছে। এই ধারণাটা কতখানি সত্য তার বিচার একেবারে নতুন করে করা বিশেষ প্রয়োজন, এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল, কিন্তু উল্লিখিত বড়ো বড়ো শহরগুলো বাদ দিলে ওই সব কেন্দ্র সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে মুসলিমদের সংখ্যার চাইতে কেন্দ্রের থেকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে যেমন সিন্ধুতে, কেরলে, বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যা সর্বদা গরিষ্ঠ আকার লাভ না করলেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আকার লাভ করেছে। মুসলিম শক্তির মূল কেন্দ্রের থেকে বহুদূরে অবস্থিত ওইসব অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রচার কী করে এবং কেন হলো? এ প্রশ্নের সদুত্তর একহাতে কোরান অন্য হাতে কৃপাণের তত্ত্বের সাহায্যে দেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ওই তত্ত্বের উদ্‌গাতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ঐতিহাসিকরা নন, তারাই তত্ত্বটির উদ্‌গাতা যারা হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদে লাভবান হয়েছে সবচাইতে বেশি। তবে এক হাতে শাস্ত্র অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচার কাকে বলে তা জানতে হলে ধর্মীয়তার কঠোরতম সমালোচক ও স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক ইয়োরোপীয়দের অন্তরঙ্গ ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার।

একটা ব্যাপার প্রথমেই চোখে পড়া উচিত: ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচারের আগে ভারতীয়দের যেমন কতকগুলো নিজস্ব ধর্মমত ছিল, যেগুলোকে ইসলামের আগমনের পরে সম্মিলিত ভাবে হিন্দু ধর্ম বলা হয়, তেমনই ইয়োরোপে, খ্রীস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আগে কতকগুলো নিজস্ব ইয়োরোপীয় ধর্মমত ছিল এবং সেগুলোকে সম্মিলিতভাবে পেগান ধর্ম বলা হতো। দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের অধীনে থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসী, এমনকি মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্রগুলির অধিবাসীও, হিন্দুই থেকে যায়, কিন্তু ইয়োরোপে পেগান ধর্মের বিরুদ্ধে এমন সর্বব্যাপী অভিযান চালানো হয় যে পেগান ধর্মাবলম্বী ইয়োরোপীয়দের চিহ্নমাত্র রাখা হয়নি। মুসলমানরা যদি সত্যিই এক হাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচারের অভিযানে নামত তাহলে ইয়োরোপের মতো ভারতবর্ষেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চিহ্নমাত্র থাকত না।

খ্রীস্টান কনস্টানটাইনের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের ঠিক দশ বছর আগে এডিক্ট অফ টলারেশন-এ বলা হয়েছিল যে ধর্ম একটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যাপার এবং কোনও বিশেষ ধর্ম রক্ষা বা গ্রহণের ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু যেদিন থেকে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শক্তি যুক্ত হলো সেদিন থেকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি বর্জিত হলো। যে ব্যক্তি খ্রীস্টান নয় তার কোনও সদ্‌গুণকেই

আর সদ্‌গুণ বলে গণ্য করা হলো না এবং অগ্রীস্টানরা সাধারণ অপরাধীদের চাইতে বেশি অপরাধী বলে অভিযুক্ত হতে লাগল। এমনকি দীক্ষা গ্রহণের আগেই অকালমৃত শিশুদের ভবিষ্যৎ কল্পনা করা হলো যে তারা নরকের মেঝেতে অনন্তকাল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে। চার্চের যাজকদের মধ্যে সবচাইতে শ্রদ্ধেয় যাজক সন্ত অগস্টাইন সবাইকে গ্রীস্টধর্মের অধীনে আসতে বাধ্য করার নীতির প্রবক্তা। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি তৃতীয় ইনোসেণ্ট প্রধান ধর্মযাজক হন এবং তাঁরই আমলে শুরু হয় অগ্রীস্টানদের থেকে ইয়োরোপকে মুক্ত করার অভিযান। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের একজন বড়ো ভূস্বামী ছিলেন কাউণ্ট তুলোস এবং তাঁর প্রজারা অলবিজোয়া নামে অভিহিত হতো। কী করে সশস্ত্র অভিযানে অগ্রীস্টান অলবিজোয়াদের বিধ্বস্ত করা হয় তার বিবরণ জে. বি. বিউরি দিয়েছেন, 'এ হিস্টি, অফ ফ্রীডম অফ থট' গ্রন্থে। এই অভিযানে নারী ও শিশুদেরও হত্যা করা হয় ধর্মীয় উল্লাসে। ১২২৯ গ্রীস্টাব্দে কাউণ্ট অফ তুলোসের শোচনীয় পরিণাম থেকে প্রমাণিত হয় যে একজন রাজার রাজা হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারিত হবে রাজ্য থেকে অগ্রীস্টানদের নির্মূল করার সম্মতিতে ও সামর্থ্যে এবং যে-রাজা অগ্রীস্টানদের আপন রাজ্য থেকে উৎখাতে সম্মত ও সমর্থ হবে না তার রাজা হওয়ার কোনও যোগ্যতা বা অধিকার নেই।

১২৩৩ গ্রীস্টাব্দে প্রধান ধর্মযাজক নবম গ্রেগরির আইন মোতাবেক সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপ জুড়ে অগ্রীস্টানদের খুঁজে বের করার অভিযান শুরু হয়। অগ্রীস্টানদের অনুসন্ধানের এই প্রথা ইনকুইজিশন নামে কুখ্যাত। স্বাধীন চিন্তাধারার পরিপোষক হিসেবে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক পরিচিত, কিন্তু তিনিও ১২২০ থেকে ১২৩৫ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইটালী ও জার্মানীর জন্যে কতকগুলি আইন প্রবর্তন করেন—এই আইনগুলোতে বলা হয় যে গ্রীস্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যারা একমত নয় তারা আইন বহির্ভূত ব্যক্তি, তারা যদি গ্রীস্টধর্ম গ্রহণ না করার জন্যে অনুতপ্ত হয় তাহলে তাদের বন্দী করে রাখা হবে আর যারা অগ্রীস্টান হওয়ার দোষ বুঝতে পারবে না তাদের পুড়িয়ে মারা হবে। তৎকালীন পরিবেশে অগ্রীস্টানদের না মেরে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থাই ধর্মীয় উদারতার পরাকাষ্ঠা। ১২৫২ গ্রীস্টাব্দে চতুর্থ ইনোসেণ্টের যাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে প্রত্যেক নগর ও রাষ্ট্রের সামাজিক ও পৌর সংগঠনের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে অগ্রীস্টানদের নির্যাতন ও হত্যা করার নীতি প্রবর্তিত হয়। অবশ্য চার্চ বা যাজকরা নির্যাতন বা হত্যাটা স্বহস্তে করত না, কে গ্রীস্টান কে অগ্রীস্টান সেটা বিচারের পরে অপরাধীকে তুলে দেওয়া হতো রাষ্ট্রীয় বা পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে।

জলভর্তি বিশাল কড়াইয়ে ফেলে সেই জল আস্তে আস্তে ফুটিয়ে অপরাধীকে হত্যা করার নজিরও আছে, তবে সরাসরি আগুনে পুড়িয়ে মারাটাই ছিল অখ্রীস্টানদের শাস্তি দেওয়ার সবচাইতে ব্যাপক প্রচলিত প্রথা। কেননা এতে রক্তপাত হতো না এবং রক্তপাত খ্রীস্টান ধর্মকর্তৃক অনুমোদিত ব্যাপার নয়।

অনেকের ধারণা রিফর্মেশন ধর্মীয় ব্যাপারে উদার চিন্তাধারার স্বপক্ষে। কিন্তু এই ধারণাটা একেবারে ভ্রান্ত। আগে চার্চের বিচার ও বিধানকে অকাট্য, অমোঘ ও অবশ্যমান্য বলা হতো; রিফর্মেশন চার্চের বা যাজকদের জায়গাতে শাস্ত্র অর্থাৎ বাইবেলকে বসাল, বলা হলো যে বাইবেলে যা আছে তা-ই অকাট্য, অমোঘ ও অবশ্যমান্য। যতদিন মার্টিন লুথারের ভয় ছিল যে যাজকদের বিরুদ্ধতার জন্যে তাঁকে সদলবলে পুড়ে মরতে হতে পারে ততদিন তিনি শক্তি-প্রয়োগ ও দাহপ্রথার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু যখন নিজে শক্তিশালী হলেন তখন প্রকৃত মতামত প্রকাশ করে বললেন, প্রকৃত ধর্মমত গ্রহণে প্রজাদের বাধ্য করা রাষ্ট্রের কর্তব্য, প্রজাদের কর্তব্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পালন করা এবং বাইবেল-প্রোক্ত ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক ভাবে দেখার কথা যারা বলেছিল সেই অ্যানাব্যাপটিস্টদের কৃপাণের অধীনে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর জন ক্যালভিন ধর্মরাষ্ট্রের তত্ত্ব খাড়া করেই ক্ষান্ত হননি, সমস্ত রকম মত পার্থক্য নির্মূল করে জেনেভাতে তিনি ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

বাইবেলের সত্য থেকে ভিন্ন সত্য উচ্চারণ করা ছিল মৃত্যুদণ্ডাদেশের যোগ্য অপরাধ। মাইকেল সার্ভেতুস বিখ্যাত ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ অধিকারের জন্যে, তবে ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল এবং টলেমির ভূগোল তিনি সম্পাদনাও করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির অন্যতম ছিল, তিনি জুডিয়াকে বন্ধ্যা দেশ বলেছেন, এটা বাইবেলকে মিথ্যা বলার মতো ঘোর পাপ, কেননা বাইবেল বলেছে যে জুডিয়াতে দুধ ও মধুর নদী বয়। ক্যালভিনের আদেশে সার্ভেতুসকে বন্দী করা হয় ও ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দে পুড়িয়ে মারা হয়। ইটালীয় দার্শনিক জোরদানো ব্রুনো মহান পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের অন্যতম পথিকৃৎ বলে একালে সম্মানিত, কিন্তু তাঁকেও স্বাধীন বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার শহীদ হতে হয় একইভাবে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে। এর উনিশ বছর পরে আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত লুসিলিও ভানিনি অভিযুক্ত হন অবিশ্বাসী বলে এবং জিভ্ ছিঁড়ে ফেলে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। কবি ও নাট্যকার মার্লো-ও একই অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত হন, তবে সৌভাগ্যক্রমে আগুনে পুড়ে মরার

আগেই এক পানশালার মারামারিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাছাড়া রানিএলিজাবেথের আমলে অখ্রীস্টান মতামতের জন্যে যাদের নরউইচে পুড়িয়ে মারা হয় তাঁদের মধ্যে কেমব্রিজে কর্পাস ক্রিষ্টির ফেলো ফ্রানসিস কেটের মতো পণ্ডিতও ছিলেন। গ্যালিলিও প্রথমবার অভিযুক্ত হন 'সোলার স্পটস' গ্রন্থ রচনার জন্যে। বইটিতে অবশ্য ধর্মশাস্ত্রের অথবা ধর্মগ্রন্থানুসারী বিশ্বসংসার সম্পর্কিত ধারণার কোনও উল্লেখ নেই, তবে বইটিতে গ্যালিলিওর যে ধারণা বিবৃত হয় তার সঙ্গে খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত ধারণার অসামঞ্জস্য বিশেষ প্রকট। কিন্তু সেবারের মতো গ্যালিলিওকে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে আবার 'ডায়ালগস' নামে এক গ্রন্থ রচনার অপরাধে অভিযুক্ত করা হলে তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন যে পৃথিবী-ই স্থির আর তার চারদিকে ঘুরছে সূর্য। জেনেশুনে এই মিথ্যে কথাটা না বললে তাকে জ্যান্ত পুড়ে মরতে হতো। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এসময়ে গবেষণা করতেন খুব গোপনে এবং ইয়োরোপের খ্রীস্টান ধর্মকর্তাদের ভয়ে তাঁরা পাণ্ডুলিপিগুলো লুকিয়ে রাখতেন খুব সাবধানে। চার্চ কিংবা যাজক সম্প্রদায় এবং বাইবেল যা-যা বলত সেগুলোকে বিনাপ্রশ্নে একবাক্যে না মেনে যারা অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের তথা বিজ্ঞানের পথে সত্যকে জানার চেষ্টা করত তারা তৎকালীন খ্রীস্টীয় সমাজে অপরাধী বলে গণ্য হতো—সাধারণত তাদের শাস্তি ছিল জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারা। ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থার চাপে আস্তে আস্তে ইয়োরোপ থেকে এই বর্বর প্রথা লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সরকারী ভাবে ইনকুইজিশন আইন স্পেন থেকে প্রত্যাহার করা হয় মাত্র ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে। এর মধ্যে পেগান ধর্মাবলম্বী অথবা ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসারী ধর্মীয় জীবন যাপন করার অপরাধে কত হাজার হাজার ইয়োরোপীয় নরনারীকে আগুনে পোড়ানো হয় তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায় নি। তবে এটা দেখা যায় যে একটা গোটা মহাদেশ থেকে পেগান ধর্মাবলম্বীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাছাড়া ইয়োরোপের বাইরেও, যেমন আমেরিকায়, আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং এশিয়াতে খ্রীস্টান ধর্ম কোথাও বেশি কোথাও কম করে ছড়িয়ে পড়ে বারুদের ধোঁয়ার সঙ্গে। তবে ইয়োরোপের বাইরে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারে প্রেমধর্মে বিশ্বাসী মিশনারীদের অবদানই প্রধান, কিন্তু মূল ইয়োরোপ ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে এ-কথা একেবারেই সত্য নয়।

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ও তার প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে ইয়োরোপের ইতিহাসে খ্রীস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু যারা মনে করে যে এক হাতে শাস্ত্র এক হাতে অস্ত্র নিয়ে ভারতবর্ষে ইসলাম

প্রচার করা হয়েছে তারা ইয়োরোপের ইতিহাসে ওইভাবে ধর্মপ্রচারের প্রকৃত তাৎপর্য দেখতে পাবে এবং সেই তাৎপর্যের আলোতে বুঝতে পারবে যে এক হাতে কোরান অন্য হাতে কৃপাণের তত্ত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রযোজ্য নয়। প্রযোজ্য হতো, যদি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বৈদিক আর্যদের আগ্রাসনের পরে সাযুজ্য সন্ধানের পন্থা অনুসরণ না করে ইয়োরোপীয় খ্রীস্টানদের মতো সন্ধিহীন ভাবে ধর্মপ্রচারের পন্থা গ্রহণ করত।

ইসলামের আগমনের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম প্রভৃতি বহুরকম ধর্ম ছিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম বলে কোনও বিশেষ ধর্ম ছিল না; হিন্দু, হিন্দোয়াই, হিন্দুস্তান প্রভৃতি সমস্ত শব্দই ছিল ভৌগোলিক অর্থদ্যোতক। পাঞ্জাবের অন্তর্গত শির-ই-হিন্দ বা শিরিন্দ ছিল এই ভৌগোলিক সংজ্ঞার সর্বোচ্চ সীমা এবং শির-ই-হিন্দের নিচে যে ভূভাগ ছিল তা-ই ছিল হিন্দ্ বা হিন্দুস্তান। কিন্তু ইসলাম নামে একটা সুনির্দিষ্ট শাস্ত্র-বিহিত সুসংগঠিত সুসংহত ধর্মমত যখন বাইরের দেশ থেকে হিন্দে প্রবেশ করতে থাকে তখন তার থেকে স্থানীয় বা দেশজ ধর্মমত-গুলোকে সুস্পষ্ট রূপে পৃথক করার জন্যে হিন্দে প্রচলিত সমস্ত বিস্রস্ত ধর্মগুলোকে হিন্দু ধর্মের আধারে ধারণ করা হয়। একদা যেমন বিদেশীরাই এদেশের নামকরণ করেছিল হিন্দ্ বলে তেমনই সম্ভবত এবারেও বিদেশী ধর্মাবলম্বীরাই দেশজ ধর্মগুলোর সম্মিলিত রূপের নাম দিয়েছিল হিন্দুধর্ম। তবে বিদেশাগত ধর্মের সংস্পর্শে দেশজ ধর্মগুলি নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে একই নাম অবলম্বনে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত সংহত হয়ে থাকতেও পারে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এরকম ঐক্য-ও-সংহতি সাধনের দৃষ্টান্ত চোখের সামনেই আছে—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-তিন দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষে গুজরাতী ছিল, বাঙালী ছিল, পাঞ্জাবী ছিল, তেলেগুভাষী ছিল, মহারাষ্ট্রীয় ছিল, তামিল ছিল, ওড়িয়া ছিল, কিন্তু ভারতীয় বলে আলাদা বা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনও জাতি ছিল না। বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের ও অর্থনৈতিক পেষণের প্রতিক্রিয়াতেই 'ভারতীয় জাতি' অথবা 'ভারতীয় জাতির কল্পনা' জন্মলাভ করে। বিদেশী রাজনৈতিক শক্তির আগে যখন বিদেশী ধর্মীয় শক্তির প্রচার ও প্রসার শুরু হয় তখন তার প্রতিক্রিয়াতে 'হিন্দুধর্মের' অথবা 'হিন্দুধর্মীয় বোধের কল্পনা'-র উদ্ভব। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের কল্পনাকে জন্ম দেওয়াই এদেশে ইসলামের প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ অবদান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[ইসলামের উৎপত্তি, তাৎপর্য ও প্রসার—সিন্ধুর সঙ্গে ইরাকের যুদ্ধ—উমায়াদ খলিফাদের আমল—আব্বাসিদ খলিফাদের আমল ও আরব-ভারত সম্পর্ক—মাহমুদের ভারতবর্ষ আক্রমণের কারণ—মাহমুদ কর্তৃক আর্যাবর্ত চেতনার ধ্বংসস্তূপের থেকে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি।]

উত্তরে এশিয়া মাইনর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে আফগান পর্বতমালা আর পশ্চিমে ভূমধ্য ও লোহিত সাগর পরিবৃত ভূখণ্ডই আরব জগৎ নামে পরিচিত। বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুভূমি—এখানে কৃষিযোগ্য জমি বিরল, ফলে এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা বরাবরই বাণিজ্যিক মনোভঙ্গির অধিকারী এবং তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ—বেদুইনরা—প্রধানত পশুপালন, যাযাবরবৃত্তি ও লুণ্ঠনবৃত্তিতে অভ্যস্ত ছিল। তারা বাস করত ছোট ছোট জনপদে বা মরূদ্যানে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে। যখন এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ হতো তখন সেই সাক্ষাতের সাধারণ পরিণাম ছিল বিবাদ থেকে ক্রমে রক্তপাত।

পুরাণে প্রোক্ত নোয়াহ্‌র পুত্র সেমের নাম অনুসারে আরব সন্তানদের বা আরববাসীদের সেমেটিক বলা হয়; এরাই এককালে টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকাতে সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় অ্যাসিরীয় প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাচীন সভ্যতাগুলির পত্তন করেছিল। নরতাত্ত্বিক দিক থেকে ইহুদীরাও সেমেটিক জাতিভুক্ত। সেমেটিকরা বহু দেবদেবীর ও মূর্তির উপাসক ছিল। মুখ্য উপাস্য ছিল চন্দ্র। তাকে বলত ইল্ বা এল্ এবং পরে তা-ই আরব্য ভাষাতে ইলাহ্‌তে রূপান্তরিত হয়। ইলাহ্ থেকেই কালক্রমে ইসলামের এক ও অদ্বিতীয় উপাস্যের নাম হয়েছে আল্লাহ্।

অধিবাসীদের চিহ্নিত করা হতো গোষ্ঠী বা কুল বা গোত্র দিয়ে, শাসনকার্য চালাত শেখ ও হাকিমরা। তবে আরব জগতের উর্বর জনপদগুলির উপরে বাইজানটিয়াম ও পারস্য সাম্রাজ্যের আধিপত্য ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ওই দুটি সাম্রাজ্য যখন ঘোর অবক্ষয়ের কবলে পড়ে তখন আরব জগতের বাণিজ্যিক রাজধানী মক্কা শহরে, ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে কুরেয়েশ গোত্রে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হয়।

প্রথম জীবনে হজরত মহম্মদ যাযাবরদের মতোই পশুপালন করতেন এবং

পরে ব্যবসা-বাণিজ্যকে তাঁর জীবিকা করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি হিরা পাহাড়ের গুহাতে অবসর যাপন করতেন এবং এখানেই তাঁর প্রথম উন্মীলন হয়। নিজের সম্বন্ধে কোনও অলৌকিকতার কথা তিনি প্রচার করেননি, এমনকি, এ বিষয়ে তাঁর কোনও স্বীকৃতির সন্ধানও পাওয়া যায়নি। পবিত্র কোরান তাঁর কাছে নিদ্রিত অথবা আকস্মিক সমাধিস্থ অবস্থাতে একাধিক পর্যায়ে উপনীত হয়। তাঁর কাছেই যে পবিত্র কোরানের সত্য উপনীত তথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল এইটেই একমাত্র 'লক্ষণ' যাতে তিনি একজন নবী বা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও রসুল বা প্রেরিত পুরুষ হিসেবে প্রমাণিত এবং ওই 'লক্ষণ' ব্যতিরেকে অন্যান্য সব কিছুতেই তিনি সংসারের আর দশ জনেরই একজন মানুষ।

সম্ভবত একারণেই হজরত মহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম বা আত্মোৎসর্গের ধর্ম প্রকৃত প্রস্তাবে পরমসত্তার নিকটে সর্বস্ব কোরবান বা বলি দিয়ে সেই সত্তার দুর্লভ প্রসাদ লাভের জন্যে এক চূড়ান্ত মানবিক আকৃতি। সেমেটিকদের আদি পুরুষ আদমের কাহিনী কোরানেও আছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত পাতকী সত্তা অথবা এশিয়া মাইনরের জনগোষ্ঠীরই অধস্তন প্রজন্ম কর্তৃক কল্পিত ব্রহ্মেরই অন্যতর অভিব্যক্তি হিসেবে নয়, কোরানে মানুষ বিচারভ্রান্তিতে আক্রান্ত নিতান্তই মানবিক সত্তা হিসেবে চিত্রিত। কোরানের মানুষ পতিত নয়, দিব্যও নয়, আধুনিক চেতনায় মানুষের যে স্বরূপকে বিদ্ধ করা হয় সে-ই মানুষই হলো কোরানের মানুষ।

মহম্মদের ধর্মমত অনুসারে একমাত্র ঈশ্বরই বিশ্বস্রষ্টা : তিনি স্বীয় সৃষ্টির প্রতি প্রসাদে ও প্রেমে বিগলিত, চরম বিচারপতি এবং দুষ্কৃতের শাস্তিদাতা ; একমাত্র ঈশ্বরই প্রার্থনীয়, তাঁর কাছেই সৃষ্টি সাহায্যপ্রার্থী, একমাত্র ঈশ্বরই মহান, আল্লাহু আকবর। মুয়েজ্জিন বা আহ্বায়ক প্রার্থনাগৃহের মিনারে উঠে আজান দেয়, এস, তাঁকে স্মরণ করো, তাঁর শরণ নাও। যারা ওই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে কিংবা তাঁর মুক্ত অস্তিত্বকে আকারের সীমানায় আবদ্ধ করে তারা স্রষ্টার অপমানকারী তথা কাফের।

* গীতাতে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের ও অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রবল প্ররোচনার নানারূপ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা সম্ভব হলেও তার প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট বক্তব্যের অনুরূপ কাফেরদের ধ্বংস করার জন্যে কোরানেও জেহাদের আহ্বান আছে এবং জেহাদেরও নানারূপ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অনেকে করেছেন। কিন্তু সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল ব্যাখ্যা সত্ত্বেও জেহাদ কখনই আগ্রাসন

বা ধর্মপ্রসারের জন্যে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ নয়, তা আসলে ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম —একেবারে সেই অর্থে-ই সংগ্রাম যে-অর্থে যুধিষ্ঠির কৌরবদের বিপক্ষে বা গান্ধীজী ইংরেজদের বিপক্ষে সংগ্রাম করেছেন। জেহাদ আর ক্রুসেড সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের সংগ্রাম। প্রাচীন ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ের আদর্শের মধ্যে অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞাদির সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের যে লিপ্সা আছে জেহাদের মধ্যে সেটুকুও নেই। গীতার মতোই কোরানও দিব্যবাণী অর্থাৎ মানুষের বরাবরে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার সরাসরি ভাষণ, তবে দুটি গ্রন্থে বিশ্বস্রষ্টার কল্পনাতে পার্থক্য আছে বৈকি। আবার প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা যেমন শ্রুতিতে এবং ঐহিক চিন্তা স্মৃতিতে বিধৃত ওই দু-চিন্তারই একত্রে সমাবেশ ঘটেছে পবিত্র কোরানে।

ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ এ নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও ইসলামের দর্শনে তা নেই। রক্ষণশীল ইসলাম মতে ঈশ্বর অপ্রাপনীয়, একমাত্র অধিকার্য হলো ঈশ্বরের গুণ। যেহেতু মরুভূমির দেশে এই ধর্মের উৎপত্তি তাই সে-দেশের মানুষের কাছে নিসর্গের যে-রূপ সব চাইতে কাম্য কোরানে বর্ণিত স্বর্গ সে-রূপ নিসর্গেরই মধুর বিস্তার। দীনহীনদের সেবা, রমজান অর্থাৎ যে-মাসে কোরান ব্যক্ত হয়েছিল সে-মাসে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস ও জীবনে অন্তত একবার হজ বা তীর্থযাত্রা করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

ইসলামের প্রচারে মহম্মদ ও তাঁর অনুগামীরা বহুবার প্রচণ্ড বাধা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, বহুবার আত্মগোপনে ও পলায়নে নিজেদের প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইসলাম-বিরোধীদের বর্বরতা ও হিংস্রতার স্মৃতি এবং তজ্জনিত সাধারণভাবে এই ধর্মের বিরোধীদের প্রতি এক ধরনের বিমুখতা ও বিদ্বেষকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশই অতিক্রম বা অস্বীকার করতে পারেননি।

ইসলামের অভ্যুত্থানের বহু শতাব্দী আগে থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে আরবজগতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল: প্রথম ও দ্বিতীয় খসরুর আমলে দু-জগতের রাজনৈতিক সম্প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায় অজন্তার প্রথম গুহাতে অঙ্কিত একটি চিত্র থেকে। আবার চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে আরব জগতে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দেবদেবীর একাধিক মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তবে একথা সত্য যে হজরত মহম্মদ যখন ইসলাম প্রচার করেন তখন আরব জগতে ভারতীয়দের স্থান ছিল মূলত

তাৎপর্যহীন এবং বোধকরি সে জন্যে তাঁর বিবেচনাতে বহু দেবদেবীর ও মূর্তির উপাসক আরব সন্তানরা, জুডা, জরথুষ্ট্র ও খ্রীস্টের ধর্মাবলম্বীরাই শুধু গৃহীত হয়েছিল—এরাই মুসলিমের জিম্মাতে রক্ষিত হয়, তাই এদেরকেই বলা হয়েছে জিম্মি আর এদের জিম্মাদার হলো মুসলিম। এদের রক্ষণাবেক্ষণ করার দরুন এদের কাছ থেকে জিজিয়া কর মুসলিম শাসকের প্রাপ্য।

হজরতের আবির্ভাবের একশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আরবদের মধ্যে ইতিপূর্বে অকল্পনীয় ও অজ্ঞাত এক অসাধারণ ঐক্য প্রীতি ও ভ্রাতৃবোধ ধর্মীয় ভিত্তিতে জেগে ওঠে। এ সঙ্গে তাদের অতুলনীয় কর্মপ্রেতিকে আরব জগতের বাইরে তারা চালনা করে। আরব জগতের নবজাগরণ আর ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার একই ঐতিহাসিক ঘটনার এপিঠ-ওপিঠ।

এতকাল আরবদের শাসন ও শোষণ করেছে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী বাইজানটিয়াম ও জরথুষ্ট্রধর্মাবলম্বী পারস্য সাম্রাজ্য। সুতরাং জাগরণের অব্যবহিত পরেই এই দুটি ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বহুযুগব্যাপী পুঞ্জীভূত রোষকে তারা নিয়োগ করল। বাইজানটাইনদের হাতে নির্যাতিত মিশরের অধিবাসীরা দেখল, ইসলাম এনেছে সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির বাণী। সুতরাং তারাও ইসলাম গ্রহণ করল। শুধু একটা ধর্ম হিসেবে নয়, নির্জিত ও শোষিতের একটা নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের অভ্যুত্থান হয়েছিল এই সত্য সর্বদা মনে রাখা দরকার। এর পরেই ইসলামের ইতিহাস প্রবাহিত হলো প্লাবনের বেগে।

সাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপদ্বয়কে ঘাঁটি করে মূল ইয়োরোপ ভূখণ্ডেও মুসলিমরা হানা দিল এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সমস্ত সম্পর্ক ছেদনের প্রক্রিয়াকে তারা সম্পূর্ণ করল সিসিলি অধিকার করে। এর অনিবার্য পরিণাম হলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎসাদন এবং আল্পস পর্বতমালার অন্য পারে তার পুনর্বাসন। বাণিজ্যের বিনাশে ইয়োরোপ একান্ত ভাবে ভূমিনির্ভর সমাজে রূপান্তরিত হলো, বহির্বিশ্বও মুছে গেল তার চেতনা থেকে। ইয়োরোপে মানুষের একমাত্র জ্ঞেয় সত্য হলো ঈশ ও একমাত্র গম্য স্থান হলো স্বর্গ। আর স্বর্গের পথ বাতলে দিতে পারে শুধু ঈশার ধর্মাবলম্বী যাজকেরা। ঐহিক প্রসঙ্গে সামন্ততন্ত্র ও পারত্রিক প্রসঙ্গে যাজকতন্ত্র—এই দুটি স্তরের উপরে স্থাপিত হলো পাশ্চাত্য মধ্যযুগ। এ যুগের ইয়োরোপীয়দের মানসে এই অভিনব বোধ জন্মাল যে খ্রীস্টীয় জগতের বাইরে যেমন সভ্যতা নেই তেমনই যাজকদের নির্দেশিত পথের বাইরেও কোনও সত্য নেই। এক

হিসেবে ইসলামের অভাবিত আগমনে ইয়োরোপ নিজের সমস্ত চোখ-কান দরজা-জানলা বন্ধ করে আত্মসর্বস্বতা, আত্মমুখিতা ও আত্মতৃপ্তির অন্ধকূপে নিজেকেই বন্দী করল।

বিকাশের বাসনা প্রাণেরই স্বভাব। শুধু পশ্চিমের দিকে নয়, পূর্বের দিকেও আরবরা অগ্রসর হতে চাইল। ইতিপূর্বে ইরানী ও তুর্কীদের সাহায্যে জনৈক ভারতীয় রাজার প্যালেস্টাইন আক্রমণের এবং বসরার শাসকের সঙ্গে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধের কাহিনী ইরানী ঐতিহাসিক টবরি উল্লেখ করেছেন। এবার আরবরাই এল ভারতীয় ভূখণ্ডে: খলিফা উমরের আমলে, ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান বোম্বাইয়ের নিকট থানাতে ও ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু নদের মোহনাতে অবস্থিত দেবল বন্দরে দুটি মুসলিম অভিযান হলো। অবশ্য এ-দুটি অভিযানের কোনও ফলশ্রুতি দেখা গেল না, কেননা এ দুটি বেদুইনদের রক্তে বহুশতাব্দীব্যাপী যে-লুণ্ঠনবৃত্তি ছিল তারই সাময়িক প্রকাশ মাত্র। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও সম্পদ বহুকাল থেকে আরব জগতে রূপকথার যে-বিস্ময় জাগিয়ে রেখেছিল সেইটেই তাদেরকে ওই দুটি লুণ্ঠনমূলক ভারতাভিযানে প্রলুব্ধ করেছিল। ওই একই প্রলোভনে—জলপথে অগ্রগতির অবাস্তবতা উপলব্ধি করে—খলিফা আলির আমলে আরবেরা পুনরায় বোলান গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রয়াস পায়। এ সব গিরিপথ দিয়েই আবহমান কাল থেকে বিভিন্ন বিদেশী জাতি ও গোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু বোলান সীমান্তবর্তী কিকান রাজ্যের অধিবাসীদের হাতে আরবদের ওই অভিযান ৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিহত হয়।

অভারতীয়রা ভারতে আগমনে আগ্রহী এটা ভারতীয় ইতিহাসেরই একটা বৈশিষ্ট্য। এটা অভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের শত্রুতার কোনও প্রমাণ নয়। এ পর্যন্ত মুসলিম জগতের সঙ্গে সনাতন ভারতের কোনও শত্রুতাও ছিল না। আরবীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য যেমন স্বাভাবিক চলছিল ৬৬৩ খ্রীস্টাব্দের পরেও অর্ধ শতাব্দী ধরে তেমনই ভাবে চলতে থাকে। বাণিজ্যের সূত্রে সিন্ধুনদের মোহানা থেকে সিংহল পর্যন্ত অর্থাৎ আরব সাগরের ভারতীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে, প্রধানত বন্দরগুলিতে, ছোটছোট মুসলিম বসতিও গড়ে উঠেছিল। শত্রুতার সূত্রপাত হলো ৭০৮ খ্রীস্টাব্দে। ওই সময় সিংহল থেকে এক জাহাজ মুসলিম রমণী ইরাকে যাওয়ার পথে দেবল নামক বন্দরের কাছে অপহৃতা হয়। সিন্ধুর রাজা দাহরের কাছে ইরাকের শাসক হজ্জাজ অপহৃতা রমণীদের প্রত্যাপর্ণের দাবি জানালে

দাহর প্রত্যুত্তরে জানান যে অপহরণকারীরা যেহেতু তাঁর নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত জলদস্যু তাই হজ্জাজের দাবি পূরণে তিনি অক্ষম। ওই কৈফিয়তে হজ্জাজ তুষ্ট হলেন না। দাহরকে শায়েস্তা করার জন্যে তিনি খলিফা ওয়ালিদের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। প্রথমটাতে রাজি না হলেও ওয়ালিদ শেষ পর্যন্ত হজ্জাজের পেড়াপিড়িতে দ্বিধান্বিত ভাবে অনুমতি দিলেন। প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হলো।

অতঃপর ক্ষিপ্ত হজ্জাজ তৃতীয় অভিযানে পাঠালেন নিকট আত্মীয় ও পরম প্রীতিভাজন মহম্মদ ইবন-কাসিমের নেতৃত্বে। মহম্মদ যেমন অসাধারণ বীর তেমনই উদারচেতা ছিলেন। তিনি শুধু দেবল নয়, একে একে নেরুন, সেহোয়ান, রাওর, ব্রাহ্মণাবাদ, আলোর ও মূলতান পর্যন্ত জয় করেন। বিজিতদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল স্নেহপূর্ণ। এ-সংবাদ যখন হজ্জাজের কাছে পৌঁছল তখন তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। রাওরের পতনের সংবাদ পেয়ে কোরানের দোহাই দিয়ে হজ্জাজ গণহত্যা করার জন্যে আদেশ পাঠালেন মহম্মদকে। সিন্ধু বিজয় সম্পূর্ণ হওয়ার পরে হজ্জাজের ক্রোধ প্রশমিত হলো।

তখন হজ্জাজ নতুন নির্দেশ পাঠালেন মহম্মদের কাছে: "যেহেতু বিজিতরা এখন আমাদের জিম্মি, অতএব তাদের জীবন ও সম্পত্তিতে আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেই। সুতরাং তাদেরকে আপন আপন উপাস্যের মন্দির গড়তে দাও। স্বধর্ম পালনের জন্যে কেউ যেন বাধা বা শাস্তি না পায়, স্বদেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাসে তাদের যেন কেউ কোনও বাধা না দেয়।" বাস্তব সুবিধার জন্যে দাহরের পুত্র জয়সীমাহ্ সহ কয়েকজন হিন্দুরাজা খলিফা দ্বিতীয় 'উমরের প্রস্তাব অনুসারে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও ধর্মান্তরিত হয়। আবার খলিফা হিশামের আমলে, অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে, মহম্মদের আরব্ধ অভিযানকে সিন্ধুর শাসক জুনায়েড রাজপুতানার উপর দিয়ে পূর্বে মালবা ও দক্ষিণে ব্রোচ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। কিন্তু মুসলিমের এই অগ্রগতিকে সম্মিলিত ভাবে রোধ করলেন ভারতের চারজন হিন্দু রাজা—দক্ষিণে চালুক্য রাজা অবনিজনাশ্রয় পুলকেশিরাজ, পূর্বে প্রতিহার রাজা নাগভট্ট এবং উত্তরপূর্বে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য ও কনৌজের রাজা যশোবর্মন।

এর পরেই উমায়াদদের হাত থেকে খলিফার পদ চলে যায় আব্বাসিদদের হাতে এবং আরব জগতে ধর্মীয় নেতৃপদের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও

মুসলিম শক্তির ঐতিহাসিক চক্র আবর্তিত হতে থাকে যার ফলে অচিরেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরবদের অবস্থান বিশেষ ভাবে সংকুচিত হয়ে কোন মতে শুধু সিন্ধুতে অস্তিত্ব রক্ষা করে। কেন আব্বাসিদ খলিফাদের আমলে ভারতে মুসলিমদের সামরিক তৎপরতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তা ভালো করে বোঝা দরকার।

ভারতে আরবদের প্রথম অভিযানের পেছনে কতখানি উমায়াদ খলিফাদের শক্তি প্রসারের আর কতখানি যাযাবর উপজাতিদের অনুর্বর অঞ্চল থেকে উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চলে প্রসারের প্রাকৃত তাগিদ ছিল তার নির্ভুল হিসেব দেওয়া কঠিন। তবে চুলচেরা বিচার ও বিতর্ক এড়াবার জন্যে মেনে নেওয়াই সমীচীন যে ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক এবং নিতান্ত প্রাকৃত এই দু রকম তাগিদই এই অভিযানের পেছনে কাজ করেছে; কিন্তু এ সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে অভিযানটি প্রেরণের প্রশ্ন প্রথমে উঠেছিল মুসলিম রমণীদের অপহরণ থেকে এবং তথাপি ওই অভিযানে খলিফা ওয়ালিদের স্বতঃস্ফূর্ত বা সম্পূর্ণ অনুমতি মেলেনি। হজরত মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কনিষ্ঠকন্যা ফতিমার স্বামী আলি ইবন আবি তালিবের মৃত্যুর পরে ৬৬১ থেকে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে-চৌদ্দ জন উমায়াদ খলিফা হন ওয়ালিদ তাঁদেরই একজন। এই চৌদ্দজন উমায়াদ খলিফাদের মধ্যে স্বভাবে ও চিন্তায় দ্বিতীয় 'উমর ব্যতিক্রম: ৭১৭ থেকে ৭২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছরের জন্যে তিনি খলিফা ছিলেন এবং তাঁরই সময়ে জয়সীমাহ্ প্রমুখ কয়েকজন হিন্দুরাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আবার সেসময়েই আরবদের দিক থেকে কোনও উল্লেখযোগ্য সামরিক তৎপরতার কথা ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই দ্বিতীয় 'উমর ব্যতীত বাকী তেরো জন উমায়াদ খলিফাই ধর্ম ব্যাপারে অনীহ ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে উমায়াদ খলিফারা ছিলেন মক্কার ধনী বণিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং আরব জগৎ কিংবা ইসলাম ধর্মের চাইতে খাঁটি আরবী স্বার্থে আগ্রহী: তাই পবিত্র কোরানের বিধান ও নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আরব নয় এমন মুসলিমদের মওয়ালি বা মক্কেল আখ্যা দিয়ে এঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপে গণ্য করতেন, যেমন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ঘৃণা বা হেয় করতেন। কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এই মর্মান্তিক বিভেদকে বিধির বিধান বলে মেনে নিয়েছিল, পক্ষান্তরে এই বিভেদকে মেনে নেওয়া মওয়ালিদের পক্ষে সংগত কারণেই সম্ভব হয়নি; নানাভাবে মওয়ালিদের অসন্তোষ ফুটে উঠেছিল।

মওয়ালিদের ওই বিক্ষোভ, তাদের মধ্যেকার ঐক্যবোধ, শক্তি ও সাহস

অনায়াসে উমায়াদদের প্রতিপত্তির কালকে খুবই সংক্ষিপ্ত করে ফেলতে পারত। তাই নিজেদের প্রতিপত্তি ও প্রভাব তথা কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে ওই মওয়ালিদের আরবের বাইরে যুদ্ধে নিযুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাদের উমায়াদ বিরোধিতার পরিবর্তে আরবের বাইরে অন্যতর বিরোধিতা ও সংগ্রামের পথে চালনা করার পরিকল্পনাটি প্রথম 'উমরের মস্তিষ্কপ্রসূত। পাশ্চাত্য অভিযানের প্রাথমিক সাফল্য ভৌগোলিক অর্থে ইসলামের বিস্তার করার জন্যে একই সঙ্গে উমায়াদদের ও মওয়ালিদের মধ্যে উৎসাহ জোগায়।

অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলিমের প্রথম অভিযানটির কারণ হিসেবে ধর্ম-প্রসারের জন্যে যুদ্ধের আদর্শকে উপস্থাপন করা শুধু নিতান্তই সরলীকরণ মাত্র নয়, মারাত্মক ভুলও বটে, যেহেতু তার পেছনে নৃকৌলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণগুলোই ছিল প্রধান এবং পরে সেসবের সঙ্গে ধর্মীয় উদ্দীপনা মিশে এক জটিল বিবিধাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। এটা স্পষ্ট ভাবেই মানতে হবে যে প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের স্বপক্ষে পশ্চাৎ-যুক্তি হিসেবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাদানের তাৎপর্য ছিল।

৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে উমায়াদদের পতনের পরে খলিফা হলেন হজরত মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের বংশ এবং এই আব্বাসিদরা ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র হুলাগু খাঁর ক্ষমতা দখল পর্যন্ত খলিফার পদে ছিলেন। প্রথম আব্বাসিদ খলিফার নাম আবুল আব্বাস উস-সাফায়হ্; দ্বিতীয় আব্বাসিদ খলিফা অল-মনসুরের আমল হলো আরব জগতের সঙ্গে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের যুগ। তাঁর শাসনকালে পঞ্চতন্ত্র, জাতককথা প্রভৃতি সংস্কৃত ও পালি কথাসাহিত্য পারসী ও পরে আরবীতে অনূদিত হয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে এবং ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের চরক-সংহিতাও এসময় পারসীতে অনূদিত হয়; শুধু তা-ই নয়, সৌহার্দ্যাবহ হিসেবে হিন্দু পণ্ডিতের একাধিক দল বাগদাদে তাঁর দরবারে গিয়ে গণিত, নক্ষত্রবিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা ইত্যাদি আরবদের শিখিয়েছিল।

অল-বীরূণীর বিবরণ থেকে আরও জানতে পাই যে অল-ফজারী ও ইয়াকুব ইবন টারিকের পরিকল্পনা বলে প্রচারিত নক্ষত্রচক্রের প্রকৃত উদ্ভাবক হলেন জনৈক হিন্দু যিনি অল-মনসুরের দরবারে এসেছিলেন ৭৭১ খ্রীস্টাব্দে। নাক্ষত্রিক দূরতা সম্পর্কিত টারিকের ধারণাগুলিও আদতে কোনও বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছ থেকে পাওয়া—এই পণ্ডিত তৃতীয় আব্বাসিদ খলিফার আমলে ৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে এসেছিলেন। সনাতন ভারতের জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে

গভীর শ্রদ্ধা থেকে টোলেমীর বহু আগেই আরবরা ব্রহ্মগুপ্তের নক্ষত্র-বিদ্যাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এবং হিন্দুপণ্ডিতদের সহযোগিতায় তাঁরা ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত ও খণ্ডখাদ্যক দুখানিও আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন।

বোধকরি অষ্টম শতাব্দীতেই আরবরা দশমিক বর্গিকরণ পদ্ধতি হিন্দুদের কাছে শিখে পশ্চিমে রপ্তানী দেয়, কেননা সেভেরস সেবেখ্‌ট্‌ নামে একজন সিরীয় মনীষী এ-সময়ে হিন্দুদের উদ্‌ভাবনী প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন যে যারা গ্রীক ভাষাতে কথা বলে তাদের ধারণা তারাই জ্ঞান বিজ্ঞানের শেষ সীমাতে পৌছেছে, কিন্তু মাত্র ন-টি অঙ্কের সুপ্রয়োগে গণনার যাবতীয় রহস্যবিদ্ধকারীদের কথা জানলে ওই গ্রীকভাষীরাও স্বীকার করবে যে পৃথিবীতে তারা ছাড়াও জ্ঞানী লোক আছে।

ভারতবর্ষ ও আরব জগতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ও দৃঢ়তর হয় খলিফা হারুণ অল-রশীদের ৭৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮০৯ খ্রীস্টাব্দ এবং অল-মামুনের ৮১৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনের যুগে। খলিফাদের মধ্যে হারুণ অল-রশীদের সম্বন্ধে গল্পকথা সবচাইতে বেশি প্রচার লাভ করেছে এবং ভারতীয়দের মধ্যে এই নামটিই সবচাইতে বেশী প্রসিদ্ধ ও পরিচিত বলে মনে হয়। অল-রশীদের বরমক বংশের মন্ত্রীর পূর্বপুরুষেরা নওবেহার বা নববিহারের প্রধান পুরোহিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁরা বরাবরই ছিলেন অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এই মন্ত্রীর উৎসাহে খলিফা হারুণ অল-রশীদের দরবার হয়ে ওঠে হিন্দু তথা সনাতন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং চরক সুশ্রুত নিদান থেকে ভাগবত পর্যন্ত আরবীতে অনূদিত হয়। তাঁর প্রধান চিকিৎসকও একজন হিন্দুই ছিলেন।

হিন্দুদের ভৌগোলিক ভাবসত্ত্বও আরবের জ্ঞানী সমাজে প্রসারিত হয় এসময়ে এবং তারা যে পৃথিবীর কেন্দ্রকে অরীন নাম দিয়েছিলেন, যাকে বিখ্যাত মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী টোলেমী বলেছেন ওজীন, তা আসলে স্বর্ণযুগীয় ভারতবর্ষের প্রধান মানমন্দিরের স্থান উজ্জয়িনীর পরিবর্তিত বা বিকৃত ধ্বনি। এভাবে আরব্য সংগীত শাস্ত্রের অনেক পারিভাষিক শব্দও আদতে ভারতবর্ষীয় অর্থাৎ সংস্কৃত-জাত ভাষা থেকে উৎসারিত হয়ে পরিবর্তিত বা বিকৃত রূপ লাভ করে। নবম শতাব্দীতে অল-জাহীজ লিপিবদ্ধ করেছেন যে আরবে প্রচুর হিন্দু সাধু ও বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল এবং বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা বিশেষভাবে সূফী-দর্শনের বিকাশে সাহায্য করেছিল। এছাড়া 'দার্শনিকদের কবি ও কবিদের দার্শনিক'

রূপে উল্লিখিত আবুল অলা-অল মায়ায়ারি হিন্দুদের প্রভাবেই নিরামিষ আহার ও নির্জনে বাস করতেন।

এই যেমন গেল সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সংক্ষিপ্ত চিত্র তেমনই বৈষয়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারতীয় জগৎ ও আরব্য জগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে আব্বাসিদ খালিফাদের আমলে: ওই সময়ে আরব বণিকেরা অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয় ভূখণ্ডে বাণিজ্য বিস্তার করেন এবং তাঁদের অনেকে ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতির বিবরণে ভারতীয় ইতিহাসের অজস্র অশেষ মূল্যবান উপকরণ রেখে গেছেন। দশম শতাব্দীর ইবন হাওউলের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন শহরে জামা মসজিদ-সহ মুসলিম জনসংখ্যা ছিল রীতিমতো উল্লেখযোগ্য এবং তাদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের বিলক্ষণ সম্প্রীতি ছিল।

কিন্তু ভারতীয় ও আরবদের নিশ্চিন্ত সম্প্রীতির মধ্যে আশঙ্কার কণ্টক প্রবিষ্ট হলো নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে।

দশম শতাব্দীর মধ্যাহ্নে ঘজনীর আমীর অলপ্তিগীন কাবুলের একাংশ জয় করে নতুন রাজত্ব স্থাপন করলেন। তাঁর মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পরে সুলতান হলেন জামাতা সবুক্তিগীন। ধর্মীয় ব্যাপারে অলপ্তিগীন কিংবা সবুক্তিগীন উভয়ের কারও কোনও আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না, অন্তত সেরকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু পাছে সুলতান সবুক্তিগীন দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভিতরে রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেন এই আশঙ্কার থেকে পাঞ্জাবের শাহী রাজা জয়পাল উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের কাছে সমবেতভাবে পূর্ব-প্রতিরোধের অর্থাৎ অগ্র-আক্রমণের পরিকল্পনা নিবেদন করলেন। ৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে কালিঞ্জর ও আরও কয়েকটি রাজ্যের সম্মিলিত সেনাবাহিনী জয়পালের নেতৃত্বে সবুক্তিগীনকে আক্রমণ করল। জয়পাল বাধা পেলেন ঘজনী ও লাঘমানের মাঝামাঝি ঘুজক নামক স্থানে। জয়পালের দুর্ভাগ্য! প্রবল তুষার-ঝটিকার আঘাতে তাঁকে ত্যাগ করতে হলো ঘজনী আক্রমণের পরিকল্পনা, উপরন্তু জয়পাল বাধ্য হলেন অপমানকর সন্ধির শর্তে রাজি হতে। কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে দলবল-সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই জয়পাল স্বকৃত সন্ধি ভঙ্গ করলেন। জয়পালের আগ্রাসী মনোভাব ও বিশ্বাসঘাতকতা সুলতান সবুক্তিগীনের মনে স্বভাবতই উন্মত্ত উষ্মা জাগাল, কিন্তু শঠ জয়পালকে শাস্তি দিয়ে যাওয়ার সুযোগ তিনি পেলেন না, সে-দায়িত্ব একাধারে

অসাধারণ জ্ঞানী ও যোদ্ধা পুত্র মাহমুদের উপর অর্পণ করে ৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা গেলেন।

ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন সুলতান মাহমুদ কেমন করে তাঁর পিতৃসত্য পালন করেছিলেন। সুলতান হয়েই অবশ্য মাহমুদ সন্ধির শর্তভঙ্গকারী ভারতীয় রাজন্যদের শিক্ষাদানের বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেননি, কেননা প্রথম তিন বছর ধরে তিনি খুরাশান অঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; ৯৯৯ খ্রীস্টাব্দে খলিফা কর্তৃক ওই অঞ্চলের সর্বেসর্বা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন; পরের বছর তিনি দৃষ্টি দিলেন দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলির প্রতি। বলা বাহুল্য যে খুব স্বাভাবিক কারণেই তিনি প্রথম আঘাত করলেন জয়পালকে এবং সহজেই পেশোয়ারের কাছে যুদ্ধে জয়পালের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করলেন। তারপরে তিনি অগ্রসর হলেন জয়পালের সমর্থক অপরাপর রাজাদের শাস্তি দিতে। ঝঞ্ঝার বেগে মাহমুদ একে একে মুলতান, থানেশ্বর, কনৌজ, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর প্রভৃতি বিধ্বস্ত করলেন। ভারতীয় ইতিহাসে শুরু হলো দারুণ দুঃস্বপ্নের অধ্যায়। অবশেষে মথুরার মন্দির জ্বালিয়ে কাথিয়াওয়ড়ের সোমনাথ মন্দির লুট করে তিনি দেশে ফিরলেন।

এটা ঠিক কথা যে মাহমুদের যে-সমর প্রতিভা ছিল তার তুলনা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসেই বিরল এবং প্রাক্-মুসলিম ভারতীয় রাজাদের দ্বারা প্ররোচিত না হলেও মাহমুদের সমরপ্রতিভা কোন-না-কোন ভাবে প্রকাশের পথ খুঁজে নিতই, হয়তো সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষের বদলে চীন তথা পূর্ব দিকেই আক্রমণ চালনা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু জয়পাল প্রমুখ ভারতীয় রাজন্যদের স্পর্ধা, শঠতা ও সন্ধিভঙ্গের অপরাধ তাঁর ওই প্রতিভাকে বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষের দিকেই বিকাশের অনুকূল পরিবেশ করে দিয়েছিল। পাঞ্জাবে কর্তৃত্ব বিস্তার ছাড়া ভারতীয় ভূখণ্ডে কোনও স্থায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অথবা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোন ধর্মপ্রচারের পরিকল্পনা তাঁর ছিল না, তা তিনি করেনও নি। তবে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতার বা তাঁর বিপক্ষতার দরুন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন, গণস্তরে হত্যা করে ও মন্দিরে আগুন লাগিয়ে ভারতীয়দের উপরে তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রতাপের ছাপ গভীর ভাবে ফেলতে চেয়েছিলেন এবং সোমনাথ লুট করে তাঁর সামরিক অভিযানগুলি বাবদ খরচ ও তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীদের ঔদ্ধত্যের দাঁত তুলে নিয়েছিলেন।

মাহমুদের ভারত আক্রমণের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে দিগ্বিজয়ী আলেকজণ্ডার এসেছিলেন ভারতবর্ষে এবং সে সূত্রে ভারতবর্ষে গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক শোণিতের অনুপ্রবেশ ঘটে। তারপর একে একে কুষাণ, শক, গুর্জর, হূণ প্রভৃতিরা ভারতবর্ষে আসে, আরবরাও আসে, আবার পূর্ব কোণ থেকে মঙ্গোলরাও আসে—কখনও আগ্রাসী, কখনও বসতিপ্রার্থী, কখনও বণিক হিসেবে তারা ভারতবর্ষে এসেছে এবং ভারতবর্ষের বিশাল বক্ষে স্থান পেয়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যেই আত্তীকৃত হয়ে গেছে। এইরূপ গ্রহণক্রিয়াতে ইতিহাসের শুরু থেকেই ভারতবর্ষ বিস্ময়কর সমন্বয়শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তার ফলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি বৈচিত্র্যে ও ব্যাপকতায় হয়ে উঠেছে কৌতূহলোদ্দীপক এবং বিশিষ্ট। কিন্তু বহিরাগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শোণিত ও সংস্কৃতির অবিরাম সংমিশ্রণ সত্ত্বেও যে ভারতের সভ্যতা ও সমাজের মহীরুহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেইসব ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মশাস্ত্র থেকে প্রাণরস আহরণ করে এসেছে যেগুলি সাধারণ ভাবে হিন্দু-জ্ঞানের অন্তর্গত একথা অস্বীকার করা কঠিন। অর্থাৎ মৌল উপকরণগুলির হিসেবে ভারতীয় ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্রোত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে মোটামুটি একই খাতে বয়েছে। কোনও দেশের বিবর্তনের ধারা যদি সুদীর্ঘকাল একই খাতে বয় তাহলে তার প্রখরতা কিছুটা নষ্ট হতে বাধ্য এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে : বহু বিদেশী শোণিত ও সংস্কৃতি তাকে প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য দিয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি তাতে বদলায়নি, বরং সে-ভিত্তি দিন-কে-দিন অনড়তা লাভ করেছে।

সুদীর্ঘকাল একই স্রোতে বাহিত, একই ভিত্তিতে আশ্রিত থাকার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে এমন এক চেতনার জন্ম হয় যাকে সহজ করার জন্যে আর্যাবর্ত-চেতনা বলে অভিহিত করা যায়। এই চেতনা পবিত্র ও অভ্রান্ত এবং এই চেতনার আবহাওয়াতে এমন কিছু ছিল যার ফলে একদা ভারতবাসীরা মনে করেছিল যে যা নেই ভারতে তা নেই জগতে। নিজেদের মধ্যে সব বিভেদ সত্ত্বেও এই চেতনা ভারতবাসীদের মধ্যে এক ধরনের উদারতার জন্যে প্রচ্ছন্ন শ্রেষ্ঠতাবোধও সঞ্চার করে। ভারতবর্ষের চাতুর্বর্ণ্য, ভারতবর্ষের সংহতি, ভারতবর্ষের অপরূপ নদনদীমালা, বিপুল পর্বতগ্রন্থি, শ্যামল অরণ্য, সুনীল আকাশ এক কথায় যা কিছু ভারতীয় সমস্তই মহিমায় ও দিব্যতায় অনন্ত, দেবদেবীরাও এদেশের অধিবাসীদের প্রতি করুণা-ও-প্রসাদ-ঘন।

কিন্তু মাহমুদ যখন সোমনাথ মন্দির লুট করে স্বদেশের পথ ধরলেন তখন

একজন হিন্দুও তাঁকে কোনও উল্লেখযোগ্য বাধা দিতে পারেনি। হিন্দুরা চেষ্টা করেছিল মাহমুদকে ছলনা করে মরুভূমির মধ্যে ভুল পথে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ধ্বংস করতে। মাহমুদ ও তাঁর সৈন্য-বাহিনী অনিবার্য মৃত্যুর মুখ থেকে যেভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন তাতে মনে হয় স্বয়ং দেবতা হয়েছিলেন তাঁর সহায়। এভাবে মাহমুদ শুধু আর্যাবর্তের বিভিন্ন মন্দির বিগ্রহ অথবা অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে বিধ্বস্ত করেননি, আর্যাবর্ত চেতনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত অভিমান, শ্রেষ্ঠতাবোধ ও প্রত্যয়কেও চূর্ণ করে প্রাচীন ভারতীয় শক্তির সামরিক মেরুদণ্ড তো বটেই, নৈতিক মেরুদণ্ডও ভেঙে দিয়েছিলেন।

একাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় ধর্মযোদ্ধারা ও পূর্ব থেকে মঙ্গোলরা আরব জগতের উপর আক্রমণ শুরু করলে নিরাশ্রয় মুসলিমদের পক্ষে নিরাপদ নতুন বসতি স্থাপন করা নিতান্তই জরুরি হয়ে পড়ল, তখন স্বভাবতই তাদের চোখ প্রথমে পড়ল ধনধান্যে পুষ্পে ভরা এই বসুন্ধরার প্রতি এবং ভারতবর্ষে এসে তারা দেখল যে এই দেশের অধিবাসীদের সবদিক থেকে হীনবল করে মুসলিম পত্তনীর কাজকে মাহমুদ অনায়াস-সাধ্য করে গেছেন। সুতরাং নিজে কোনও সাম্রাজ্য স্থাপন না করলেও নিজের অজ্ঞাতেই আর্যাবর্তচেতনার মধ্যে অবরুদ্ধ ভারতবাসীদের কল্পনাকে মুক্তি দিয়ে এবং নতুন জনগোষ্ঠী তথা ধর্মপ্রসারণের আবশ্যক পূর্বাবস্থা সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনাকারী হিসেবে অমিত পরাক্রমশালী ও নৃশংস হত্যাকারী, ভারতীয় জ্ঞান ও সাহিত্যে, গ্রীসের দর্শন ও ইসলামের তত্ত্বে সুপণ্ডিত, শিল্প সংস্কৃতির গুণগ্রাহী ঘজনীর মাহমুদকে স্বীকার করে নেওয়াই সমীচীন।

এই নতুন যুগের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো আর্যাবর্তচেতনার ধ্বংসস্তূপের উপরে হিন্দুধর্মের জন্ম। কথাটা শুনতে কিছুটা ধাঁধাঁর মতো। এযাবৎ ভারতীয়রা নিজেদেরকে হিন্দু বলে অভিহিত করেনি। যারা হিন্দু কথাটা ব্যবহার করত তারা ছিল বিদেশী এবং বিদেশীরা হিন্দু শব্দটি এযাবৎ ব্যবহার করেছে প্রথমে সিন্ধু নদের অববাহিকাতে ও পরে উত্তরে বিপুল পর্বতমালা আর দক্ষিণে মহাসাগর পরিবৃত ভূভাগে বসবাসকারীদেরকে বিশেষ্যপদে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে: হিন্দু শব্দটির সনাতন তাৎপর্য তাই নিতান্তই ভৌগোলিক। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কখনও স্বতন্ত্রভাবে কখনও যূথবদ্ধ ভাবে এসেছে বটে, কিন্তু তারা যে বাইরের থেকে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে

কোনও বিধিবদ্ধ ও সুসংগঠিত ধর্মীয় আদর্শকে কখনও নিয়ে আসেনি একথাটা সর্বদা আমাদের মনে রাখা দরকার।

বহুযুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ভারতবাসীরা আবিষ্কার ও আয়ত্ত করেছিল বিদেশী শোণিতকে ধমনীস্থ করার পদ্ধতি। কিন্তু বহিরাগত ধর্মকে আত্মস্থ করার উপায় উদ্‌ভাবনের প্রয়োজনই এপর্যন্ত দেখা যায়নি অর্থাৎ যে সমস্যা কোনদিন দেখাই যায়নি তার সমাধান সংগত কারণেই ভারত-বাসীদের অজানা ছিল। বহিরাগত ধর্মকে আত্মস্থ করবার সমস্যা প্রথম দেখা দিল ইসলামের ভারতে আগমনের পরে। কিন্তু এ সঙ্গে এ কথাটাও মনে জাগে যে এদেশে ইসলাম এসেছে বহুলাংশে বিদেশী বিজেতার পতাকাচ্ছায়াতে এবং অন্তত প্রথম দুটি প্রধান অভিযানের পেছনে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা যে খুব প্রবল ছিল সেটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। উপরন্তু এই বিজেতাদের ধর্মগ্রন্থে এমন অনেক উক্তিই আছে যেগুলির ব্যাখ্যা হিংসাত্মক কার্যাবলীর স্বপক্ষে করা সম্ভব; আবার এটাও সত্য যে অনেকে যেমন অভি-যাত্রীদের হাতে উৎপীড়ন এড়াবার জন্যে তেমনই অনেকে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশাতে পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় দু হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে অনেক হানাদার এসেছে, কিন্তু তারা ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-তত্ত্বজ্ঞানের অথবা সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতির স্বীকৃত কাঠামোর কোনও মৌল পরিবতন সাধনে উদ্যত হয়নি, এমন কি সে জাতীয় কোনও পরিবর্তনের আবশ্যকতাকেও জাগ্রত করতে পারেনি। অর্থাৎ এই দু হাজার বছরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে কোনও কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে থাকলেও তা কখনও কোনও ব্যাপক, বহুমুখী ও মৌল রূপ লাভ করেনি। সে-পরিবর্তনের সূচনা হলো ইসলামের জয়-যাত্রাতে।

এই নতুন আক্রমণকারীদের সংগ্রাম থেকে ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্ম ও উৎসব, সামাজিক আচরণ ও আদান-প্রদান, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সব কিছুকে পৃথক রাখার চেষ্টা করল। বিদেশীদেরকে এক করে নেওয়ার প্রসিদ্ধ ভারতীয় সাধনার মধ্যে থেকেই যেন শুরু হলো বিদেশীদেরকে তফাতে রাখার সাধনা; আসলে বিদেশীদেরকে তফাতে রাখার চাইতে বিদেশীদের থেকে নিজেদেরকে তফাৎ করার সাধনা বলাই উচিত। নিজেদেরকে তফাৎ করার উপায় কী? উপায় হলো নিজেদের ভৌগোলিক

সংজ্ঞাকে সাংস্কৃতিক সংজ্ঞায় রূপান্তরিত করা। আস্তে আস্তে হিন্দু বলতে যে-ভৌগোলিক অভিব্যক্তির অধিবাসীদের বোঝানো হতো সেই অধিবাসীদেরই সমাজ-সংস্কৃতি, সর্বোপরি ধর্মকে বিশেষিত করা হলো একই হিন্দু শব্দ দিয়ে।

হিন্দু-শাস্ত্র, হিন্দু-সমাজ, হিন্দু-সংস্কৃতি ইত্যাদি বলতে কী বোঝানো হয়? তলিয়ে ভাবলেই মানতে হবে যে হিন্দু আর ভারতীয় শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ভারতবর্ষের সেই জিনিসটাই হিন্দু ধর্ম-দর্শন যার উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের আগে। অর্থাৎ হিন্দুত্ব ব্যাপারটা বহু প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনকালের ভারতীয়রা জানতেন না যে তাঁরা হিন্দুত্বে চিহ্নিত বিশ্বাসের অনুসারী। হিন্দুত্বর সংজ্ঞা মুসলিমের উত্থানের ফলে সূচিত মধ্যযুগের বিকাশকে আশ্রয় করে নির্ধারিত হয়েছে। মুসলিমের আগমনের আগে ভারতের তাবৎ শ্রুতি মহাকাব্য পুরাণ স্মৃতি বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি পারত্রিক ও ঐহিক জীবন সম্পর্কিত যতগুলি ধারণা গড়ে উঠেছিল তার সমস্তই উক্ত সংজ্ঞার অন্তর্গত। ওইসব ধারণার অনেকগুলোই ইসলামের জন্মের দু হাজার আড়াই হাজার বছর আগের ধারণা, কিন্তু ওই-গুলোকে তখন কেউ হিন্দু ধারণা বলে মনে করত না। এ দিক থেকে ইসলাম ধর্মের পরে হিন্দু ধর্মের উদ্ভব। কিন্তু একবার হিন্দু জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর বিদেশীদের ধর্ম সমাজ সংস্কৃতির বিপরীতে ওই সংজ্ঞাকে জীবনের সর্বস্তরে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা শুরু হলো।

এই চেষ্টাতেই যেমন একদা সেই ধ্রুপদী যুগে কৃষ্ণ-বাসুদেব ও রুদ্র-শিবের তত্ত্বকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আপন বক্ষপটে আকর্ষণ করে শেষে একাত্ম করেছিল তেমনই এবারে, ইসলামের ব্যাপ্তিমুখে, অবতারবাদের সূত্র ধরে বিষ্ণু ও বুদ্ধ-দেবকে একাত্ম করে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের স্বাধীন অস্তিত্বকে অর্থহীন করে তুলল। কৃষ্ণ-বাসুদেব কিংবা রুদ্র-শিবের সমন্বয়ের চাইতে বিষ্ণু ও বুদ্ধদেবের সমন্বয় অনেক বেশি চাঞ্চল্যকর, কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটেছে দুটি অপেক্ষাকৃত পরিণত ও সুস্পষ্টভাবে পৃথক ধারণার মধ্যে। এভাবে হিন্দুত্বের জন্ম এবং হিন্দুত্বের সাধারণ সীমানার মধ্যে বিবাদী ধারণাগুলির আদান-প্রদানই হলো মুসলিম অভিযানের পরে ভারতের ইতিহাসে প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু ওই প্রতিক্রিয়ার তাৎপর্য সে-মুহূর্তে বোধগম্য না হওয়াই

স্বাভাবিক ; তখন বরং সমন্বয়ের স্বরূপটাই ছিল অস্পষ্ট, যা ছিল স্পষ্ট তা হলো দেশোদ্ভূত ও বিদেশাগত ধর্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সন্ধান এবং এই সন্ধানের এক প্রান্তে ছিল হিন্দু জীবনভঙ্গি আর অন্যদিকে ছিল মুসলিম জীবনভঙ্গি। তবে এই দুটি জীবনভঙ্গির পারস্পরিক সান্নিধ্যজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে মাহমুদের অভিযানের অব্যবহিত পরেই শুরু হয়ে যায় এমন কথা ভাবা ভুল। তা ছাড়াও এটা তর্কাতীত রূপে গ্রাহ্য হওয়াই ভালো যে গজনীর মাহমুদ ধর্মপ্রচারের জন্যে ভারত যাত্রা করেননি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[ইসলামীয় ধর্মসাধনার গূঢ় কথা—ভারতবর্ষে মরমী মুসলমান সাধকদের ধর্ম প্রচার।]

তথাপি আলোচনার সুবিধার্থে মাহমুদকে মুসলিম জগতের এক অগ্রগণ্য সন্তান বলে মেনে নেওয়াই ভালো এবং একথাও বলতে পারি যে ভারতে মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠার পথে তিনিই ছিলেন অগ্রদূত। মাহমুদের সশস্ত্র অভিযানগুলির পরে-পরেই শুরু হলো ইসলামের নিরস্ত্র তথা মুসলিম সাধকদের ধর্মপ্রচারের অভিযান। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রচার এসব সাধুসন্ত পীর-ফকিরদের মাধ্যমেই হয়েছে, অর্থাৎ আমীর-ওমরাহ রাজা-বাদশাহের চাইতে ধার্মিক মুসলিমরাই ইসলামের ব্যাপক প্রচার অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছেন। যে-কোন কারণেই হোক, ভারতীয়দের মনে এই একটা ভুল ধারণা আছে যে এক হাতে কোরান আর অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে এদেশে ইসলামের প্রচার করা হয়েছে; কিন্তু লক্ষণীয় যে মুসলিমের কৃপাণ যেখানে সবচাইতে প্রচণ্ড ছিল সেই দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলের চাইতে ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে, যেমন সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, কেরল, বাংলা প্রভৃতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বেশি এবং কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে কেরল বাদ দিয়ে ভা্‌ ত মুসলিম শক্তির কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী সেসব অঞ্চলেই ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিতর যেসব অঞ্চলে একদা বৌদ্ধরা বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। তবে একদা যেখানে বৌদ্ধরা সংখ্যায় বেশি ছিল সেখানেই যে পরে ইসলাম প্রভাব বিস্তার করে এটা কোনও সর্বজনীনতত্ত্ব নয়—কেরলে ইসলামের প্রভাব বিস্তৃত হয় আরব বণিকদের দ্বারা। যদি এক হাতে কোরান আর অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে মুসলিমরা তাদের ধর্মপ্রচারে বের হতো তাহলে তার প্রবণতাটা হতো মুসলিম শক্তির কেন্দ্রর অধীন অঞ্চলকে অধিকতর রূপে ইসলামের আদর্শাধীন করা, তার পরিবর্তে প্রবণতাটা যখন কেন্দ্রকে নয়, পরিধিকে অর্থাৎ যেসব অঞ্চল পরিধির অন্তর্গত বা সীমান্তবর্তী সেগুলোকেই ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করায় তখন ইসলামের প্রসারের অন্যতর কারণের কথাই কল্পনা করতে হয়।

অন্যতর কারণের যাথার্থ্য এই যে নিরস্ত্র ভাবেই মুসলিম ধার্মিকরা এদেশে ইসলামের প্রচারে প্রথম আসতে শুরু করেছিলেন। যতদূর জানা যায়,

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে প্রথম যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম শেখ ইসমাইল; তাঁর পরে এলেন শেখ আলি উসমান অল-হুজাইরী ওরফে দাতা গঞ্জ বখ্‌ষ্‌। এঁরা দুজনেই সাধনার স্থান হিসাবে লাহোর নির্বাচন করেছিলেন। গঞ্জ বখ্‌ষের রচনাবলীর মধ্যে 'কষ্‌ফ্‌ অল-মহ্‌জ্‌ব' বিশেষ বিখ্যাত: গরীবী অবলম্বন করে জগতের সর্ব বস্তু পরিহারপূর্বক স্রষ্টা ও সৃষ্টি মিলে পরম পূর্ণতার মধ্যে আমিত্বকে বিলীন করে দিতে হবে এবং ব্যক্তিত্বহীন না হয়েও সমস্ত জাগতিক স্বত্ব ও সম্পর্ক থেকে মুক্তির এই পরম হাল বা দশাকে তিনি বলেছেন ফনা। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের উপরেই তিনি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন: ১০৭২ খ্রীস্টাব্দে লাহোরের ভাটি দরোজাতে দেহরক্ষা করলে তাঁর মাজার বা সমাধিস্থল উভয় ধর্মাবলম্বীদেরই তীর্থস্থানে পরিণত হয়; ভারত বিভাগের আগে পর্যন্ত প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার সেখানে উভয় ধর্মাবলম্বীদেরই বিরাট মেলা বসত।

অতঃপর পারসী সাধক খ্বাজা উসমান হারোয়ানী চিশতীর শিষ্য খ্বাজা মৈইনউদ্দীন চিশতী ১১৬১ সালে ঘজনী থেকে লাহোরে আসেন। এখানে তিনি কিছুকাল গঞ্জ বখ্‌ষের মাজারে আত্মশুদ্ধির সাধনা করেন, তারপর মুলতান ও দিল্লী পরিক্রমা করে, অবশেষে আজমীরে পুষ্করের কাছে তাঁর পূর্ণ সাধনার আসন পাতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই তাঁর প্রচুর শিষ্য ছিল, এবং যেসব ব্রাহ্মণরা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে হুসেনী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে এঁরা অথর্ব বেদকে মানেন আবার সে সঙ্গে বেদবিরোধী নয় এমন অনেক মুসলিম আচারও এই হুসেনী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মানেন, কোনও বিষয়েই নিয়মকানুনের কড়াকড়িকে এঁরা শাঁস ছেড়ে খোলস নিয়ে মাতামাতির শামিল মনে করেন। এই অসামান্য সাধক যে সমস্ত মানুষেরই হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মৈইনউদ্দীনের দরগাহ্‌ হিন্দুদেরও একটা বড়ো তীর্থ, হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী যেসব স্থানে মিলিত হয় সেসবের মধ্যে বোধকরি পুষ্করের এই তীর্থটিই মহত্তম এবং প্রার্থনা নমাজ ধর্ণা মানত দোয়া ইত্যাদির জন্যে আজও প্রতিদিন ধর্মনির্বিশেষে শত শত নরনারী এই তীর্থে উপস্থিত হয়। ওই আমলে সমস্ত ধর্মের ও সম্প্রদায়ের জনসাধারণের উপর অতুলনীয় প্রভাবের দরুন তাঁকে বলা হতো আফতাব-ই-মুল্‌ক্‌-ই-হিন্দ্‌ বা ভারতীয় জগতের সূর্য।

খ্বাজা কুতব অল-দীন বখতীয়ার কাকী বহু সাধকের কাছে ঘুরে শেষে

মৈইনউদ্দীন চিশতীর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কাকা নামে যে-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন তা ওই হুসেনী ব্রাহ্মণদের মতোই আধা-হিন্দু আধা-মুসলমান একটা সম্প্রদায়; দিল্লীতে কুতব মিনারের কাছে খ্বাজা কুতব অল-দীন বখতীয়ার কাকীর মাজারও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মপন্থীদের কাছেই অত্যন্ত পবিত্র স্থান। মৈইনউদ্দীন চিশতীর অপর শিষ্য শেখ ফরীদ অল-দীন গঞ্জ-ই-শকর প্রার্থনা করে এমন মাধুর্যের অধিকারী হন যে তাঁর নাম হয় শর্কর বা গঞ্জ-ই-শকর; শর্কর মানে চিনি। তাঁর সাধনস্থান ছিল পাঞ্জাবের মণ্টুগোমারী জেলার অন্তর্গত পাক পত্তন—আদতে এ জায়গাটার নাম ছিল আজুধান, কিন্তু গঞ্জ-ই শকরের সাধনার পরে আজুধান পরিচিত হয় পাক পত্তন অর্থাৎ পবিত্র তীর্থ রূপে। ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর আগে মিষ্টতার আবাস বলে বিখ্যাত এই মহান সাধক তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিজাম-অল-দীন ঔলিয়াকে নির্বাচন করে যান। গঞ্জ-ই-শকরের চাইতে ঔলিয়ার নাম অধিক প্রচারিত ও বহুবিদিত, কারণ কবি আমীর খ্বসরু ও ঐতিহাসিক অল-বীরূনী ছিলেন ঔলিয়ার শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। ঔলিয়ার দরগাও হিন্দু-মুসলমান তথা সমস্ত ভারতীয়েরই ভক্তি নিবেদনের স্থান। এসব মুসলিম সাধকেরা কেউই রক্ষণশীল ছিলেন না এবং সমস্ত ধর্মের রক্ষণশীলরাই এজাতীয় উদার সাধকদের সম্বন্ধে মনে মনে বিরূপতা পোষণ করেন একথাও সকলেরই জানা। রক্ষণশীল মুসলিমদের থেকে এঁদের পার্থক্য বোঝাবার জন্যে এইসব বন্ধনহীন মরমী সাধকদেরকে সাধারণত সূফী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

অবশ্য সূফীরা মনে করেন যে কোরানের প্রকৃত মর্ম তাঁরাই গ্রহণ করেছেন। উমায়াদ খলিফাদের জাগতিক আগ্রহ, বিলাসিতা ও ভোগবৃত্তির আধিক্য দেখে তাদেরকেই আবার ধর্মগুরু বলে মনে করা ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের পক্ষে স্বভাবতই কঠিন হলো—তখন খলিফাদের এক্তিয়ারের বাইরে ধর্মসাধনা সম্ভব কিনা তারই অনুসন্ধান শুরু হলো। এই অনুসন্ধানের ফলে সেই চিরন্তন সত্যই আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হলো যে ধর্মের পথ প্রকৃতপক্ষে অন্তর অভিমুখী এবং বাহ্য আচার আদেশ অনুশাসন ইত্যাদির চাইতে অন্তরের আভাস নির্দেশ বিশ্বাস ইত্যাদিই সত্য, অনুষ্ঠানের চাইতে বড়ো সত্য অনুভব এবং এই অনুভূত পথে চলাই হলো ঈশ্বর লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

লক্ষণীয় যে সূফীরা একেবারে খোদ সেই ঈশ্বরকে পাওয়ার কথাই বলেছেন। এত বড়ো স্পর্ধার কথা রক্ষণশীল মুসলিম উচ্চারণে অক্ষম, তাঁর লক্ষ্য হলো আল্লাহ্‌র রিদওয়ান বা অনুগ্রহ লাভ করা তথা স্বর্গবাসের যোগ্যতা

অর্জন করা, কিন্তু সুফ্ বা রুক্ষ পশমের জোব্বা পরিধানকারী মুসলিম মরমী সাধক শুধু স্বর্গবাসের অধিকার পেয়েই সন্তুষ্ট হতে চাইলেন না, তিনি চান ঈশ্বরের নিত্য সান্নিধ্য, নিত্য সঙ্গ, নিত্য লীলা, তিনি চান ঈশ্বরকে লাভ করতে। কিন্তু কিছুকাল পরে সুফীদের কাছে ঈশ্বরলাভের কল্পনাও যথেষ্ট তৃপ্তিকর মনে হলো না, তাঁরা কল্পনা করতে লাগলেন যে প্রেমিক, প্রেমাস্পদ আর প্রেমভাবের মধ্যেও কোনও বিভেদ নেই।

ইতিপূর্বেই ভারতীয় বেদান্তদর্শনের সঙ্গে আরবের দার্শনিকদের পরিচয় হয়েছিল; নবম শতাব্দীতে এই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়। সেসময় নাগাদ ব্রহ্মসূত্র ও বেদান্তের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ একটা বিশিষ্ট দর্শন হিসেবেও গড়ে উঠেছে। আবার একই সঙ্গে খ্রীস্টীয় মরমীদের সাধনা সম্বন্ধেও আরব্য জগৎ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে শুরু করে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে সুফী সাধকরা মেলালেন খ্রীস্টীয় মরমী সাধকদের প্রেমতত্ত্বের সঙ্গে এবং এই মিলন-সাধনে তাঁরা সমর্থন পেলেন 'তিনি আদি ও অন্ত এবং ভিতর ও বাহির' (৫৭,৩) 'আমি মানুষের মধ্যে আমার নিঃশ্বাস পুরে দিয়েছি' (১৫,২৯), 'বলো: যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসো, আমায় অনুসরণ করো; ঈশ্বর তোমায় ভালেবাসবেন ও তোমার পাপ ক্ষমা করবেন' (৩,৩১) প্রভৃতি কোরানেরই উক্তি থেকে। দশম শতাব্দীর গোড়াতে জুনায়েড অনুভব করলেন যে ঈশ্বরের মাধ্যমে ও ঈশ্বরের মধ্যেই মানবের পূর্ণতা এবং 'ঈশ্বর' ও 'আমি' এই দুটি আলাদা শব্দ দুটি আলাদা রূপের কল্পনা জাগায় বটে, কিন্তু ওই আলাদা আলাদা রূপ একটা অধ্যাস, সত্য হলো দুটি রূপেরই অন্তরালে নিহিত একই স্বরূপ।

জুনায়েডের শিষ্য ছিলেন হল্লাজ। ৯১১ খ্রীস্টাব্দে জুনায়েডের মৃত্যুর পরে হল্লাজই হলেন রক্ষণশীলদের চক্ষুঃশূল। তাঁর সমস্ত উপলব্ধির চাবিকাঠি ছিল প্রেম এবং তিনি বিশ্বাস করতেন, 'ঈশ্বর প্রেমসার এবং প্রেমই সৃষ্টির পরম সারাৎসার।' এপর্যন্ত রক্ষণশীলরা বরদাস্ত করেছিল। কিন্তু হল্লাজ যখন ঘোষণা করলেন, 'অনায়ল হক' অর্থাৎ 'আমিই সত্য' তখন রক্ষণশীলরা প্রত্যুত্তরে তাঁকে ক্রুসে বিদ্ধ করে হত্যা করল। মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়ার পরে একজন শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভু, তোমার এই দশা কেন?' উত্তরে হল্লাজ হেসে বললেন, 'তার প্রেমের রীতি এই রকমই—যার সঙ্গে মিলন চায় তাদের এইভাবে সে কাছে টানে।' তারপর তিনি আরবী ভাষায় দুটি পদ রচনা করে পাঠ করলেন—

নদীমী ম্বয়্র মন্স্‌হবিন্ ইলা শয়্'ই ন্ মিন-ল্ঃ হুয়্ফি।
সক্কা-নী মিথ্‌ল মা য়শরিবু কফি লি-দ্ব্-ম্বয়বি বি-দ্ব-ম্বয়্ফি।
ফ-লম্মা দারতি-ল্-কাসি, দ-আ বি-ন্-ত্ব্-ই ব্-স্‌সয়্ফি।
ক-ধী মন্ য়শ্‌রিবু-র্ রাঃহ, মা-অ-ত্-তিন্নীনি ফী-স্ব-স্বয়্ফি॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এদুটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করেছেন, 'আমার বন্ধু—সে দয়ামায়ার কোন-কিছুর সহিত সম্বন্ধের বাইরে। আমায় সে পান করালে যেন যা সে নিজে পান করে, যেমন বন্ধু অতিথিবন্ধুর সঙ্গে করে। সুরাপাত্র ঘুরে আসবার পরে, সে আনিয়ে নিলে মাথা কাটবার জন্য চামড়ার আসন (নত্ব্) আর তলোয়ার। এমনিই তার ঘটে যে সুরাপান করে মহানাগের সঙ্গে, গ্রীষ্মকালে।' শেষ ছত্রটির সঙ্গে সুনীতিকুমার ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৬ সূক্তের শেষ ঋকের দ্বিতীয়ার্ধের বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন 'ইণ্ডো ইরানিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইসলামিক মিষ্টিসিজম—ইরান অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধটিতে। ঋগ্বেদের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি হলো 'কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্ রুদ্রেণাপিবৎ সহ'। যেহেতু রুদ্রের সঙ্গে একপাত্রে বিষপান করেছেন তাই কেশী দিব্যোন্মাদ। তেমনই হল্লাজও সেই তিন্নীনি বা মহানাগ অর্থাৎ য়কীন বা স্থির ধ্রুব সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের সঙ্গে সুরাপান করেছেন। সেই মহানাগের বন্ধনপাশে তিনি এমনভাবে আবদ্ধ যে আর-সমস্তই তাঁর কাছে অলীক, তিনি ও সেই সত্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে এক। ক্রুসে বিদ্ধ করার আগে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়, তারপর একে একে হাত পা কেটে ফেলা হয়, সবশেষে ক্রুসে বিদ্ধ করা হয়। বেত্রাঘাতের সময় প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে 'অঃহদ্' 'অঃহদ্' অর্থাৎ 'এক 'এক' উচ্চারণ করেন। স্পষ্টতই অঃহদ্ এবং একামেবাদ্বিতীয়ম্-এর তাৎপর্য অভিন্ন।

যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ডের সামনে পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসীদেরও হৃদয় ক্ষণিকের জন্যে বিচলিত হয়। কিন্তু ক্রুসে বিদ্ধ অবস্থায় হল্লাজের অন্তিম প্রার্থনা অবিস্মরণীয়, 'তোমার ধর্মের প্রতি উৎসাহে ও তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তোমার যেসব সেবকেরা আমায় নিধন করার জন্যে সমবেত, হে ঈশ্বর, তাদের ক্ষমা কোরো, তাদের প্রতি দয়া কোরো, আমার কাছে যা প্রকাশ করেছ তা যদি এদের কাছেও প্রকাশ করতে তাহলে এরা একাজ করত না, আর এদের কাছে যা গোপন রেখেছ আমার কাছেও যদি তা গোপন রাখতে তাহলে আমিও এই কষ্ট পেতাম না। তুমি যা করো তাতেই তোমার মহিমা, যা ইচ্ছা করো তাতেই তোমার মহিমা।' কার উদ্দেশে হল্লাজের এই অন্তিম

প্রার্থনা? মৃত্যুর আগের মুহূর্তে কার উদ্দেশে তাঁর এই জয়ধ্বনি? হল্লাজ নিজেই তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন, 'যাকে আমি ভালোবাসি সে-ই আমি এবং আমাকে ভালোবেসে আমি তাঁকেই ভালোবাসি; একই দেহে আমরা দুটি আত্মা বাস করি, আমাকে দেখলেই তাঁকে দেখা হয়, আর তাঁকে দেখলে আমাদের দুজনকেই দেখা হয়।' হল্লাজ যখন 'আমি'র কথা বলেছেন তখন শুধু নিজের কথা বলেননি, সমগ্র মানবের কথা—প্রত্যেক ব্যক্তির কথাই বলেছেন। তাঁর চিন্তার মূল কথাটি হলো এক ধরনের তওহীদ বা অদ্বৈতবাদ: প্রেমের মধ্যেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির স্বরূপ বিধৃত, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই পরমসত্তার বাস ও পরমসত্তার মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টির তথা মানবের স্থিতি।

প্রথম দিকের সুফী সাধকদের মধ্যে অল-হসন বসরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুনিয়া অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক জীবন সম্বন্ধে গভীর বিরাগ তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য, কেননা 'এই নিচের পৃথিবী হলো একটা বাড়ি যার আবাসিকরা লোকসানের জন্যেই খাটে এবং এর থেকে নিবৃত্তিতেই এখানে একজন সুখী হতে পারে। বাসনায় বা প্রেমে যে ব্যক্তি এই দুনিয়াকে মিত্রতা দেয় সে তার বদলে দুর্ভাগ্য পায় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার শরিকানা নষ্ট হয়।' খলিফা উমর ইব্‌ন্ আবদল-আজিজ-কে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন, 'আমার প্রতিদিনের খাদ্যই আমার ক্ষুধা, পরিচয়-চিহ্নই আমার ভয়, আমার পরিচ্ছদ কর্কশ পশম, রাত্রে আমার লণ্ঠন হলো চন্দ্র আর দিনের আগুন সূর্য আর আমার ফলমূল ও লতাপাতা হলো যা জন্তুজানোয়ারের জন্যে পৃথিবী নিয়ে আসে। সারারাত্রি আমার কিছুই নেই, কিন্তু আমার চাইতে ধনীও কেউ নেই।'

সুফীদের মধ্যে ভিখিরী-রাজা বলে বিখ্যাত হন পারস্যের অন্তর্গত খুরাশানের ইব্রাহিম ইবন আধম যিনি আদতে একজন আরব ও বলখের রাজপুত্র। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে সঙ্গে কুকুর নিয়ে শিকারে যান, তারপর শিকারের পেছনে ছুটতে ছুটতে একটা সময়ে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলে শুনতে পান, 'ও ইব্রাহিম, এজন্যেই কি তোমায় সৃষ্টি করা হয়েছিল? এই করতেই কি তোমায় বলা হয়েছিল?' থমকে গিয়ে তিনি ভাবলেন, ও তাঁর মনের ভুল। তিনবার এরকম হলো। তারপর শুনলেন, 'এজন্যে তোমায় সৃষ্টি করা হয়নি। এই করতে তোমায় বলা হয়নি।' এর পর তিনি এক মেষপালককে তাঁর রাজকীয় পরিচ্ছদ ঘোড়া, অস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে তার জোব্বা পরে নিয়ে পায়ে হেঁটে মক্কা রওনা হলেন।

৮৫১ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহিম ইব্‌ন্ আধমের মৃত্যু হয়। তাঁর শিক্ষা তাঁর বাণী

ও আলাপে পাওয়া যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনার ঈশ্বর বিশ্বাসকে আপনি কিসের উপর স্থাপন করেন?' তিনি বলেন, 'চারটি সূত্রের উপর। প্রথমত, আমি দেখেছি আমার প্রতিদিনের ভাগের খাবার আমি ছাড়া আর কেউই খেতে পারবে না—এইটে জেনে আমি নিশ্চিন্ত আছি। দ্বিতীয়ত, আমি জেনেছি আমার করণীয় কাজ আমি ছাড়া আর কেউই করবে না—আমি তাতেই ব্যস্ত আছি। আমি জেনেছি মৃত্যু আসে একেবারে হঠাৎ, তাই আমি তার দিকেই এগোচ্ছি। এবং জেনেছি যেখানেই থাকি না কেন আল্লাহ্‌র চোখের আড়ালে কখনও নেই, তাই তাঁর চোখের সামনে বিনীত হয়ে থাকি।'

সুফী চিন্তাধারা একটা সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে মহিয়সী রাবিয়া অল-অদ্বয়ীয়ার আবির্ভাবে। প্রথম জীবনে রাবিয়া ছিলেন দাসী এবং তাঁকে নিযুক্ত করা হতো বাঁশি বাজিয়ে প্রভুর পার্ষদদের সন্তুষ্ট করার কাজে। কিন্তু পরম সত্তার জন্যে তীব্র আকুলতা, পরম সত্তাকে পাওয়ার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং পরম সত্তার প্রতি যে প্রেমাসক্ত হয় সে দেখতে পায় সেই সত্তার প্রকাশিত রূপ—এইসব কথাগুলো রাবিয়ার উপলব্ধি থেকেই প্রথম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার লাভ করে। একবার নবী মহম্মদ স্বপ্নে দেখা দিলেন রাবিয়াকে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাবিয়া, তুমি কি আমায় ভালোবাসো না?' তখন রাবিয়া উত্তর দিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র নবী, তোমায় ভালোবাসে না এমন কে আছে? কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্যে ভালোবাসা আমার সমস্ত কিছুকে এমনভাবে দখল করে আছে যে আমার মধ্যে আর কারও জন্যে প্রেম বা ঘৃণার জায়গা নেই।'

ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করার এক চরম আদর্শ রাবিয়ার জীবনে ও বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে এবং স্বভাবতই তাঁর প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী, মীরা প্রভৃতির কথা মনে জাগে। রাবিয়া বলেছেন, 'ভয় থেকে, আতঙ্ক থেকে কিংবা পুরস্কারের লোভ থেকে আল্লাহ্‌র সেবা করা খুব খারাপ দাসদাসীর কাজ—কিন্তু বেশির ভাগই তাই।' আর একবার বলছেন তিনি, 'স্বর্গ আছে কি নেই, নরক আছে কি নেই —এসবের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক কী? তাঁর সেবা করাতে আমার আনন্দ— সেই সেবার অন্য কোনও কারণ নেই।' অহেতুকী ও নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রেমের ধারণা আরব জগতে এমন গভীর পরাক্রান্ত ও রূপে আগে কখনও উচ্চারিত হয়নি। তাঁর একটি প্রার্থনা: 'হে আমার প্রভু, আকাশ ভরে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে, চোখগুলো বন্ধ, রাজার দরজা-জানালা বন্ধ, সব প্রেমিকারা এখন তাদের প্রিয়র কাছে একা, আর আমিও এখন তোমার কাছে একা।'

প্রায় একই সময়ে, নবম শতাব্দীতে বিশেষ করে খলিফা অল-মামুনের আমলে স্থফীদের অন্তর্সাধনার পদ্ধতির বিপরীতে যুক্তিপ্রধান বিশ্লেষণের পথে গড়ে ওঠে মুতাজিলাদের তওহীদ। আবার এই মুতাজিলাদের চিন্তাধারার সঙ্গে নব্য গ্রীক ও ভারতীয় চিন্তাধারারও প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। কোরানে বলা হয়েছে যে মানুষের ভাগ্য স্বয়ং ঈশ্বর পূর্ব-নির্ধারণ করে রাখেন, কিন্তু তা-ই যদি হয়, মুতাজিলারা বললেন, তাহলে বলতে হয় যে ঈশ্বরই মানুষের জন্যে কুকর্ম নির্দিষ্ট করেন এবং পরে সেজন্যেই আবার মানুষকে শাস্তি দেন, স্থতরাং এর পরে ঈশ্বরকে দয়ালু বা স্নেহপ্রবণ বলা হাস্যকর। এই যুক্তিতে কোরানে বর্ণিত পূর্ব-নির্ধারণের তত্ত্বকে অবাস্তব প্রমাণ করে মুতাজিলারা বললেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতই দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ এবং তাঁর এই স্বরূপের যথার্থ প্রকাশ ঘটে যদি মানুষের আপন কর্ম নির্বাচনের দায়িত্ব ও স্বাধীনতা থাকে, কারণ সেক্ষেত্রেই সে দায়িত্ব বহনের অক্ষমতা ও স্বাধীনতার অপব্যবহারের জন্যে ঈশ্বরের রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হওয়ার যথার্থ প্রশ্ন ওঠে, এবং অন্য সব অবস্থায় তিনি সত্যিই সৃষ্টিপ্রেমে পূর্ণ। উপরন্তু মুতাজিলারা ঘোষণা করলেন যে কোরানে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব গুণে পরিস্ফুট হয়েছে ঈশ্বরের এক একটা সত্তা এবং তার ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় একাধিক সত্তার কল্পনা জাগে আর এক-একটা সত্তা এক-একটা ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই যেন প্রতীকায়িত করে। স্থতরাং ঈশ্বর যখন অদ্বিতীয় এবং অনন্ত তখন তাঁর আর কোনও গুণ থাকতে পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বর অদ্বিতীয় ও অনন্ত এটুকুই তাঁর গুণ, এ ছাড়া তিনি নির্গুণ। তাছাড়া তাঁরা আরও বললেন যে কোরান অনন্ত এবং তা সৃষ্টি করা হয়নি এরূপ বিশ্বাসও ভ্রান্ত, কেননা তাহলে মানতে হয় যে কোরানও অপর এক আল্লাহ্। কেন তা মানতে হবে? একমাত্র আল্লাহ্ই অনন্ত এবং একমাত্র আল্লাহ্কেই সৃষ্টি করা হয়নি—কোরান নয়, একমাত্র আল্লাহ্ই অসৃষ্ট।

দশম শতাব্দীর গোড়াতে আশা'রি নামক তত্ত্ববিদের শিক্ষার ভিত্তিতে মোট উনত্রিশটি নিবন্ধ একখানি গ্রন্থে সংকলিত হয়—গ্রন্থটি 'দ্বিতীয় ফিক আকবর' নামে বিখ্যাত। রক্ষণশীল ইসলামের বহু বক্তব্যকে এতে সংশোধন করা হয়। গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত বক্তব্যগুলির মধ্যে একটি বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য—আল্লাহ বিশ্বাস ও অবিশ্বাস থেকে নিরপেক্ষ বা মুক্ত রূপে মানুষকে সৃষ্টি করেন, তার পর মানুষকে কতকগুলি নির্দেশ দেন, কিন্তু কিছু লোক সেই নির্দেশকে অস্বীকার করল। অবিশ্বাস করার কারণ আল্লাহ্ই তাদের পরিত্যাগ করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কাউকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেন না। গুনাহ বা পাপ মানুষ করতে

পারে। যে ব্যক্তি পাপ করেও অনুতপ্ত হয় না তার ভাগ্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—আল্লাহ্‌ তাকে দোজখে বা নরকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার ক্ষমা করতেও পারেন।

রক্ষণশীল ইসলামের এইসব সংশোধনমূলক বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে দেরি হলো না। দশম শতাব্দীতে অল-মাতুরীদী যুক্তি দিয়েই যুক্তিবাদী মুতাজিলাদের আক্রমণ করেন। কিন্তু সংশোধনবাদী বা সমালোচকরা সব চাইতে প্রবল আঘাত পেল একাদশ শতাব্দীর ইসলাম তত্ত্ববিদ অল-ঘজালীর কাছ থেকে। অল-ঘজালীর মতো জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর সব ধর্মের ইতিহাসেই খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। মুতাজিলাদের যুক্তিকে খণ্ডনের চেষ্টা না করে তিনি 'তহাফৎ অল-ফলাসিফ' বা 'দার্শনিকদের মধ্যে অসংগতি' নামক রচনায় যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতাকেই প্রকট করলেন। ঈশ্বরের মুখ বললেই যে মানুষের মুখের অবিকল একটা রূপ কল্পনা করা হয় এটা যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ তা স্বীয় অভিজ্ঞতার পরিমাপেই সব কিছুকে ধারণ করে। আক্ষরিক অর্থে রূপ না বুঝিয়ে ঈশ্বরের রূপ বলতে তাঁর স্বরূপকেই বোঝায়, তা যুক্তিবেধ্য নয়, তা শুধু অনুভবসাধ্য। যেহেতু মানুষ বস্তুজগৎ দিয়ে পরিবৃত তাই সেই ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনাতে বিভিন্ন দৃষ্ট বস্তুর রূপের অনুষঙ্গ অন্বেষণ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তার থেকে বস্তুরূপের প্রাকাম্য প্রমাণিত হয় না।

বিষয়টা খুলে বলা ভালো।

'তহাফৎ অল্‌-ফলাসিফ্‌' রচনাতে অল-ঘজালী প্রথমেই বিশ্বের কোনও শুরু বা সূচনা নেই এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার দার্শনিক দম্ভ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি শুধু আরব দার্শনিকদের নিয়ে নয়, সোক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকদের নিয়েও আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির বেশির ভাগটাই বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কিত আলোচনাতে পূর্ণ। অ্যারিস্টটলের বিশ্ব অনাদ্যন্ত—তা সর্বদাই ছিল ও আছে। অসীমকালের মধ্যে কোনও এক সময়ে বিশ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকলে কোনও একটি প্রবেগ প্রথমে বিশ্ব সৃষ্টির ইচ্ছা বা প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, তার ফলেই বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে অস্তিত্বহীনতা অথবা কোনও প্রৈতিময় বিদ্যমান সত্তা থেকে, এবং জনকের যেমন জনক থাকে তেমনই প্রথম প্রবেগের আগে কোনও প্রবেগ ছিল, আবার, সেই প্রবেগেরও আগে কোনও প্রবেগ ছিল, ফলে প্রবেগের পরম্পরা শেষ পর্যন্ত অন্তহীন হয়ে ওঠে। সুতরাং—হয়, বিশ্ব সর্বদা ছিল ও আছে, নতুবা

কোনও অনাদ্যন্ত সত্তা, তাকে ঈশ্বর বলতে পারি, কোনও এক সময় বিশ্ব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিল।

কিন্তু ওই সত্তা শুধু অনাদ্যন্ত নয়, তা পরিবর্তনশীলতার অতীত। অনাদ্যন্ত পরিবর্তনাতীত সত্তা যদি কোনও এক সময়ে একটি নতুন সিদ্ধান্ত নেয় যে বিশ্ব সৃষ্টি করবে তাহলে মানতে হয় সেই সত্তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল অথবা সেই সত্তার ইচ্ছা পরিবর্তনসাপেক্ষ অথবা সেই সত্তা নিজেই পরিবর্তনের অধীন। এখন প্রশ্ন : পরিবর্তনের স্বরূপ কী? তার স্বরূপ এই যে তা সময়ের সঙ্গে আপেক্ষিক সম্পর্কে অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা—সময় চলছে বলেই পরিবর্তন হয় কিংবা পরিবর্তন ঘটছে বলেই সময় চলে। যখন বলি, অমুক জিনিসের পরিবর্তন নেই তখন তার অর্থ এই নয় কি যে সময় চলে যাওয়া সত্ত্বেও অমুক জিনিসটার কোনও পরিবর্তন ঘটছে না?

ঈশ্বরকে অনাদ্যন্ত ও পরিবর্তনাতীত বলার অর্থ হলো—কাল বা সময় থেকে নিরপেক্ষ রূপে ঈশ্বর অবস্থান করে। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসঙ্গে সময়ের প্রসঙ্গ আসতেই পারে না। এখন প্রশ্ন : সেই পরম সত্তা বা সত্ত্ব কি সময়ের মধ্যে অবস্থান করে? সময়ের মধ্যে অবস্থান করলে তাকে অনাদ্যন্ত ও পরিবর্তনাতীত বলা ভুল। আর ঈশ্বর যদি অনাদ্যন্ত ও পরিবর্তনাতীত হয় তাহলে সময়ের প্রসঙ্গ অবান্তর—তাহলে সেই সত্তা কোনও এক সময় বিশ্ব সৃষ্টি করার ইচ্ছা করল বলাও ভুল। কোনও এক সময় ইচ্ছা করল বলা মানেই তো সেই সত্তাকে সময়ের হিসাবে বেঁধে ফেলা। মনুষ্য সত্তা সময়ের মধ্যে অবস্থান করে, তাই সে কোনও এক সময়ে জন্মায়, কোনও এক সময় কোনও বিশেষ ইচ্ছা করে, কোনও এক সময়ে মরে যায়। যা সময়ের মধ্যে অবস্থান করে না ও যা সময়ের হিসাবে পরিমাপ-যোগ্য নয় তার ক্ষেত্রে কোনও এক সময়ের ইচ্ছা বলা ভুল।

অল-ঘজালী বললেন, আল্লাহ্ অনাদ্যন্ত, তাঁর ইচ্ছাও অনাদ্যন্ত অর্থাৎ ঈশ্বর ও ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রসঙ্গে সময়ের প্রসঙ্গ আসে না, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার যেটা বস্তু, অর্থাৎ বিশ্ব, সেটা সময়ের মধ্যে স্থিত—এক কথায়, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তাঁর ইচ্ছাবস্তু এই দুটোর মধ্যে মৌল পার্থক্য বর্তমান। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের ব্যাখ্যাতে : 'অনাদ্যন্ত স্বরূপ থেকে ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন যে বিশ্ব হোক। কিন্তু তিনি এই ইচ্ছা করলেন না যে অনাদ্যন্ত থেকে বিশ্ব হোক।' আবার রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, ঈশ্বর অন্তহীন ও অন্তময়, পরিবর্তনাতীত ও পরিবর্তনাধীন, একই সঙ্গে নির্গুণ ও সগুণ, যেমন ছোটছেলে কখনও খেলা করে, আবার কখনও চুপচাপ বসে

থাকে। ঈশ্বর অনন্ত অদ্বিতীয়—এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেও অল-ঘজালী আল্লাহকে ঐতিহ্যগত অর্থে গুণময়ই বললেন এবং সেই সগুণ ঈশ্বর যে একমাত্র অন্তর্সাধনাতেই তথা শূফীমার্গেই ধ্যেয় এই সত্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করলেন। অল-ঘজালী কোরানের মাহাত্ম্যকে পুনরুদ্ধার করলেন বটে, কিন্তু সে সঙ্গে একথাও মানলেন যে মানুষ সুকর্ম কি কুকর্মের পথ বেছে নেবে সেটা প্রাসঙ্গিক মানুষের উপরেই নির্ভর করবে, আবার ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্যে আচার অনুষ্ঠানের পালন নয়, অনুভব ও আন্তরিকতাই যে একমাত্র মূলধন একথাও তিনি প্রচার করলেন। এভাবে তিনি কোরান, সুফীধ্যান ও মুতাজিলাদের বক্তব্যের মধ্যে এক অসাধারণ সমন্বয় সাধন করলেন।

আরব্য জগতে ইসলামের এই বিবর্তনের পরিণাম অনিবার্যভাবেই অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হলো এবং ভারতবর্ষেও রক্ষণশীল ইসলামের সমান্তরালে বিবর্তিত রূপের যে-ইসলাম তারও প্রসার হতে থাকল। হল্লাজকে হত্যার পরে শূফী আন্দোলন কিছুকাল গুপ্তভাবে ও শ্লথগতিতে চলার পরে অল-ঘজালীর চিন্তাধারার অনুসরণে নতুন উদ্যমে ও নির্ভয়ে মরমী মুসলিম সাধকদের সাধনায় বিকশিত হতে থাকল, ওইসব সাধকেরা পুনরায় প্রকাশ্যে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। আরব্য জগতের সঙ্গে ভারতীয় জগতের বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক যেমন দীর্ঘকালের তেমনই সাংস্কৃতিক সম্পর্কও; এবং ভারতবর্ষের ধনভাণ্ডারের মতো জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতিও আরব্য জগৎ বহুকাল ধরে তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছে। ওই বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হলো আধ্যাত্মিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক এবং সেজন্যে অন্তর্সাধনপন্থী মুসলিমরাও ভারতবর্ষের প্রতি একই রকমের তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছেন—তাঁদের সে আকর্ষণ মেটাবার পথে মধ্যে মধ্যে বাধা এসেছে কিন্তু সেসব সাময়িক বাধাকে অতিক্রম করে আবার তাঁরা ভারতবর্ষের সন্ধানে বের হয়েছেন যেন তা তাঁদের কাছে উৎস-পরিচয়ের সন্ধানে অভিযান।

চিশতী ও কাকা সম্প্রদায়ের মতো সুহ্‌রাওয়র্দী, ইসমাইলীয়, কাদিরী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধকগণও একে একে ভারতবর্ষে এসে স্ব স্ব ধর্মপথের নিশানা দিলেন। বহা-উদ-দীন জকারিয়া বাগদাদে গিয়ে সীহাব-উদ-দীন সুহ্‌রাওয়ার্দীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে মূলতানে আসেন; তাঁর অন্যতম শিষ্য মখদুম লাল শাহবাজ কলন্দর সিন্ধু এলাকায় সুহ্‌রাওয়ার্দী মত প্রচার করেন এবং ওই এলাকার অধিবাসীরা ধর্মমত নির্বিশেষে তাঁর বিরাট ভক্তমণ্ডলীতে পরিণত হয়। ইসমাইলীয় সম্প্রদায়ের একটি শাখা অ্যাসাসিন নামে সিন্ধুকে

কেন্দ্র করে ধর্মমত প্রচার করতে থাকে এবং এরাই পরবর্তীকালে আগা খাঁকে ধর্মগুরু করে খোজা সম্প্রদায় বলে নিজেদের অভিহিত করে। খোজা সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো দশ অবতার। এরা অবতারবাদে বিশ্বাস করে এবং এদের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে শেখ সদ্‌র্-উদ-দীন দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সঙ্গে ইসলাম মতে প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ, খলিফা আলী ও মানব বংশের আদি পুরুষ আদমের একটা অভিনব সমীকরণ সমাধা করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের উপরেই বিপুল প্রভাব অর্জন করেছিলেন।

ইসলামের মরমী সাধনা প্রধানত ভারতবর্ষের সেই অঞ্চলেই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল যে অঞ্চলকে আর্যাবর্ত বলে একদা আমরা চিহ্নিত করেছিলাম। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে শিক্ষায়তনগুলিতে যা পড়ানো হয় তা সাধারণত এই আর্যাবর্তেরই ইতিহাস, সেখানে দক্ষিণ ভারতের গুরুত্ব ও তার স্থান দুটোই মর্মান্তিক রূপে সংকুচিত, সে-ইতিহাসে দক্ষিণ ভারতীয়েরা যেন অনাহূত রূপে প্রবেশ করেছে। যা হোক, মরমী ইসলাম সাধকদের মধ্যে বোধ করি সয়ীদ মজহর আলী-ই প্রথম, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, দক্ষিণ ভারতে যান ও ত্রিচিনপল্লীকে তাঁর সাধনক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করেন। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মুসলিম সাধকদের মধ্যে সয়ীদ ইব্রাহিম শাহীদ, বাবা ফকরদ্-উদ-দীন, শেখ মুন্তখব-উদ-দীন, জরি-জরবখ্‌শ্‌ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে গুল্‌বর্গের বান্দা নওয়াজ গীসু দরাজ নামে অধিক পরিচিত মুহম্মদ অল-হুসাইনী দক্ষিণ ভারতের সুফী সাধকদের মধ্যে সব চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন।

সম-সময়ে অর্থাৎ ওই ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শেখ কুতব-উদ-দীন বখতিয়ার কাকীর শিষ্য শেখ জলাল-উদ-দীন টবরীজী কাকা মত নিয়ে আসেন ভারতের পূর্বপ্রান্তে—বাংলাতে।

কাদিরী মতের উদ্ভব হয় আরও পরে—পঞ্চদশ শতাব্দীতে—এই মতকে ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন সৈয়দ মুহম্মদ। মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌ যে অত্যন্ত উদারচেতা ছিলেন সেকথা বহুজনবিদিত, কিন্তু অনেকেই জানেন না ইয়োরোপে উপনিষদের প্রচারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল—দারা শিকোহ্‌ কর্তৃক ফারসীতে অনূদিত উপনিষদগুলি-ই ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ আঁকেতিল দুপের স্বদেশে নিয়ে যান এবং ফারসী অনুবাদ থেকেই ছান্দোগ্য উপনিষদ লাতিনে অনুবাদ করেন আর সেই অনুবাদ-পাঠেই জার্মান

দার্শনিক শোপেনহাওয়ের ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। দারা শিকোহ্ ছিলেন কাদিরী মতাবলম্বী। সপ্তদশ শতাব্দীতে শাহ জলাল বাংলা দেশেও কাদিরী মত প্রচার করেন এবং একটা সময় কাদিরী মত বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

এভাবে ইসলামের মরমীবাদ অতি অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে যেতে থাকে। এটা সত্য বটে যে মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই উৎপীড়নের ত্রাসে অথবা স্বার্থের প্রয়োজনে ভারতবাসীদের একটা অংশ ইসলাম গ্রহণ করে শিথিল অর্থে একটা রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল—এই রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় স্বভাবতই শাসক-মুখী ছিল, যেমন ইংরেজ আমলে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় শাসক-মুখী ছিল, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে শিক্ষাব্যবস্থা যে জিনিস, মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ধর্ম মূলত সেই জিনিস তথা একই উদ্দেশ্যে বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। কিন্তু সে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে ওই রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় গড়ে তোলা হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার অনেক পরে এবং ওই রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে জনসাধারণের কোনও সময়েই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না, যেমন ইংরেজ আমলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণের সম্পর্ক ক্ষীণ ছিল। এ সঙ্গে একথাটাও মনে রাখা কর্তব্য যে প্রাক্-ইংরেজ রাজনীতিতে ভারতবর্ষের জনসাধারণের কোনও ভূমিকা ছিল না—অ-রাজপুরুষ জনসাধারণেরও যে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার অধিকার আছে এ সত্য প্রথম রামমোহন রায়ই প্রতিষ্ঠা করেন—এর থেকে এটাই মনে হয় যে শাসনকর্তাদের ধর্মাধর্মে জনসাধারণেরও বিশেষ আগ্রহের কারণ ছিল না। মামলুকদের শাসনকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই মুসলিম সাধকরা ভারতবর্ষের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য জনসাধারণের জীবনে উপনীত হয়েছিলেন এবং তার ফলে ভারতীয় জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামকে গ্রহণ করেছিল নিতান্তই আন্তরিক আধ্যাত্মিক আকর্ষণে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[বহিরাগত ধর্মের আগমনে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিক্রিয়া]

রাষ্ট্রীয় স্তরে ইসলামের অগ্রগতি রোধে প্রাচীন ভারতবর্ষ সমর্থ হয় নি, কেননা কনৌজের সাম্রাজ্য লুপ্ত হওয়ার পরে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় শক্তিকে পুনরুদ্ধার ও সংহত করার মতো নতুন কোনও সাম্রাজ্যের উত্থান হয়নি, ফলে গোটা ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে রাজনৈতিক অর্থে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। বোধকরি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানই প্রাচীন ভারতীয় শক্তির সর্বশেষ প্রতিভূ এবং ১১৯২ সালে মহম্মদ ঘূরীর কাছে তরাইনের যুদ্ধে তাঁর অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পরে ভারতবর্ষে এমন কোনও শক্তি থাকল না যা মুসলিম অভিযানকে প্রতিহত করতে পারে। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের সূর্যাস্তের সন্ধিক্ষণেই ভারতীয় ইতিহাসে ইসলামের চন্দ্রোদয় ও মধ্যযুগের শুরু হয়। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে ইসলামের শক্তির উত্থানে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার ফলেই ইয়োরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে তখনও সনাতন ধারা অনুসারী সাম্রাজ্য ছিল যদিও সে-ধারায় অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। মহম্মদ ঘূরীর সামরিক সাফল্য নিশ্চিত ভাবে প্রাচীন বা সনাতন ভারতের পরিসমাপ্তি প্রমাণ করল।

দেশের রাজনৈতিক বিপর্যয় দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে অনিশ্চিত করে তোলে ও আর্যাবর্ত চেতনার বিলোপ ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক তথা দার্শনিক উৎকর্ষের অবসান ঘটিয়ে দৈন্যের সূচনা করল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-চেতনা বা হিন্দুত্বের উদ্ভব প্রকৃতপক্ষে ওই দারিদ্র্যকে গৌরবে রঞ্জিত করার দুর্মর প্রয়াসমাত্র। নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য বেদান্তের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বটে। কিন্তু শঙ্করাচার্যের কীর্তির তাৎপর্য সাধারণ ভারতবাসীদের বোধগম্য হয়েছিল কি না এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে তাঁর টীকা-ব্যাখ্যা-ভাষ্য জনসাধারণের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মুখ্যত বিদ্বৎ সমাজের বুদ্ধি-সর্বস্ব আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল এটাই মনে হয়।

একদা অন্ধ বিশ্বাস ও অসার আচার-অনুষ্ঠানের হাত থেকে বুদ্ধদেব ভারতবর্ষকে

রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু অচিরেই তাঁর ধর্মমত—বিশেষত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে—বিবর্তিত হতে হতে অষ্টম ও নবম শতকে এসে মুক্তির সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ হিসেবে মন্ত্র, মণ্ডল ও বিভিন্ন গুহ্য আচারাদিকে বেছে নেয়। বিহার ও বিশেষ রূপে পাল রাজাদের আশ্রয়ে বাংলা দেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বৌদ্ধধর্ম তার স্বাতন্ত্র্য প্রত্যাহার করে নেয়। সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মও বহুলাংশে ক্রম-প্রসারমান তন্ত্রসাধনার কাছে তার অকপটতা ও শুদ্ধতার আদর্শগুলিকে কালক্রমে জলাঞ্জলি দেয়। যেহেতু উচ্চমার্গে শাস্ত্রীয় সাধনা শুধু উচ্চ ব্যক্তিত্বের যাঁরা অধিকারী তাঁদেরই উপযুক্ত এরূপ ধারণা জনসাধারণের চিত্তে জাগানো সহজ, তাই তন্ত্রসাধকগণ সর্বজনবোধ্য মোক্ষ সাধনার রীতিনীতি রূপে আগম-নিগমাদি প্রণয়ন করেন, কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল যে সে সবও সকলের যোগ্য ও সাধ্য নয় এবং অর্বাচীনদের হাতে পড়ে তা বিকৃত ও বীভৎস আচারে পরিণত হয় ও সমাজে দুর্নীতির বান ডেকে আনে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দেউলেদশার পটে যেমন মুসলিমদের রাজনৈতিক উত্থান তেমনই ভারতীয় জীবনে অন্তরের অনুভূতির পরিবর্তে বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাব ও আধ্যাত্মিক অপকর্ষের দুঃসময়েতেই ইসলাম ধর্মের জয়যাত্রা। মুসলিম শক্তির সাফল্য শুধুমাত্র তাদের বীর্যবত্তার নয়, ভারতীয় শক্তির তৎকালীন চরম দৈন্যেরও অকাট্য প্রমাণ।

রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে ইসলামের অভিযানকে প্রতিরোধে শোচনায় ব্যর্থতার পরে পরাভূতের মনস্তত্ত্বে তাড়িত হয়ে সনাতন ভারতবর্ষ আপনাকে গুটিয়ে নিল দুর্ভেদ্য সামাজিক নির্মোকে; পরবর্তীকালে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এই একই মনস্তাত্ত্বিক কারণে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আধুনিক শিক্ষার থেকে নিজেদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে। ঐতিহ্য-বাহিত স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন-গুলিকেও দৃঢ়তর করে তুলল যাতে হিন্দুসমাজের সুদূর নিঃসঙ্গ দুর্গ সর্বার্থে সুরক্ষিত হয়; এবং সমাজপতিদের তৎপরতা সব চাইতে প্রকট হলো বর্ণাশ্রম প্রথার শৃঙ্খলানুবর্তিতায়। গৌতম-ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের আচরণে অনেকখানি স্বাধীনতা ও রাজারও উপরে ব্রাহ্মণকে স্থান দেওয়া হয়েছিল, এর দরুন ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা আশঙ্কা করে স্মৃতিভাষ্যকার বিজ্ঞানেশ্বর সে-স্বাধীনতা হরণ করে বললেন যে একমাত্র বিশেষ সদাচারী ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণদেরকেই সূচিবদ্ধ মাত্র ছ-টি অপরাধের জন্যে রাজা শাস্তি দিতে পারবেন না, কিন্তু বাকি সব ক্ষেত্রে অন্যান্য সব ব্রাহ্মণদেরকে শাস্তি দিতে পারবেন। অপর ভাষ্যকার হরদত্ত শুধু সদাচারী ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের উল্লেখে তুষ্ট হলেন না, তিনি সদাচার ও জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ

ও বিশদ করে বিধান দিলেন যে ওইসব অপরাধ সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত বা আকস্মিক যদি হয় শুধু তবেই ব্রাহ্মণ অব্যাহতির যোগ্য হবে, নতুবা নয়। অনুলোম বিবাহজ জাতকের উপবীতধারণ অনুমোদন করা হলেও প্রতিলোম বিবাহজ জাতকের জন্য উপবীত নিষিদ্ধ করা হলো। এসবের থেকে এটাও মনে হয় যে সে সময় সদাচার ও জ্ঞান ব্রাহ্মণদের আর তত আকর্ষণ করছিল না এবং উপবীতধারণের যে অধিকার তার ব্যভিচার হচ্ছিল।

চাতুর্বর্ণ্যের ভিত্তিতে জাতিপ্রথাকে বহু বিস্তৃত করা হলো, সামাজিক বিন্যাসকে করা হলো যতদূর সম্ভব জটিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে কুড়িটি উচ্চ বর্গ, বারোটি মধ্য বর্গ এবং ন-টি নিম্ন বর্গ, মোট ছত্রিশটি জাতিতে মিশ্রবর্ণ বিভক্ত। এ জাতীয় বিভাগে বৈজয়ন্তী-প্রণেতা সবচাইতে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—তিনটি আদিবাসী জাতি নিয়ে তিনি মোট চৌষট্টি জাতি নির্দেশ করেছেন। স্পষ্টতই ভারতীয় জীবন-চিন্তা থেকে সরলতার আদর্শ তখন অপসৃত হতে শুরু করেছে। তবে বৈজয়ন্তী-প্রণেতা যে আদিবাসীদেরকেও হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এই নজীরটি অনুধাবনযোগ্য। শূদ্রদের জন্যে স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে নানারকম ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ আগে থেকেই ছিল, সেগুলোকে এখন আরও সংকুচিত করা হলো এবং এ সময় থেকেই অপরার্ক ও বিজ্ঞানেশ্বরের বিধানে অস্পৃশ্যতাকে কার্যত সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়, তা ছাড়া শূদ্রকে স্পর্শ করলে সবস্ত্র স্নান ও উপবাসে শুদ্ধির প্রথাও প্রচলিত করা হয়। চণ্ডাল জাতিকে প্রাচীন স্মৃতিকারগণও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু একালের সমাজপতিরাই আরও কয়েক পা এগিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে চণ্ডালকে দেখা বা তার সঙ্গে কথা বলা বা তার ছায়া মাড়ানো প্রভৃতিও প্রায়শ্চিত্তযোগ্য পাতক! বোধকরি এসবের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে এই টীকাকার শুধু ও-সবে সন্তুষ্ট হন নি; বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়তিক বা বস্তুতান্ত্রিক ও নাস্তিককেও তিনি অস্পৃশ্যদের তালিকাভুক্ত করেন।

স্মৃতিচন্দ্রিকা ও স্মৃত্যার্থসার অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ, যদিও দ্বিজজাতি সবর্ণে বিবাহের পরে অসবর্ণে বিবাহ করতে পারে। নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে কন্যার বিবাহদান প্রসঙ্গে স্মৃতির বিধান পুনরাবৃত্তি করা হলেও স্ত্রীর যাতে গৃহকর্মের বাইরে কোনও দিকে মন দেওয়ার অবকাশ ও কোনও রকম স্বাধীনতা না থাকে সে বিষয়ে স্বামী ও পরিবারস্থ পুরুষদেরকে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে ভাষ্যকারগণ নির্দেশ দিয়েছেন। আবার

একই সঙ্গে স্ত্রী-ধন সম্পর্কে তাঁদের উদার মনোভঙ্গি সপ্রশংস দৃষ্টি জাগায়। বিজ্ঞানেশ্বর, অপরার্ক ও স্মৃত্যার্থসার-প্রণেতার মতে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর আত্মদাহ অবশ্যকর্তব্য, যদিও স্মৃতিচন্দ্রিকা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধতা ও প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসরণে বিধবাকে ব্রহ্মচর্য-পালনের আদেশ করেছেন। মাছ-মাংস বা আমিষ খাওয়ার বিষয়েও বিজ্ঞানেশ্বর ও অপরার্ক দুজনেই নানারূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, কিন্তু বাঙালী টীকাকার ভবদেব স্বভাবতই এ বিষয়ে উদার মতাবলম্বী। তবে একালের সমস্ত টীকাকারই গোমাংস ভক্ষণে গুরুতর পাপের পরিচয় পেয়েছেন—গোমাংস ভক্ষণ কোনকালেই ভারতবর্ষে তেমন জনপ্রিয় ছিল না অথবা বহুল প্রচলিত ছিল না, কিন্তু মুসলিম সংযোগর ফলে এ-বিষয়ে বিদ্বেষ জেগেছিল বলেই মনে হয়। গম বা গমজাত খাদ্যকে ম্লেচ্ছভোজ্য, অতএব অবশ্যপরিহার্য বলেছেন বৈজয়ন্তী-প্রণেতা। এর থেকে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে মুসলিম সংযোগের দরুন হিন্দু-মানসে প্রতিক্রিয়া কতদূর গিয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাস্তব প্রয়োজনের চাপে গম বা গমজাত খাদ্য বর্জন করা সম্ভব হয়নি এবং একই চাপে হয়তো কোনদিন গোমাংস ভক্ষণও সমাজে প্রচলিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে এবং এই প্রথম হিন্দুরা বাইরের পৃথিবীর দিকে প্রাচীর তুলে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এক অলীক মোহের জগৎ গড়ে তুলেছিল। বিদেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অথবা বিদেশীদের আত্মস্থ করে নেওয়া দূরের কথা, তারা নিজেদের মধ্যেও অজস্র রকমের ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছিল—নিজেদের বর্ণে বর্ণেও প্রাচীরের বাধাকে এমন দুস্তর করে তুলেছিল যে এক বর্ণের বিদ্যা অন্য বর্ণের কাছে ফাঁস করা গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হলো। আগেও এক গোষ্ঠীর বৃত্তিতত্ত্ব অন্য গোষ্ঠীর কাছে ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সেটা ছিল অর্থনীতির সূত্রের সঙ্গে জড়িত এক এক বৃত্তিজীবীদের সমিতিগত মন্ত্রগুপ্তি বা কৌশলগুপ্তির নীতি, কিন্তু এবারে সেই সমস্যাটা সামাজিক রূপ নিল এবং বৃত্তির স্থান নিল বিদ্যা। অর্থাৎ প্রাচীন বা সনাতন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা জরাগ্রস্ত হয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ ভারতবর্ষের কাঁধে চেপে বসল সিন্দাবাদ নাবিকের পিঠে নাছোড়বান্দা বুড়োটার মতো। প্রাচীন ভারতীয়দের সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয়দের—যাদের আমরা হিন্দু বলে অভিহিত করতে পারি—পার্থক্য অল-বীরুনীর চোখেও পরিষ্কার ধরা পড়েছিল; তাই তাঁর কালের ভারতবাসীদের সম্বন্ধে লিখেছেন, 'যদি তারা বিদেশ ভ্রমণ করত ও বিদেশীদের সঙ্গে মিশত

তাহলে ত্বরায় তাদের মনোভঙ্গির পরিবর্তন ঘটত, কেননা তাদের পূর্বপুরুষেরা বর্তমান প্রজন্মের মতো সংকীর্ণমনা ছিল না।'

যে ভারত একদা বিদেশী শোণিত ও সংস্কৃতিকে আত্মগত করার দুরূহ সাধনাতে ব্রতী হয়েছিল সে-ই যে প্রবল বিদেশী বিদ্বেষী হলো এটা বিস্ময়কর বৈকি। এর মধ্যে কী এমন নতুন মৌল উপকরণ ভারতের মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল? ধর্ম—এ-ছাড়া আর কোনও সদুত্তর নেই।

বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। প্রথম ঝাপটার চোটে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা অনেক পরে আবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম গ্রহণে অনেককে যেমন বলপূর্বক বাধ্য করা হয়েছিল তেমনই ইসলাম ধর্ম দু-বহু প্রসারিত করে ভারতীয়দের আপন বক্ষে আমন্ত্রণও জানিয়েছিল—ফলে হিন্দু সমাজের নবগঠিত সংকীর্ণ ও কঠোর আইনকানুনে জর্জরিত—বিশেষ করে নিম্নবর্ণের ও অস্পৃশ্য জাতিগুলি একই সঙ্গে মানবিক ব্যবহার লাভের ও শাসক শ্রেণীতে উন্নয়নের প্রত্যাশাতে ইসলামকে বরণ করে নিতে অগ্রসর হয়েছিল, কেননা স্বধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলিম সমাজ একান্তরূপে গণতান্ত্রিক ও সমদর্শী। আপন সমাজকে সুসংহত করার জন্যে হিন্দুনেতারা অনুশাসনাদিকে যতই সংকুচিত করতে থাকলেন ততই তাঁদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে এক দল, যাদেরকে বলা যায় নির্যাতিত হিন্দু, তারা আরও বেশি করে ইসলামের কাছে আশ্রয় প্রার্থী হলো।

বাংলাতে পাল রাজাদের আমলে যে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল একথা সর্বজনবিদিত। পালদের পরে পরম শৈব অরিবৃষভশঙ্কর বাংলার রাজা হন বিজয় সেন নামে—তাঁর পুত্র বল্লাল সেন কুলীন প্রথা প্রবর্তন করে বাংলায় হিন্দুসমাজের স্তরবিন্যাসকে আরও বিস্তারিত করেন। 'সেকশুভোদয়া', গোবর্ধন আচার্যের লেখা 'আর্যা সপ্তশতী' ও ধোয়ীর লেখা 'পবনদূত' কাব্যে তৎকালীন বাঙালী সমাজের বিশদ চিত্র পাওয়া যায়—উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা সেসময় বৌদ্ধদের ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদেরকে নিকৃষ্ট জীব বলেই গণ্য করত। সম্ভবত সেনদের মতো রক্ষণশীল শাসককুলের পক্ষপুটে থেকে সনাতনপন্থী হিন্দুরা প্ররোচিত হয় বৌদ্ধদের প্রতি ঘোর দুর্ব্যবহারে এবং মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধদেরকে ব্যঙ্গ করত ন্যাড়া বা নেড়ে বলে। পরবর্তীকালে এই বৌদ্ধদের অনেক আচার-রীতি-প্রথা হিন্দুত্বের ব্রাহ্মণ্য আচার-রীতি-প্রথার আড়ালে আত্মগোপন করে—বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব বুড়ো শিবের থান বা মূর্তি

বা পূজাবেদী আছে সেসমস্তই আদতে বুদ্ধের অধিকারে ছিল এবং বুদ্ধই রূপান্তরিত হন বুড়ো শিবে; চড়কের গাজনে যারা সন্ন্যাস নেয় তারা পীতবস্ত্র পরিধান করে এবং ওই পীতবস্ত্রও প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধদের সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুর জীবন গ্রহণেরই প্রতীক। এভাবে যেমন অনেক বৌদ্ধ আচার-প্রথা তাদের রূপ পাল্টে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসমাজের শামিল হয়ে যায় তেমনই বৌদ্ধদের অনেকে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের পীড়নের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে—তখন রক্ষণশীল হিন্দুরা বৌদ্ধ থেকে ওই সব ধর্মান্তরিত মুসলিমদেরকেও ন্যাড়া বা নেড়ে বলে অভিহিত করতে থাকে।

বাংলাদেশে যা হয়েছে তা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা প্রক্রিয়া নয়; সমস্ত হিন্দুস্তান জুড়েই অনুরূপ প্রতিক্রিয়াদি কম-বেশি হয়েছিল এরকম মনে করার সংগত কারণ আছে। হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির মহান ও গৌরবময় যুগের অবসান হয়েছিল কনৌজের পতনে, এর পরের যুগ ওই সভ্যতা-সংস্কৃতির অবক্ষয়কেই প্রকাশ করে। বাংলার বৌদ্ধদের মতো দক্ষিণ ভারতের জৈনরাও রক্ষণশীল শৈব হিন্দুদের হাতে নিপীড়িত হয় এবং একবার একদিনে আট হাজার জৈনকে শূলে হত্যা করার কথা তামিল পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে। স্পষ্টতই এসময়টাতে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। এ-জাতীয় অসহিষ্ণুতার সবচাইতে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত শ্রীরঙ্গমের পরম শৈবরাজা প্রথম কুলোত্তুঙ্গ স্থাপন করে গেছেন—তাঁর প্রতাপে স্বয়ং রামানুজও তাঁর শিষ্যবৃন্দ-সহ ১০৯৬ খ্রীস্টাব্দে মহীশূরের হয়সাল রাজা বিষ্ণুবর্ধনের আশ্রয়ে পলায়ন করেন এবং তার পরে কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি আর শ্রীরঙ্গমমুখো হননি।

শ্রীরঙ্গম ছেড়ে রামানুজের ১০৯৬ খ্রীস্টাব্দে পলায়ন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু সে তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টা বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরা অল্পই করেছেন। রামানুজের শ্রীরঙ্গম ত্যাগ শুধু সংকীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু ধর্মচিন্তার থেকে পলায়ন নয়, তা এক উদার ও চিরন্তন অধ্যাত্মবোধের প্রসারণও বটে। মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন থেকে শুরু করে অল-বীরূনীর আগে পর্যন্ত যত বিদেশী ভারতবর্ষে অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলেরই প্রাচীন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মনন, মেধা, চরিত্র ও ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে—কিন্তু অল-বীরূনী দশম শতাব্দীর ভারতীয়দের সম্বন্ধে প্রশংসায় অক্ষম। তিনি জানতেন না যে দক্ষিণ-ভারতে নতুন এক হিন্দুচেতনার জাগরণ শুরু হয়েছে। এই জাগরণের উদ্গাতা রামানুজ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[বহিরাগত ধর্মের আগমনে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে গূঢ়তর প্রতিক্রিয়া—ভক্তিবাদী আন্দোলন—রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, রবিদাস, নানক, শঙ্করদেব, দাদু, রজ্জব প্রভৃতি—ভক্তিবাদ বা লোকসাধনাকে রাষ্ট্রীয় স্তরে উন্নয়নের প্রয়াস ও আকবর—সেই প্রয়াসের ব্যর্থতা ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতন।]

রামানুজ প্রথম জীবনে কাঞ্চীপুরের অদ্বৈতবাদী দার্শনিক যাদবপ্রকাশের শিষ্য ছিলেন। গুপ্তযুগে এক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যাঁরা পরে আলোয়ার নামে প্রসিদ্ধ হন। আলোয়ারদের ভক্তিরসাপ্লুত রচনা পাঠ করে রামানুজ অভিভূত হন এবং তখন যমুনাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই যমুনাচার্যের গুরু ছিলেন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও 'ন্যায়তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রথম প্রস্তাবক শ্রীরঙ্গম-বাসী নাথমুনি। প্রভাকর, শবর-স্বামিন প্রমুখ পূর্বমীমাংসাপন্থী গুরুগণ ও স্মৃতিভাষ্যকারগণ বিধান দিয়েছিলেন যে শাস্ত্রানুশাসিত কর্ম কঠোরভাবে পালন করাই যথার্থ ধর্মসাধনা; কিন্তু বৈষ্ণব আচার্য ও দার্শনিকগণের বিবেচনাতে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানই আড়াল করে রাখে পরম সত্তাকে এবং প্রকৃত সাধনার জন্যে চাই নিখাদ আকর্ষণ, আন্তরিক নিষ্ঠা, ধ্রুব প্রেম।

এদিকে শঙ্করাচার্য নবম শতাব্দীতেই ঘোষণা করে গেছেন যে ব্রহ্ম শুধু পরম নন, তিনি অদ্বিতীয় ও একমাত্র চেতনা, সাধারণ অর্থে তিনি জ্ঞেয় অথবা জ্ঞানার্থী নন, তাই তিনি নিঃসম্পর্ক ও নির্গুণ এবং ভৌতিক ও সসীম জগৎ বস্তুত অস্তিত্বহীন অর্থাৎ মায়া তথা অবাস্তব, অতএব নিষ্ঠা-প্রেম-প্রসাদ ইত্যাদির অধ্যাস-আচ্ছন্ন মানবমনে স্থান থাকলেও বস্তুত ওই সমস্তই অলীক। কিন্তু নিষ্ঠা-প্রেম-প্রসাদ ইত্যাদি অলীক হলে বৈষ্ণব সাধনার ভিত্তি টলে যায়, তা অর্থহীন হয়ে যায়। সুতরাং রামানুজের কর্তব্য হলো মায়াবাদের ভ্রান্তি নিরূপণ করে এমন এক সত্যকে নির্ধারণ করা যা বৈষ্ণব-সাধনার অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রশ্নাতীত রূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। জ্ঞান যখন বিশেষ অর্থে স্বীকার্য তখন জ্ঞেয় ও জ্ঞানার্থী প্রকারে এক হলেও আকারে দুই স্বতন্ত্র সত্তা। রামানুজ গুরুত্ব আরোপ করলেন আকারগত ভিন্নতার উপরে: ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আদিতে ছিলেন সূক্ষ্ম অস্তিত্বে নির্গুণ, পরে তিনি প্রকৃতিরূপে আবির্ভূত হলেন অচিৎ বা ভৌতিক ও চিৎ বা মনুষ্য জগতের আকারে এবং এই প্রকাশই হলো তাঁর গুণ, যেমন অগ্নির গুণ উত্তাপ। তিনি একাধারে স্রষ্টা ও রক্ষক ও সংহারক, তিনিই

সৃষ্টির একমাত্র কারণ, চিৎ ও অচিৎকে আবৃত করে একমাত্র স্বাশ্রয়ী সত্তা, আবার তিনিই অন্তর্যামিন অর্থাৎ সকলের হৃদয়েই তাঁর বাস। এমন যে পরমাত্মা তাঁর সঙ্গে কেমন করে একাকার হবে জীবাত্মা? রামানুজ বলেন, তার জন্যে চাই সর্বোৎকৃষ্ট আসক্তি, অরোধ্য মিলনাকাঙ্ক্ষা, ঐকান্তিক ভক্তি। জুনায়েড, হল্লাজ অথবা পারস্যের বিখ্যাত সূফী সাধকদের সম্বন্ধে রামানুজ ওয়াকিবহাল ছিলেন অথবা তাঁদের চিন্তাধারার পরিচয় লাভের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন এমন মনে করার কোনও কারণ নেই; কিন্তু দু কালের ও দু দেশের সাধকদের দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ চিন্তাধারার মধ্যেও আন্তরিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রামানুজের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা শর্তসাপেক্ষ অদ্বৈতবাদ বলা হয়। অস্পৃশ্য পারিয়া ডোম প্রভৃতি আলোয়ার সাধকদের কাছ থেকে যেমন তিনি ধর্ম শিক্ষা করেছিলেন একসময় তেমনই ওই রকম নিম্ন জাতিগুলির মধ্যেও তিনি বিষ্ণুভক্তি বিতরণ করেছিলেন।

কিন্তু মনে রাখা ভালো, শুধু ধর্মীয় স্তরেই জাতিভেদ প্রথাকে রামানুজ ভেঙেছিলেন, সামাজিক স্তরে এই প্রথার অবয়বকে আঘাত করা দূরে থাক, স্পর্শ পর্যন্ত করেননি। তার মানে কি তিনি সামাজিক স্তরে জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করেছিলেন? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। শিষ্যদেরকে উচ্চনীচের ভেদাভেদ মেনে পংক্তিভোজনের অনুমতি তিনি দেননি, বরং শিষ্যদেরকে তিনি পংক্তিভোজন থেকে বিরত হওয়ারই নির্দেশ দিয়েছেন, যেহেতু পংক্তিভোজনে উচ্চনীচকে এক সঙ্গে খেতে বসাতে গিয়ে ভেদাভেদের প্রশ্নকে ডেকে আনা হয়। সোজা কথা এই যে, পংক্তিভোজন তুলে দিয়ে ভেদাভেদের প্রশ্ন-টাকেই তিনি এড়িয়ে গেছেন। ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে রামানুজ উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু সমাজ-যাপনার ক্ষেত্রে তিনি সংঘর্ষের কারণকে পরিহার করে আপোসের পথ নিয়েছেন। মনে হয়, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সামাজিক সংকীর্ণতা এই দুটোরই তিনি বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বাস্তববুদ্ধি অথবা মনুষ্যচরিত্রে জ্ঞান থেকে একথাটাও বুঝেছিলেন যে ধর্ম ও সমাজ উভয়ক্ষেত্রেই উপর্যুপরি আঘাত হানার চাইতে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতাকে সইয়ে নিলে যথাসময়ে সমাজের ক্ষেত্রে উদারতাকে মানুষ মেনে নেবে। তাঁর প্রবর্তিত উদারতা বিস্তারের প্রক্রিয়া প্রকৃতই তাঁর মৃত্যুর পরেও আস্তে আস্তে প্রসৃত হতে থাকে।

রামানুজের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত হলো। ইসলামের আগমনের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে এক অভূতপূর্ব

জটিলতার সৃষ্টি হলো সেকথা সত্য বটে, কিন্তু সেই জটিলতার উন্মোচনও শুরু হলো রামানুজের নতুন ভাবসত্ত্বের সম্প্রচারে। স্বভাবতই রামানুজ-কৃত ব্যাখ্যাও নিঃসংশয় বা তর্কাতীত রূপে গ্রাহ্য হয়নি এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে-সম্পর্ক ও যে-রহস্য নিহিত তার স্বরূপ সন্ধান শুরু হলো নতুন উদ্যমে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব হলো নিম্বার্কের। তেলেগুভাষী দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হলেও তিনি বৃন্দাবনেই বসবাস ও সাধনা করেন। রাধা ও অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রহস্যময় সম্পর্ককে তিনি আধ্যাত্মিক অর্থে সত্য মনে করতেন। ব্রহ্মই সমস্ত কিছুর সারাৎসার এবং সমস্ত কিছুই ব্রহ্মময় এ-বিষয়ে নিম্বার্ক নিঃসংশয় ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন দ্বৈতবাদকে : চিৎ ও অচিৎ উভয় জগৎ-ই ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল বলে ওই দুটি জগৎ পরস্পরে একাত্ম আর ওই একাত্ম জগৎ বা সৃষ্টি যে শুধু বাস্তব তা-ই নয়, ঈশ্বরের থেকে স্বতন্ত্রও বটে, কিন্তু তা বলে স্বাধীন নয়, কেননা পূর্ণকে বাদ দিলে খণ্ড অবাস্তব হয়ে যায়, আবার খণ্ডকে বাদ দিলে পূর্ণও অবাস্তব ; অর্থাৎ সৃষ্টি-নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং ঈশ্বরও সম্পূর্ণ ও স্বাশ্রয়ী নন এবং এখানেই রামানুজের সঙ্গে নিম্বার্কের মৌল তফাৎ। তিনি যে বৃন্দাবন-লীলাকে আপন দর্শনের গূঢ় সূত্র হিসেবে নির্দেশ করেছেন তার কারণ কৃষ্ণ সেখানে কেন্দ্র হলেও তাঁর অস্তিত্বের যাথার্থ্য প্রেমিকাদের অস্তিত্বযুক্ত। এজন্যে নিম্বার্কের দর্শনকে বলা হয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

ওই ত্রয়োদশ শতাব্দীরই শেষে, ১২৯৭ সালে, দক্ষিণ ভারতে আবির্ভাব হয় আনন্দতীর্থের। পরবর্তীকালে মাধ্ব নামে পরিচিত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে তিনি প্রচার করেন যে অসীম স্রষ্টা ও সসীম সৃষ্টির মধ্যে আকারগত পার্থক্য ছাড়াও দুয়ের গুণ, প্রকার ও স্বরূপ সম্পূর্ণ পৃথক, আবার উভয় সত্তাই একান্ত বাস্তব ; পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক শাসক ও শাসিতের তথা প্রভু ও ভৃত্যের এবং প্রভুর সেবা করতে করতে অজ্ঞান অস্তিত্ব থেকে জীবাত্মা বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব অতিক্রম করে আস্তে আস্তে ঈশ-দৃশতা অর্জন করে। মাধ্ব পুরোপুরি দ্বৈতবাদী। ভারতবর্ষের তিন আচার্য—শঙ্করাচার্য, রামানুজ, ও মাধ্ব ; শেষোক্তজনের আশ্রম ছিল বর্তমান উডিপী—তিন জনেই দক্ষিণ ভারতীয়।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য থেকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক ও দ্বৈতবাদী মাধ্বের চিন্তাক্রম অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, যে-জগৎকে প্রথমে মায়া বলা হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে তার বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করা হয়েছে এবং সে সঙ্গে পরমাত্মাকে জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য বলা সত্ত্বেও

জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তার মহিমা ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অথবা এ-কথাও বলা চলে যে, লক্ষ্যের দিকে এগোতে এগোতে জীবাত্মা এক স্বকীয় তাৎপর্য অর্জন করেছে।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জীবাত্মাকে স্বীকার করে নেওয়ার পরে কোনরকম আপোস না করে সরাসরি ভাবে সামাজিক ক্ষেত্রেও জীবাত্মাকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অর্থে, মাধ্বের জন্মের ঠিক একশ বছর পরে, ওই প্রয়োজনের তাগিদেই যেন, রামানন্দের আবির্ভাব হলো। দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তিনি বারাণসীতে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু গোঁড়া ভক্তদের সঙ্গে অচিরেই বিরোধ দেখা দিল রামানন্দের : পংক্তিভোজন করার প্রথা তুলে দিয়ে সবার আড়ালে একা-একা আহার গ্রহণের যে-বিধান রামানুজ দিয়েছিলেন তা রামানন্দের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হলো না, তিনি বর্ণ-জাতি-নির্বিশেষে সবার সামনে ও সবার সঙ্গে আহার গ্রহণে অর্থাৎ পংক্তি-ভোজনে ঈশ্বর-সাধনার প্রাথমিক সার্থকতা আবিষ্কার করলেন।

স্বয়ং ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও তিনি যে পংক্তিভোজনের রীতি প্রবর্তন করলেন এর পেছনে ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ কতটা কাজ করেছিল কিংবা আদৌ করেছিল কিনা তা তথ্য-প্রমাণের অভাবে নিশ্চিত ভাবে বলা মুশকিল, কিন্তু উচ্চ-নীচে বিচার-আচার অস্বীকার করে পংক্তি ভোজনের ভিতর দিয়ে সমস্ত ভক্তের মধ্যে তিনি যে-সমতাকে সম্পন্ন করতে চাইলেন সেই ব্রাত্য-কীর্তির অভিনবত্ব ও বৈপ্লবিক চরিত্রকে সম্যক্ মূল্য দিতেই হবে।

তবে রামানন্দের এই ব্রাত্য-কীর্তির পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তীকালীন সুফী সাধকদের ও অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালীন সাধক পিরান কল্যারের আলা-উদ-দীন সবীর আর দিল্লীর হজরত নিজাম-উদ-দীন ঔলিয়ার বিরাট ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে এঁদের উদার আদর্শগুলোর সাদৃশ্য খুবই স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

ধর্মজিজ্ঞাসু রামানন্দ যখন সত্যের সন্ধানে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন তখন মুসলিম সাধকদের উদার বক্তব্য ও ব্যাপক প্রভাবের পরিচয় নিঃসন্দেহে যথেষ্ট পরিমাণেই পেয়েছিলেন। তৎকালীন সনাতনপন্থী শ্বাসরোধকারী ভারতীয় সমাজবিধির বজ্রমুষ্টির থেকে মুক্তির জন্যে সাধারণ মানুষের প্রচ্ছন্ন ও প্রকট ব্যাকুলতাও হয়তো তিনি লক্ষ বা অনুভব করেছিলেন। উদারতা ও রক্ষণ-শীলতার যে-দ্বন্দ্ব তার সমাধান রামানন্দ নিজস্ব পন্থাতেই অন্বেষণ করেছিলেন

বলে মনে হয়। ওই দ্বন্দ্বময় পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বগতভাবে স্বকীয় সত্তা রূপে মানুষের মূল্যার্জনের সমান্তরালে দেশ ও কালের যথার্থ স্বরূপকে তিনি যেভাবে অনুধাবন করেছিলেন তার থেকেও রামানন্দ পংক্তিভোজনের প্রথা প্রবর্তনে প্ররোচনা পেয়ে থাকতে পারেন; তদুপরি এ-বিষয়ে শাস্ত্রের অনুমোদন অথর্ব বেদ, উপনিষদ, এমন-কি মহাভারত, গীতা প্রভৃতি থেকেও সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব।

অবশ্য সুফী সাধকদের কাছে যেমন প্রেমই ছিল ঈশ্বরকে লাভ করার প্রকৃষ্ট পন্থা তেমনই নিশ্চিতভাবেই রামানন্দ আপন অন্তরে অনুভব করেছিলেন যে, জন্ম দিয়ে নয়, ভক্তি দিয়েই মানুষের শ্রেষ্ঠতা এবং হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়ে ভারতবর্ষে নতুন যে-সমাজ গড়ে উঠেছে তার মুক্তি শুধু ওই ভক্তিমার্গেই। আরও লক্ষ্যণীয় যে রামানন্দ কোনও নিজস্ব সম্প্রদায় স্থাপন করেননি, কেননা তিনি কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতাতেই বিশ্বাস করতেন না।

জনসাধারণের কাছে যাতে সরাসরি পৌঁছতে পারেন সেজন্য রামানন্দ সংস্কৃত ছেড়ে সহজবোধ্য হিন্দীতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর বাণী লিখিত রূপে পাওয়া যায় না, একটি বাণী শিখ ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবে রক্ষিত হয়েছে: 'চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য নিয়ে আমি ঈশ্বরের পূজো করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু গুরু প্রকাশ করলেন, ঈশ্বর আমারই হৃদয়বাসী। যেখানেই যাই, জল ও পাথরের পূজো দেখি; কিন্তু তুমিই তো সে-ই—সমস্ত কিছুকে যে পূর্ণ করেছে আপন অস্তিত্ব দিয়ে। ওরা তোমায় শাস্ত্রের মধ্যে খোঁজে। হে আমার প্রকৃত গুরু, তুমি আমার সকল ব্যর্থতা ও ভ্রান্তির অবসান ঘটিয়েছ।'

রামানন্দ কোনও লিখিত বাণী রেখে যান নি বটে, কিন্তু তাঁর বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে শিষ্যদের জীবনে। স্বভাবতই শিষ্যগ্রহণেও তিনি বর্ণজাতির কোনও বাছবিচার করেন নি। রামানন্দের এক শিষ্য অনন্তানন্দের মঠ রাজস্থানে আমেরের কাছে আছে। হিমালয়ের কুলু অঞ্চল থেকে কৃষ্ণদাস এসে অনন্তানন্দের শিষ্য হন। আমেরের রাজা পৃথ্বিরাজ ছিলেন কৃষ্ণদাসের শিষ্য, কিন্তু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অগ্রদাস সবচাইতে বিখ্যাত। অগ্রদাসের বহু বাণী সাধুসমাজে এখনও খুবই প্রচলিত। তিনি এক ডোমের ছেলেকে মানুষ করেছিলেন। এই ডোমের ছেলেটির নাম নাভা। অগ্রদাসের আদেশে মূর্খ নাভা 'ভক্তমাল' নামে একটি বই লেখেন।

নাভাজীর নাম বহুবিদিত, কিন্তু তাঁর নামের চাইতেও 'ভক্তমাল' বইটির নাম আরও বেশি প্রচারিত। ভারতের মুখ্য ভাষাগুলিতে এ-বই অনূদিত

হয়েছে—বাংলাতেও। এ-বই অক্রোধ নিষ্কাম পরমসহিষ্ণু সিন্ধুদেশের রামানন্দ-ভক্ত সদনা কসাই এবং এরকম অনেক নিম্নবংশজাত মধ্যযুগীয় ভক্তদের জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উৎস।

রামানন্দের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে রবিদাস ছিলেন চর্মকার, দীক্ষা গ্রহণের পরেও বৃত্তি ত্যাগ করেননি। রামানন্দের সকল শিষ্যদের মধ্যেই দেখা যায় যে বৃত্তি কারও ভক্তির বাধা হয়নি, বরং সহায়কই হয়েছে, যদিও ধর্মীয় কর্ম অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানকে এঁরা পরিহার করেছেন। চিতোরের রানি ঝালি রবিদাসের শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন। রবিদাসের শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে অবশ্য মীরার স্থানই বোধকরি সবার উপরে। 'সব ঘট অংতর রমসি নিরংতর মৈঁ দেখন নাহিঁ জানা' বা সব ঘটে তুমি বিরাজ করো নিরন্তর, আমি দেখতে জানিনে, 'বিমল একরস উপজৈন বিনসৈ উদৈ অস্ত তহঁ নাহী। বিগতা-বিগত ঘটৈ নহিঁ কবহূঁ বসত এসৈ সব মাহী' বা সেই বিমল একরসের উৎপত্তি, বিনাশ, উদয় নেই, তা বিগতাবিগত, অক্ষয়, সবার অন্তরে এই বস্তুর বাস প্রভৃতি রবিদাসের ত্রিশটির বেশি ভজন গ্রন্থসাহেবে গৃহীত হয়েছে। আর মীরার ভজন গ্রামোফোন রেকর্ড, রেডিও এবং সিনেমার দৌলতে আজ সারা ভারতবর্ষেই প্রচারিত। তবে মীরার নিজের দেশ রাজস্থানে উচ্চ-বর্ণীয়রা তাঁর ভজন গায় না, যারা তাঁর ভজন গায় তারা সকলেই নিম্ন-বর্ণের মানুষ বা হরিজন—তাদের ভজন গাওয়ার ঢং ও ভঙ্গি সম্পূর্ণ অন্যরকম, তার সঙ্গে আমাদের শহুরে শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ঢং ও ভঙ্গির পার্থক্য এত বেশি যে বাণী বাদ দিয়ে মীরার ভজনের প্রকৃত ও যথার্থ সুর শুনে আমরা কিছুতেই তাকে মীরার ভজন বলে চিনতে পারব না।

রামানন্দের প্রধান শিষ্যদের একজন হলেন সেনা, বৃত্তিতে তিনি ছিলেন ক্ষৌরকার। বাঁধুর রাজা সেনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামানন্দের আদেশে অন্য ভক্ত ভবানন্দ 'অমৃতধার' নামে সর্বজনবোধ্য হিন্দীতে বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। মানুষ বলতে রামানন্দ কখনই সমাজের উপরতলার অল্প-সংখ্যকদের গণ্য করেন নি, তিনি চেয়েছিলেন সর্বসাধারণের মধ্যে ভক্তির আনন্দ বিতরণ করতে এবং যেহেতু সর্বসাধারণের মধ্যে সমাজের নিচুতলার মানুষেরাই সংখ্যায় বহু গুণে বেশি তাই ওই অধিকাংশের চিন্তাই তাঁর চেতনাকে সব সময় জুড়ে থাকত, কেমন করে ভক্তির গূঢ় তত্ত্বে ওই অধিকাংশর পূর্ণ অধিকার জন্মানো যায় এসবই ছিল তাঁর প্রয়াসের বিষয়। অধিকাংশ মানুষ যে-ভাষা বোঝে সে-ভাষায় নিজে উপদেশ দিতেন এবং

সে-ভাষাতেই বেদান্তের মতো অত্যুচ্চ বিষয়েরও ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ভক্তদের। রক্ষণশীল সমাজপতিরা শাস্ত্রে তন্ত্রে যেসব অধিকার ভেদের প্রশ্ন তোলেন সেসব প্রশ্নকে একেবারেই আমল দেওয়া হলো না, বরং দেখা গেল যে সামাজিক বিন্যাসে যাদের স্থান নিচে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তাদেরকেই রামানন্দ আধ্যাত্মিক বিন্যাসে উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। ধন্না, পীপা প্রভৃতি রামানন্দের অন্যান্য প্রধান ভক্ত সকলেই নিম্ন-বর্ণ-জাত। তাঁর অপর এক ভক্ত সুরসুরানন্দ সাধনার জন্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। সংসার ত্যাগের কারণ হিসেবে রামানন্দকে তিনি বলেছিলেন যে সুন্দরী ও তরুণী স্ত্রী সাধনার পথে বিঘ্ন নিয়ে আসতে পারে। একথা শুনে রামানন্দ কী বললেন? তিনি সুরসুরানন্দকে সংসারে থাকার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'তুমি পুরুষ, নিজের পৌরুষেই সকল বিঘ্ন দূর করবে। স্ত্রীর কাঁধে বিঘ্নের দায় চাপিয়ে দেওয়াতে কোনই পৌরুষ নেই।' বৃত্তি, জাতি বা পরিবারের দায়িত্ব প্রভৃতিকে অনেকে ঈশ্বর-সাধনার পথে বাধা মনে করে থাকেন, কিন্তু রামানন্দ তা কখনই করেন নি, কেননা এসব নিয়েই মানুষ পূর্ণ এবং পূর্ণ মানুষ হিসেবেই তাকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হবে, সেই সাধনাতেই ঈশ্বর প্রসন্ন হন।

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরণে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ড ॥

মুসলিম আগমনের অভিঘাতে বিচলিত উত্তর ভারতের বাইরে দ্রাবিড় দেশে ভক্তি উপজিল অর্থাৎ ভক্তি জন্ম নিল, এদেশে—উত্তর ভারতে—নিয়ে এলেন রামানন্দ, আর সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে সেই ভক্তি প্রচার করলেন তাঁর শিষ্য কবীর।

ব্রাহ্মণ বংশে নাকি কবীরের জন্ম, কিন্তু তাঁকে মানুষ করে এক মুসলমান জোলা পরিবার। প্রকৃতই তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও মুসলমান ঘরে মানুষ হয়েছিলেন কিনা একথা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণের কোন উপায় নেই। তবে এটা সত্য যে সেকালের বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং ইসলামের গূঢ় জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্যে মক্কা বাগদাদ সমরখন্দ বোখারা পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন। রামানন্দের অন্যান্য শিষ্যের মতোই কবীরও সাধনার জন্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার থেকে পলায়নের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং স্বয়ং-নির্ভরতার জন্যে উপার্জন-ক্ষমতার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সকলের মধ্যে ও যোগে পরিপূর্ণ সত্য ও সার্থকতা লাভ করা যায়; এজন্যে জীবন হওয়া চাই সহজ ও স্বাভাবিক; কায়াক্লেশ বরণ বা জনসংস্রব বর্জন করলে জীবন হয়ে যায় কৃত্রিম, এমন-কি বিকৃতও। 'পাঁচ তত্ত্বকী পূতলা গৈবী খেলে মাহি'—পাঁচ তত্ত্বের এই শরীরে অনির্বচনীয় পুরুষ-লীলা করেন, এই পাঁচ তত্ত্বকে লঙ্ঘন বা এসবের থেকে পলায়ন করলে তাঁর লীলা ব্যাহত হয়। প্রতি জীবের মধ্যেই ওই অনির্বচনীয় পুরুষ বিরাজমান, সুতরাং কারও প্রতি জীব বৈরী-ভাব বা দ্বেষ-ভাব পোষণ করলে প্রকৃতপক্ষে ওই পুরুষকেই দূরে রাখা হয়। উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ স্বীকার করাও ওই পুরুষকে দূরে রাখারই কর্মান্তর মাত্র। অন্তর-পুরুষের রহস্য উন্মোচিত হয় ভক্তিপ্রেমের চাবিকাঠিতে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা দুটি স্বতন্ত্র সত্তা বটে, কিন্তু পরমাত্মার আসন-আবাস কোথায়? সে তো ওই জীবাত্মারই হৃদয়ে। তাই আচার-তর্ক-তীর্থ-শাস্ত্র ইত্যাদিতে ভগবানের অন্বেষণ করাই বৃথা। সহজ সাধনার পথে অন্তর-পুরুষকে আপন আপন ভাবে বুঝে নিতে হয় অর্থাৎ অভ্রান্ত মত কিংবা সম্প্রদায়-সত্ত্ব মানবজীবনকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না এবং কোনও সত্যকেই কোনও কর্তার হাত থেকে তৈরি আকারে পাওয়া যায় না।

কবীর মত প্রচার করেছিলেন পদ্যের আকারে। এর কারণটাও খুবই সোজা। ছন্দের স্পন্দনে যে-বাণীকে ধরে রাখা যায় জনসাধারণ তাকে সহজে ধরে রাখতে পারে স্মৃতিতে। সংস্কৃত ভাষাকে তিনি মনে করতেন কুয়োর বদ্ধ জল, পক্ষান্তরে জনসাধারণের ভাষা সদা বহতা জল, তাই তখনকার দিনে বারাণসী গোরখপুর মির্জাপুর অঞ্চলে প্রচলিত মুখের বা খাড়ীবোলী হিন্দীতে তিনি বাণী দিয়েছেন, আবার সে সঙ্গে ওই হিন্দীর মধ্যে পারসী আরবী তুর্কী থেকে উৎসারিত অজস্র শব্দও ব্যবহার করেছেন খুব উদার ও নিপুণভাবে। আলোর সঙ্গে অন্ধকার মেশা রহস্যের সময়টাকে বলি সন্ধ্যা আর কবীরের এই দুরকম ভাষা মেশানো রহস্যের ভাষা সান্ধ্য ভাষা বলে পরিচিত। ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর এই সমন্বয়-সাধনা ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর সমন্বয়-সাধনার প্রতিফলন।

কবীরই প্রথম খুব সচেতনভাবে হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয়ের বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং আজীবন এই সমন্বয়ের জন্যে সাধনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

হিন্দুকী হিন্দ্ বাই দেখি তুর্কনকী তুর্কাঈ
অরে ইন দুহু রাহ ন পাঈ।
দাস কবীর কাঢ়ী ভোলী দোউ রাহ বিচ রাহ॥

হিন্দুর হিন্দুয়ানী আর মুসলমানের মুসলমানী তো দেখেছি, এরা কেউ রাস্তার নিশানা পেল না, দাস কবীর এই দু-রাস্তাকে যুক্ত করে মধ্যের রাস্তা মুক্ত করতে চায়। পরমসত্তা যেন তাঁকে ডেকে বললেন,

না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ
না কাবে না কৈলাস মেঁ।
মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে
মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ।

কবীরের আহ্বানে সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের জীবনে এই সাধনা অচিরেই এক বিপুল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ করে, কিন্তু এ-জাতীয় উক্তি-চিন্তা যে রক্ষণশীল সমাজে ভয়ংকর বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলবে এটাও অনুমান করা সোজা।

'ভক্তমাল' গ্রন্থে আছে যে কবীরের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং সে-দৃষ্টি-ভঙ্গির জনপ্রিয়তাতে অসন্তুষ্ট, ঈর্ষান্বিত ও ক্রুদ্ধ মৌলবী ও পণ্ডিতেরা কবীরের বিরুদ্ধে বাদশাহ শিকন্দর শাহ লোধীর কাছে অভিযোগ করেন। বাদশাহের তলবে দরবারে হাজির হয়ে কবীর দেখলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে মৌলবী ও পণ্ডিত অভিযোগকারীরাও সমবেত হয়েছেন। প্রীত হয়ে তখন কবীর বললেন যে দুনিয়ার যিনি বাদশাহ তাঁর দরবারেই যদি মৌলবী-পণ্ডিতের ঐক্য হয়ে থাকে তাহলে সব বাদশাহের যিনি বাদশাহ তাঁর দরবারে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য না হওয়ার কোনও কারণ নেই। কবীরের জন্ম-রহস্যেই নিহিত আছে ওই সমন্বয়ের কথা—তিনি স্বয়ং নিজের পরিচয়ও দিয়েছেন আল্লাহ্‌, রামের সন্তান বলে। বাণী প্রচারের জন্যে যে-ভাষা-ও-ভঙ্গি তিনি অবলম্বন করেছিলেন তাতেও ওই একই সর্বজনীন সমন্বয় সাধনেরই প্রয়াস দেখা যায়—সংস্কৃত ভাষার মতো যা কিছু অচল, কঠোর, জমাট ও স্থাণু সেসবের প্রতি তাঁর আন্তরিক বিরাগ ছিল, তিনি বলেছেন, 'ঈঁটা ঈঁটা আগ হৈ কাদো কাদো লাগ।' ইটে ইটে ঠোকাঠুকি লেগে আগুন ছিটকোয়, কিন্তু কাদায় কাদায় মিলে যায়। মানুষ আসলে কাদার মতো, সর্বদা পরিবেশ ও পরিণামের মধ্যে বিবর্তমান, সর্বদা সত্যের সন্ধানী, সর্বদা বিকাশশীল। সম্প্রদায় মানুষকে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি সংস্কারে আটকে ফেলে বলে কবীর কোনও সম্প্রদায়ও স্থাপন করেন নি।

চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সাধক মৈইনউদ্দীনের শিষ্য মালিক মহম্মদ জায়সী বিশেষ অনুপ্রাণিত হন কবীরের আদর্শে এবং কবীরের চিন্তাধারা

অনুসরণ করে আত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে 'পদ্মাবতী' বা 'পদ্মাবতী' নামে একখানি অসাধারণ গভীর তাৎপর্যময় কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি পাঠে বোঝা যায় যে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেও জায়সীর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। হুসেন গজনবী পারসীতে আর আলাওল বাংলাতে 'পদ্মাবতী'-র অনুবাদ করেন; আলাওলের 'পদ্মাবতী' বাংলা সাহিত্যেরও একখানি অমূল্য সম্পদ। ভোজপুর-রাজ জগৎদেব ছিলেন জায়সীর বিশেষ অনুরক্ত এবং রাজার সভাপণ্ডিত রায়পুরা হলদিয়ার ব্রাহ্মণ গন্ধর্বরাজ ছিলেন জায়সীর প্রাণের বন্ধু। গন্ধর্বরাজের সন্তানেরা জায়সীকে তাদের ধর্মপিতা মনে করত, জায়সীর মৃত্যুর পরে তারা ধর্মপিতার বংশনাম গ্রহণ করে, তখন থেকে হলদিয়ার ব্রাহ্মণরা মালিক-বংশ রূপে পরিচিত হয়। 'পদ্মাবতী'র আদর্শে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নূর মহম্মদ রচনা করেন 'ইন্দ্রাবতী' কাব্য। 'পদ্মাবতী', 'ইন্দ্রাবতী' প্রভৃতি কাব্যের থেকে মনে হয় এগুলি যেন হিন্দু কবির রচনা। জায়সীর অপর প্রিয় বন্ধু ছিলেন রাজা জগৎদেবেরই জনৈক সভাসদ মিঁয়া সলোনে সিংহ—তাঁর এই নামের মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমানের সমাবেশ দেখা যায়। মৃত্যুর পর জায়সীর একান্ত ভক্ত আমেঠির রাজা তাঁর সমাধিস্থানে যে-দরগাহ্ নির্মাণ করে দেন তা উভয় ধর্মাবলম্বীদেরই ভক্তি নিবেদনের ক্ষেত্র।

কবীরের আদর্শে প্রত্যক্ষরূপে যাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচাইতে ব্যাপক রূপে বিদিত হলো বাবা নানকের নাম। দুজনের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন কবীর বৃদ্ধ আর নানক যুবক! নানককে দেখে কবীর নাকি বলেছিলেন যে যোগ্য উত্তরসাধকের আগমনে তাঁর দায়িত্ব শেষ হলো। নানক নিজেও কবীরকে তাঁর গুরু বলেছেন। ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোরের নিকটবর্তী তালবণ্ডী গ্রামে নানকের জন্ম। নানকের বাবা কালু ছেলেকে দিয়ে ব্যবসাপত্র চলবে না ভেবে হতাশ হয়ে চাষবাসের কাজে লাগাতে চাইলে নানক জবাব দেন, 'মানুষের দেহই ক্ষেত, কাজই হলো বীজ, ভগবানের নাম জল, হৃদয়কে চাষে লাগিয়ে ঠিকমতো জল ছড়াতে পারলে নির্বাণের ফসল পাব।' প্রেম ও ভক্তি, চারিত্রিক ও ব্যবহারিক শুদ্ধতা, আর উচ্চ নৈতিক জীবনই শ্রেষ্ঠ সাধনা—সত্য উচ্চ বটে, কিন্তু আরও উচ্চ হলো সৎ জীবন। এক ঈশ্বরের ও সব মানুষের সমতাতে নানক বিশ্বাস করতেন, পক্ষান্তরে অনুষ্ঠান কৃচ্ছ্রতা মূর্তিপূজা জাতপাত বর্ণমন্ত্র ইত্যাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন। গায়ক সঙ্গী মর্দানাকে নিয়ে দক্ষিণে সিংহল থেকে উত্তর-পশ্চিমে মক্কা ও মদীনা পর্যন্ত নাকি তিনি পরিক্রমা করেন। বাগদাদেরর নানক-স্থানে আরবীতে

তাঁর বাণী সংগৃহীত আছে। তিনি ইসলাম সাধনা করেন সৈয়দ হুসেনের কাছে। নানক-বাণীর সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সংকলন অবশ্যই শিখদের আদি গ্রন্থ। এগুলি মুখ্যত সেই এক ও পরম সত্যের মহিমা-গান যার দরজায় হাজার হাজার মহম্মদ, ব্রহ্মা, শিব, রাম প্রভৃতি বাস করেন অথবা সেই সত্যের অবিরাম অন্বেষণ করার জন্যে মানুষের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক ও আবেগাপ্লুত প্রবর্তনা।

নানকের জন্মের সতেরো বছর আগে আসামে শঙ্করদেবের এবং সতেরো বছর পরে বাংলাতে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। মুখ্যত এই দুজনের সাধনাতেই পূর্বভারতে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত হয়। শঙ্করদেবের আগে আসামে আর্যপূর্ব মঙ্গোল বা কিরাত জাতীয় জনসাধারণ বিভিন্ন প্রাণীর, এমন-কি কখন কখন মানুষেরও, রক্তাঞ্জলিতে শক্তির পুজো করত, পুরোহিততন্ত্র, ডাকিনীতন্ত্র, বশ, সম্মোহন ইত্যাদি অস্বাভাবিক আচারে বিশ্বাস করত, শক্তিরূপিনী মাতাকে ভালো না বাসলেও ভয় করত এবং এসব সাধনাতে যাঁরা নিজেদেরকে প্রাগ্রসর বলে দাবি বা প্রচার করতেন তাঁরাও ছিলেন সাধারণ মানুষের ভয়েরই পাত্র। কিন্তু যুগ যুগ বাহিত আসামের এই জীবনধারাতে ও ধর্মপ্রত্যয়ে এক আমুল পরিবর্তন নিয়ে এলেন শঙ্করদেব; এই পরিবর্তন যদিও মুখ্যত ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল তবু এত বড়ো একটা বিপ্লব তিনি এত অল্পকালের মধ্যে সম্পন্ন করেন যার নজির ভারতীয় ইতিহাসে বিরল। তাঁর প্রচারিত মতকে এক-শরণ-ধর্ম বলা হয় এবং এই নাম থেকেই তাঁর মতটা কী তা অনেকখানি স্পষ্ট বোঝা যায়। শঙ্করদেব শুধু একজন ধার্মিক সাধু বা সন্ত নন, তিনি একজন উচ্চকোটির কবি ও নাট্যকার ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সমাজসংস্কারকও ছিলেন। প্রার্থনা, প্রশস্তি ও যৎসামান্য পুষ্পার্ঘ্যতেই ভগবান তুষ্ট হন—অবশ্য যদি তা প্রাণ থেকে স্বতোৎসারিত হয়। শক্তির স্থানে তিনি বিষ্ণু বা কৃষ্ণের আরাধনা প্রবর্তন করেন। আসামের গ্রামে গ্রামে আজও নিত্য গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে নামগান করে এবং নামগান করার জন্যে প্রত্যেক গ্রামেই অন্তত একটি করে নামঘর আছে—এর মধ্যে বরপেটার নামঘর একটি সত্যিকার দ্রষ্টব্য বস্তু। শঙ্করদেব ছিলেন জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু তিনি জাতিবর্ণ দিয়ে মানুষকে বিচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে ধর্ম ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত উদার সর্বজনীন বোধ-ও-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং তাঁর আরব্ধ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর শিষ্য ও বন্ধু মাধবদেব। শঙ্করদেবের আদর্শ ও ব্যবস্থা কালবৈগুণ্যে বহুল বিকৃত হয়ে থাকলেও আজও কৃষ্ণের নামগান

করার জন্যে গ্রামে গ্রামে নিয়মিত সমাবেশের সময় মানুষে মানুষে তথা ভক্তে ভক্তে সমতা অন্তত সাময়িক ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়।

তুলনায় চৈতন্যদেব বাংলা দেশে যে-আন্দোলন শুরু করেন তার অবকাশ সংকীর্ণ ছিল, কেননা সমাজ সংস্কারে তাঁর পর্যাপ্ত আগ্রহ ছিল না। এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে রামানুজের সাদৃশ্য বেশি চোখে পড়ে। তাঁর আন্দোলন মুখ্যত বাংলার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিপুল পরিবর্তন আনে এবং এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সমাজে সাহিত্যে সংগীতে আস্তে আস্তে অনেকখানিই দেখা দেয়। চৈতন্যদেবের যখন আবির্ভাব হয় বাংলা তখন তুর্কীর শাসনে চঞ্চল এবং বাংলার হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার জন্যে কুণ্ডলীচক্র সৃষ্টিতেই ব্যস্ত। সম্ভবত সদ্য আগত মুসলিম উপকরণকে জনজীবনে থিতিয়ে পড়ার সুযোগ ও সময় না দিয়ে সমাজের প্রচলিত কাঠামোকে চূর্ণ করে নতুনতর সমাজ-কাঠামো তৈরি করার কাজে হাত দেওয়া তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। গৌড়ীয় সমাজের উচ্চাংশ যেমন ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যকে দৃঢ়তর করার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিল তেমনই নিম্নাংশ যে ইসলামকে গ্রহণের জন্যেও ব্যাকুলতা বোধ করছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই সময়ে রচিত অনেক পল্লীগাথা বা লোককাব্যে। যেকালে গৌড়ীয় সমাজ অমন উদ্‌ভ্রান্ত তখন সমাজসংস্কারের পূর্বশর্তই হচ্ছে ধর্মীয় স্থিতি নির্ণয় করা। চৈতন্যদেব ওই পূর্বশর্তটিকেই পূর্ণ করেছেন—কিন্তু দীক্ষা বা মন্ত্র দেওয়ার সময় তিনি আর বর্ণজাত মানেননি, তখন তাঁর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মুসলিমের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। একথা তো বহুবিদিত যে তাঁর সবচাইতে প্রিয় ও নিকট শিষ্যদের একজন ছিলেন মুসলিম এবং সাধক-সমাজে তিনি যবন হরিদাস নামে পূজিত। আচার-অনুষ্ঠানে যাগ-যজ্ঞে চৈতন্যদেবের কোনও বিশ্বাস ছিল না, বরং উলটোটাই বিশ্বাস করতেন যে গভীরতম আসক্তিতে কৃষ্ণের নামকীর্তনই হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা কার্যকরী সাধনা।

শঙ্করদেবের সামনে ছিল ইসলাম-অনাহত সমাজ, সেখানে যেমন অনুষ্ঠানের প্রাকাম্য তেমনই উচ্চনীচের ভেদাভেদ ছিল প্রবল এবং তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অভিযান ; পক্ষান্তরে বাংলাদেশে মুসলিম পত্তনীর অব্যবহিত পরেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, ফলে তাঁর সামনে সমস্যা ছিল অপেক্ষাকৃত জটিল। কিন্তু ভারতবর্ষের যেসব অঞ্চলে মুসলিমরা উপস্থিতির প্রথম উত্তেজনা কাটিয়ে উঠেছিল সেসব অঞ্চলে হিন্দু ও ইসলামকে মেলাবার চেষ্টা চলছিল ব্যাপকতর ও সচেতন রূপে এবং বহুলাংশে কবীর কর্তৃক নির্দেশিত পথেই। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতে এক

মুসলিম তুলা ধুনকর বংশে দাদুর জন্ম হয়—অবশ্য কবীরের মতো দাদুকেও অনেকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলে দাবি করেছেন। দাদু নিজেই ঘোষণা করে গেছেন যে কবীরই তাঁর আদিগুরু। কিন্তু কবীর কোনও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তথাপি দাদু ব্রহ্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর ওই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-ও-মুসলিম-রূপী ভারতীয় দেহের দুটি হাতকে যুক্ত করে অঞ্জলি রচনা, যাতে পূর্ণ ভাবে অমৃত পান করা যায়, কেননা 'দুন্যুঁ হাথী হৈব রহে, মিলি রস পিয়া ন জাই'। তাই তাঁর সৃষ্ট সম্প্রদায় ছিল সর্বতোভাবে অনুশাসন নিয়ম ইত্যাদি তথা সম্প্রদায় সম্পর্কিত সমস্ত প্রচলিত ধারণার থেকে মুক্ত। 'নির্ভৈ নির্পথ হোই' অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রাদি কর্তৃক সুনির্দিষ্ট পথ ছেড়ে নির্ভয়ে নির্পথী হওয়ার পরামর্শই দাদু দিয়েছেন।

দাদুর শিষ্য রজ্জব মধ্যযুগীয় ধর্ম সমন্বয়ের সাধনাতে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও সবার অলক্ষিতে আধুনিক চিন্তার পূর্বচ্ছায়াপাত করলেন। এতদিন একজন হিন্দু বা মুসলিমকে গণ্য করা হতো শুধুমাত্র তার ধর্মাবলম্বী সমাজের অংশ হিসেবে। রজ্জব মানুষকে দেখলেন কোনও বিশেষ ধর্মাবলম্বী একান্ত একক বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে। ঠিক কথা যে মানুষের কাছে হিন্দু বা মুসলিম হিসেবেই মানুষের পরিচয় ধরা হয়, এবং হিন্দুর পথে হিন্দু খুশী, তুর্কের পথে তুর্ক খুশী, 'হিন্দু গতি হিন্দু খুশী তুরুক তুর্কী মাঁহি', কিন্তু এই জাগতিক পরিচয় ছেড়ে মানুষকে একদিন প্রেমময়ের সকাশে যেতে হয়, তাঁর কাছে সবাই এক, তাঁর কাছে দুয়ের আলাদা পরিচয় নেই, 'রজ্জব আশিক এক হৈ তিনকে দুন্যুঁ নাহীঁ'। এই জগৎ জীবের বিচিত্র ক্রিয়াকর্মের স্থান এবং যত জীব তত সম্প্রদায় হওয়াই জগতের নিয়ম, জীবের বৈচিত্র্যেই ভগবানের বিচিত্র লীলা প্রকাশমান,

চৌরাশী লক্ষ সংপ্রদা করি বিশ্বম্ভর সোয়।
রজ্জব বৈচিত্র্য রচিয়া জন জন বৈচিত্র্য হোয়॥

পণ্ডিত মৌলবীর দল কাগজে লেখা ধর্মশাস্ত্রে ভগবানকে খুঁজে মরে, কিন্তু ভগবান স্বয়ং এই বিশ্বকে ধর্মশাস্ত্র হিসেবে রচনা করেছেন, এই জীবন্ত নিত্য নবীন শাস্ত্র কেউ পড়ে না, যে তা পড়ে সে-ই প্রকৃত পণ্ডিত, সে জানে যে এই শাস্ত্রের সঙ্গে যা মেলে তা-ই সত্য, যা মেলে না তা একদম মিথ্যে, 'সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ, না মিলে সো ঝুঠ।' রজ্জবের পরে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ে গুরু বংশের আর কোনও প্রয়োজন থাকল না, ভক্তরা যে-ব্যক্তিকে সবচাইতে অগ্রসর সাধক বিবেচনা করলেন তাঁকেই বংশ বা ধর্ম নির্বিশেষে গুরুর আসনে বসালেন এবং এই ব্যবস্থা আজও দাদুপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত।

যা অনধিগত তাকেই অধিগত করার জন্যে মানুষের সাধনা এবং যেখানে শাসক ও শাসিতের, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিভেদ বাস্তব সেখানেই আসে মিলন সংঘটনের সাধনা ; ভারতবর্ষের প্রাচীনকালে বহিরাগতদের মধ্যে জাতিগত ভিত্তিতে সমন্বয়ের সাধনা মধ্যযুগে ধর্মীয় ভিত্তিতে সমন্বয়ের সাধনাতে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের চিন্তা ও প্রত্যয়ের প্রবাহ-প্রতিপ্রবাহ মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল যে-সমস্যার সম্মুখীন করে তা সমাধানের মূলমন্ত্র শাস্ত্রচর্চার জ্ঞানযোগ নয়, আচার-পালনের কর্মযোগও নয়, তা সমাধানের মূলমন্ত্র হলো অন্তরানুভূতির ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগ ভারতের ইতিহাসে কোনও অজানা অভিনব সাধনা নয়, কঠোপনিষদে ও মুণ্ডকোপনিষদে ভক্তির মূলসূত্রগুলি উচ্চারিত হয়েছে ; পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে পরমসত্তার প্রসাদের জন্যে প্রপত্তি বা আত্মোৎসর্গের মন্ত্র দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং ভাগবতপুরাণে ভক্তির পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন দশা বা হালের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে সূফী সাধকেরা সনাতন ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন এবং তা দিয়ে বহুল পরিমাণে প্রভাবিতও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একে শুধু প্রভাব বলাও ভুল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে একাধিক সমরাভিযান হয়ে গেছে ; কিন্তু সেইসব অভিযান নিরপেক্ষ রূপে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে আরব্য সাংস্কৃতিক জগতের একটা আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সেই সূত্রে আরব্য জগতের দার্শনিকরা সনাতন ভারতীয় দর্শন থেকে বহু ভাবধারা ঋণ করেন। এবং সেই ঋণের দরুন নতুন ভাবধারার সুদ সুদ্ধ যখন সূফী সাধকেরা একে একে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করলেন তখন তাঁদের বিশ্বাসের বিদেশী আবরণের অন্তরালে স্বদেশী অন্তঃসারকে চিনতে ও মানতে ভারতীয়দের বেশি অসুবিধে হয়নি, সময় লাগেনি। আর ভারতবর্ষের জনসংখ্যাতে মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এবং ইসলাম গ্রহণে নিম্নবর্ণদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির ফলে এবং সনাতন ভারতীয় ধর্মের ভিতর থেকেই অবক্ষয়ের ফলে এদেশের ঐতিহ্যের মধ্যেই বীজের আকারে সুপ্ত ভক্তিবাদ আস্তে আস্তে বিকাশের—তথা তার কার্যকরিতা ও যাথার্থ্য অনুধাবনের—বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

মধ্যযুগের ধর্মনেতারা এই সত্যকে আবিষ্কার করলেন যে বাইরের আচার-প্রকারে অর্থাৎ বাহ্যরূপে হিন্দু ও ইসলামে যত বৈষম্য বর্তমান বলে মনে হয় ভিতরের স্বরূপে তত পার্থক্য নেই, বরং প্রেম ও ভক্তিকে সাধনার চাবিকাঠি ধরলে সাদৃশ্যই বেশি, এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইসলাম যখন প্রতিস্পর্ধা নিয়ে

উপস্থিত হলো তখন তাঁরা এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই সকলকে একই সর্বজনীন উপলব্ধির প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন। বহিরাগত ধর্ম যেমন নতুন সমস্যার জন্ম দিল তেমনই তার জন্যে নতুন সমাধান সম্পাদনের প্রয়োজনও দেখা দিল এবং এভাবে শুরু হলো সেই সমাধান সম্পন্ন করার এক নতুন সাধনা।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের গৌরবসূর্য মধ্যাহ্নে আরোহণ করে। সেসময়েই ভারতবর্ষের সর্বত্র—বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত ঘন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে—হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এবং হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরেই উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে মতাদর্শ নির্বিশেষে মিলন সংঘটনের ও জন্ম নির্বিশেষে সমতা আনয়নের আন্দোলন শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এই উদার সর্বজনীন ভাবধারাকে মূর্ত করে তোলার জন্যে আসমুদ্র হিমাচলে যে কত সাধকের আবির্ভাব, কত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হলো তার হিসেবনুমারি নেই। ভারতীয় জনসাধারণের আধ্যাত্মিক অনুভব, তার সহজ নীতিবোধ, তার গভীর ধর্মচেতনার কথা পরবর্তীকালের অনেক বিদেশী পর্যটকই উল্লেখ করেছেন। জনসাধারণের সংজ্ঞায় শুধু উচ্চবর্ণীয়রা ও শাস্ত্রবিদরাই পড়েন একথা ভাবা ভুল, বরং তারাই বেশি করে পড়ে যারা শাস্ত্র কিংবা আচার-অনুষ্ঠানের চাইতে বিশ্বাসকেই বড়ো মনে করে। জনসাধারণ বলতে যে বিশ্বাসী-দেরকে আমরা বুঝব তারা সত্যিকার ধর্মবিশ্বাস লাভ করেছে মধ্যযুগের এসব উদার সাধকদের শিক্ষা ও বাণী থেকে। সত্যিকার উদার ভারতীয় বিশ্বাস প্রাচীনকালে যতটা ছিল মধ্যযুগে তার থেকে অনেক বেশি প্রসারিত হয়।

এই উদার লোকসাধনা ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হলো যে স্বয়ং বাদশাহ আকবর একে উচ্চসমাজে তথা রাজনৈতিক স্তরে স্থাপনে উদযোগী হন। আকবর যে জন্মাবধি সর্বপ্রকার ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিলেন অথবা দিল্লীর সুলতান ও মুঘল বাদশাহদের ধারায় তিনি বরাবরই উদারতা ও মহত্ত্বে অদ্বিতীয় ব্যতিক্রম ছিলেন একথা ভাবা ভুল। 'আকবর নামা' থেকে জানতে পাই যে আবুল ফজলের কাছে আকবর নিজেই কবুল করেছিলেন, 'একদা আমার বিশ্বাস অনুসারে নরহত্যা করেছি—সেটাকেই ভেবেছি ইসলাম ধর্মাচরণ। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার আমায় আচ্ছন্ন করতে থাকল।' মায়ের সুফী চিন্তাধারা, কাবুলে থাকাকালে সুফী সাধকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও বিশেষ করে বাল্যশিক্ষক আবদুল লতিফের প্রভাব আকবরের মনোভূমিকে নিঃসন্দেহে উর্বর করে তুলেছিল, কিন্তু এসবের পাশাপাশি তাঁর মধ্যে নৃশংসতার প্রতিও একটা

তীব্র আকর্ষণ ছিল—যুগ ও ব্যক্তির সংযোগে এই দুই বিরোধী মনোভাবের সহাবস্থানেই আকবরের চরিত্র বিশিষ্ট।

১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে আকবর শিকারে গিয়ে কয়েকজন পল্লীগীতিকারের মুখে খ্বাজা মৈনউদ্দীন চিশতীর প্রশস্তি শোনেন এবং অতঃপর আজমীরে গিয়ে ওই সাধকের সমাধি দর্শন করবেন স্থির করেন। আজমীরের পথে রাজপুত রাজা বিহার মলের আতিথ্য গ্রহণ করেন। উভয়ের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষার জন্যে রাজা বিহার মল তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করেন বাদশাহকে। এই কন্যার গর্ভেই পরবর্তী মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। তলিয়ে দেখলে সমস্ত ব্যাপারটাই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রমোদের জন্যে জীবহত্যা করতে গিয়ে আকবরের অন্তঃপরিবর্তন শুরু হয়েছিল এবং তারই পরিণাম হলো তাঁর মৃত্যুর পরে হিন্দুকন্যার গর্ভজাত সন্তানের দিল্লীর মসনদ-লাভ আর আকবরের বহু বিতর্কিত তওহীদ-ই-ইলাহি বা একেশ্বরবাদে দিব্য প্রত্যয়ের জন্ম।

ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে মেনে নিতেই হবে যে দীন-ই-ইলাহির স্তুতিকার যেমন প্রচুর তেমনই নিন্দাকারও এবং হয়তো শেষোক্ত গোষ্ঠীই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আকবরের পাশ্চাত্য জীবনীকারদের মধ্যে যিনি সর্বাগ্রগণ্য সেই ভিনসেণ্ট স্মিথ দীন-ই-ইলাহিকে 'ভ্রান্তির বিশাল স্তম্ভ' বলে অভিহিত করেও ক্ষান্ত হন নি, তিনি এর পেছনে নাকি বাদশাহের 'হাস্যকর আত্মম্ভরিতা ও অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারবৃত্তির দানবিক বিকাশ' দেখতে পেয়েছেন। আকবরের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট স্মিথের তীব্র বিরূপতার কোনও যথার্থ কারণ ছিল কি? যেখানে আকবরের কঠোরতম সমালোচক বাদাউনি পর্যন্ত বলেছেন যে বাদশাহ তাঁর বিশ্বাসকে কারও উপরে বল দ্বারা আরোপ করেননি সেখানে স্মিথ সাহেবের সমালোচনা অন্য রকম সন্দেহই জাগায়।

১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে আকবর কয়েকজন খ্রীষ্টীয় মিশনারীকে ফতেপুর সিক্রিতে ধর্মালোচনার জন্যে নির্মিত ইবাদতখানা বা উপাসনালয়ে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। রুডলফ অ্যাকোয়াভিভার নেতৃত্বে ফাদার মনজেরাট ও ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত ফাদার হেনরিকুয়েজকে নিয়ে গঠিত তিনজনের একটি দল ফতেপুর সিক্রিতে উপস্থিত হলো। এঁরা আশা করেছিলেন যে এঁদের প্রভাবে বাদশাহ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন। সে-আশা পূরণের সম্ভাবনা নেই একথা যখন বোঝা গেল তখন ফাদার মনজেরাট ১৫৮২-র এপ্রিল মাসে এবং দশ মাস পরে ফাদার অ্যাকোয়াভিভা গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে আকবরের অনুরোধে দ্বিতীয় এক মিশনারী-দল লাহোরে আসে এবং

১৫৯৪-এ আসে তৃতীয় একটি দল। তৃতীয় দলটি আকবরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সসম্ভ্রম আতিথ্যেই ছিল এবং এই দলের অন্যতম সদস্য ফাদার জেরোমে জেভিয়রের সঙ্গে আকবরের বিশেষ সখ্যতাও জন্মেছিল—ইনি ছিলেন সেণ্ট ফ্রানসিসের প্রভ্রাতুষ্পুত্র। এঁদের খুবই আশা ছিল যে বাদশাহকে তাঁদের ধর্মে দীক্ষা দিতে পারবেন। খ্রীস্টান মিশনারীদের হতাশা শেষ পর্যন্ত আকবরের নিজস্ব ধর্মচিন্তার প্রতি অসূয়াতে পরিণত হয়। আকবরের দীন-ই-ইলাহি সম্বন্ধে মিশনারীদের মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায় ভিনসেণ্ট স্মিথের রচনায়।

আবার অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা যে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই আকবর হিন্দু ধর্মের প্রতি উদারতার ভেক নিয়েছিলেন। কিন্তু আবুল ফজলের বিবরণ থেকে জানা যায়, শুধু হিন্দুদের বিদ্বান সমাজ থেকে নয়, জরথুস্ট্রান, ইহুদী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিদ্বান সমাজ থেকেও তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে ধর্মালোচনার জন্যে অতিথি রূপে আমন্ত্রণ জানাতেন। ভারতের ইতিহাসে তুলনামূলক ধর্ম-বিদ্যার চর্চা রামমোহনই প্রথম যথার্থ রূপে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার নীহারিকা দশা আকবরের মধ্যেই দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আকবর মুখে ধর্মালোচনা করতেন, আবার কাজে বিভিন্ন ধর্মের নানা আচার-অনুষ্ঠানও পালন করতেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে জরথুস্ট্রীয় মত অনুসারে তিনি ফতেপুর সিক্রিতে পবিত্র অগ্নি প্রজ্জলিত করে তা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সবচাইতে প্রিয় বন্ধু আবুল ফজলকে এবং ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রকাশ্যে সূর্য ও অগ্নির আরাধনা শুরু করেছিলেন। শুধু যদি হিন্দুস্তানে সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্যেই তিনি হিন্দু ধর্ম-আচরণে উৎসাহী হয়ে থাকতেন তাহলে জরথুস্ট্রীয় ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর এই উৎসাহের হেতু কী? আসলে রাজনৈতিক কারণেই তিনি ধর্মের বিষয়ে উদার হয়েছিলেন এ-সন্দেহ নিতান্তই অমূলক, বরং এটাই সত্য যে ধর্মীয় উদারতার আদর্শই আকবরের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা খুঁজেছিল। আর ধর্মীয় উদারতার আদর্শ সেকালে কোন স্তরে পৌঁছেছিল সেটা অনুমান করার জন্যে একটি উদাহরণই যথেষ্ট: মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপসিংহের স্বপক্ষে অগণিত মুসলিম সৈন্য অস্ত্র ধারণ করেছিল, অর্থাৎ ধর্মের বিচার দেশাত্মবোধকে কলুষিত করে নি।

তবে দীন-ই-ইলাহির প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা উচিত। খ্রীস্টান ও ইসলামকে যে-অর্থে ধর্ম বলা হয় তাতে এক উদ্‌ঘাটিত পরম সত্যকেই বোঝানো হয়। কিন্তু সেই অর্থে আকবরের দীন-ই-ইলাহি একটা ধর্ম-ই নয়, কেননা তার ভিত্তি কোনও উদ্‌ঘাটিত পরম সত্য নয়, তা হলো সূর্যকে সর্বোত্তম সত্তার

যথার্থ প্রতীক কল্পনা করে কতকগুলি অনুশাসন ও আচারের এমন এক বিচিত্র সমবায় যা একই সঙ্গে মুতাজিলাদের যুক্তিবাদী ও সুফী সাধকদের ভক্তিবাদী চিন্তাধারাকে মনে করিয়ে দেয়। এই সমবায় সাধনের পেছনে ছিল আকবরের ও তাঁর প্রিয় বন্ধু আবুল ফজলের একান্ত ব্যক্তিগত ধর্মজ্ঞান এবং এর উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত বাদশাহী দরবারের নানা ধর্মাবলম্বী সভাসদদের জন্যে আরাধনার একটি নির্বিরোধ রীতি প্রবর্তন করা। আকবর আশা করেছিলেন যে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ধর্মীয় সংগতি স্থাপন করতে পারলে হিন্দুস্তানের জনসাধারণও একই সংহতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে।

আকবরের সে-আশা অবশ্য পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থতাটাই একমাত্র লক্ষণীয় ব্যাপার নয়। তাহলে লক্ষণীয় ব্যাপারটা কী? তা এই যে, একজন বাদশাহ বুঝতে পেরেছিলেন ভারতীয় সংহতির সমস্যাকে এবং সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা সেকালে ছিল মুখ্যত ধর্মের উপরে নির্ভরশীল এবং পরম সত্যের প্রতীক যেমন সূর্য তেমনই প্রজামণ্ডলীর মধ্যেকার ঐক্যের দ্যোতক হলেন বাদশাহ। আকবর ভেবেছিলেন যে বাদশাহ বা সম্রাট দিব্য অধিকারে বলীয়ান, তাঁর সে-ভাবনা ভুল ছিল। কিন্তু একই কালে প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে সম্রাট বা বাদশাহের দিব্য অধিকার বা Divine Right সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছিল দেখে বোঝা যায় যে ওই ভুল ভাবনার জন্যে আকবরের ব্যক্তিগত কোনও দায় ছিল না, সে-দায় ছিল তাঁর যুগ বা কালের। আর একথাও মানতে হবে যে তওহীদ-ই-ইলাহির মতো বিশ্বতোমুখী ব্যক্তিগত ধর্ম প্রচলনের জন্যে পরীক্ষা করার প্রয়োজন ও অবকাশ বিশেষ ভাবে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থাতেই দেখা দিতে পারে। সফল হয়নি বলে সমাধানের জন্যে সন্ধান ও সাধনার গুরুত্ব বা মূল্য হ্রাস পাবে কেন?

আকবরের পরে দিল্লীর বাদশাহ হন জাহাঙ্গীর। ধর্মের ব্যাপারে জাহাঙ্গীর উদাসীন ছিলেন—আকবরের ধর্মনীতিকে তিনি ক্ষুণ্ণ করেননি, কিন্তু তার চর্চাও করেননি। দিল্লীর মসনদে উত্তরাধিকারের নীতি ছিল না, তাই বুদ্ধি ও শৌর্য দিয়ে দিল্লীর মসনদ জাহাঙ্গীরের পরে শাহজাহান অধিকার করেন। তিনিও ছিলেন হিন্দুনারীর গর্ভজাত সন্তান, তাঁর অনেক সেনাধ্যক্ষই ছিলেন হিন্দু, প্রধান ওমরাহ সা-দ-অল্লাহ্ও জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন। শাহজাহান নিজে রক্ষণশীল সুন্নী মুসলিম হলেও অপরের ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রের একটা মহৎ বৈশিষ্ট্য।

শাহজাহান যেভাবে দিল্লীর মসনদ অধিকার করেছিলেন সেভাবেই ঔরঙ্গজেবও

দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। আগ্রার দুর্গে পিতাকে বন্দী রেখেছিলেন, কিন্তু যাতে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যে কোন রকম ত্রুটি না ঘটে সেদিকে ঔরঙ্গজেবের ব্যবস্থা ছিল নিখুঁত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা বিপরীত গুণের সমাবেশে ঔরঙ্গজেবের মতো সমৃদ্ধ ও জটিল চরিত্র খুব কমই আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল সুন্নী মুসলিম এবং আপন ধর্মকে যেমনটি বুঝেছিলেন ঠিক তেমনই আচরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন রকম ধর্মীয় উদারতার প্রতি, কোন রকম বিলাসিতা বা প্রমোদের প্রতি তাঁর প্রশ্রয় ছিল না। ভাঙ, মদ, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি, নৃত্যগীত ইত্যাদি তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দাড়ি ও পাজামার মাপ পর্যন্ত তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে মহরম পালন বন্ধ করার আদেশ জারি করেছিলেন এবং মহরম পালনের অপরাধে আমেদাবাদের শাসককে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের কারণ ছিল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম শাসকদের ধ্বংস করা। তিনি নিরামিষ আহার করতেন, জল ও দুধ ছাড়া অন্য কোনও পানীয় স্পর্শ করেননি, মাটিতে ঘুমোতেন। মানুষকে পুজো করার শামিল একটা প্রথা হিসেবে ঝরোকা-দর্শনের প্রথা তিনি বন্ধ করে দেন। পক্ষান্তরে হিন্দু-মুসলিম ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল প্রজাই তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়ে বিচার প্রার্থনা করতে পারত। তবুও ঔরঙ্গজেব তাঁর কৃচ্ছ্রতার নীতি দিয়ে হিন্দু ও শিয়া মুসলিমদের তো বটেই, এমন কি মুঘল দরবারের আড়ম্বরে অভ্যস্ত সুন্নীদেরও শত্রুতে পরিণত করেছিলেন বললে ভুল হবে না।

এক কথায় বলা যায় যে, ঔরঙ্গজেব হয়তো একজন আদর্শ সুন্নী ছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় আদর্শপরায়ণতা তাঁকে একজন অযোগ্য বাদশাহ হিসেবে গড়ে তুলেছিল। যে-বিচক্ষণতা, যে-বিবেচনা একজন শাসকের থাকা বাঞ্ছনীয় তা তাঁর ছিল না এবং নিজের উপলব্ধ সত্যের রূপায়ণে তিনি ছিলেন একেবারে অন্ধ। কারও পরামর্শ শোনা দূরের কথা, কারও সাহায্য পর্যন্ত নিতেন না এবং একাই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করতে গিয়ে সকল মুঘল কর্মচারীকেই অকর্মণ্য, অবিশ্বাসী ও অসন্তুষ্ট কর্মচারীতে পরিণত করেছিলেন। অজস্র সদ্‌গুণ ও অতুলনীয় সাহসের অধিকারী হলেও তাঁর কোনও বাস্তববুদ্ধি ছিল না একথা মানতেই হবে। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষার কোনও ক্ষমতাই ছিল না; ইতিহাসের গতি বোঝবার কোনও আগ্রহ দূরে থাক, প্রজামণ্ডলীর মনোভাব বোঝবার আগ্রহও তাঁর ছিল না; ঔরঙ্গজেবের ঘোর অদূরদর্শিতাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রথম ও প্রধান

কারণ। ব্যক্তি হিসেবে অনন্যতাই বাদশাহ হিসেবে তাঁকে অযোগ্যতায় বদ্ধমূল করেছিল। পাঁচ শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাস ধর্মীয় সমস্যায় উপদ্রুত থেকেছে এবং সে-সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করেছে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এই সমস্যা ও সমাধানের স্বরূপকে আস্তে আস্তে রূপান্তরিত করতে থাকে, ধর্মের প্রচ্ছদে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা নীহারিকার রূপ নিতে শুরু করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[ইসলামের আগমনে সৃজনশীল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়া—স্থাপত্য—চিত্র—সংগীত—ভাষা ও সাহিত্য।]

ইসলামের আগমনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কী প্রতিক্রিয়া হলো তা জানতে হলে ভারতবাসীর প্রতিক্রিয়া ও মনোভাবকেই জানতে হবে। হিন্দু ও মুসলিম চিন্তাধারার মধ্যে আকবর কতটা সমন্বয় অথবা ঔরঙ্গজেব কতটা বিভেদ সম্পন্ন করেছিলেন সে প্রশ্নটা গৌণ। তাহলে মুখ্য কী? দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রগতির প্রবণতাটাই হলো মুখ্য বিবেচ্য বিষয় এবং দেশের জনসাধারণই হলো ইতিহাসের প্রকৃত নিয়ামক—দেশবাসীর উৎকৃষ্ট আত্মাগুলির অভিপ্রায় অনুসারেই দেশের ইতিহাস চলে, অপরের হস্তক্ষেপে সে-যাত্রা বিঘ্নিত হয় মাত্র, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নদীর স্রোতের মতোই এঁকেবেঁকে তা অনিবার্য ভাবে সমস্ত বাধা এড়িয়ে এগিয়ে যাবে। যে-শাসক ইতিহাসের গতিকে অনুধাবন করে শাসন-নীতিকে নির্ধারণে সমর্থ হন তিনিই সফল, যিনি তা পারেন না তিনি ব্যর্থ হন। সুতরাং রাজা-বাদশাহের কার্যকলাপ, তাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্যবিস্তারের কাহিনীর থেকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি। সেই জীবনধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে দেশের স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে, সংগীতে, সাহিত্যে, যেহেতু শিল্পের ক্ষেত্রে শাসকদের নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষণা সত্ত্বেও দেশের সাধারণ মানুষের অবদান ও ভূমিকাটাই প্রধান এবং একমাত্র শিল্পেই প্রকাশ্য বক্তব্যের অন্তরালে গূঢ় তাৎপর্যকে রক্ষা করা সম্ভব।

মুসলিম অভিযাত্রীরা ভারতবর্ষে শুধু ভ্রাতৃত্বের ধর্মই আনেনি, হত্যা ও ধ্বংসের অধ্যায়ও এনেছে, আবার সেসঙ্গে অন্যান্য ইসলামধর্মাবলম্বী দেশগুলিতে অনুশীলিত শিল্পকেও নিয়ে এসেছে। এই শিল্পের মূল সূত্রগুলি যে হিন্দুদের একেবারে অজ্ঞাত ছিল তা নয়, বরং মুসলিম শিল্পের কোন-কোন ধারণা হিন্দুদের কাছ থেকেই পাওয়া, কিন্তু সূত্রগুলির বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারে হিন্দুদের সামর্থ্য পর্যাপ্ত বিকশিত হয়নি। একথা সত্য বটে যে নতুন দেশ বিজয়ের প্রথম উত্তেজনায় মুসলিমরা ভারতবর্ষের অনেক শিল্পকীর্তি ধ্বংস করেছে, কিন্তু সে উত্তেজনা কাটিয়ে ওঠার পরে মুসলিমরা পশ্চিম থেকে, মুখ্যত পারস্য থেকে, শিল্পী ও কারিগরদের প্রচুর পরিমাণে আমদানী করে। কিন্তু মূল সূত্রের দিক

থেকে পারস্যের ঐতিহ্যে ভারতীয় দান ছিল এবং এজন্যই ভারতীয় ও পারস্যের শিল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আর্থার উপহাম পোপ বলেছেন, 'ভারতবর্ষ প্রস্তাব প্রদান করেছে আর পারস্য তা পালন করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ যা দিয়েছে তা ফেরৎ পেয়েছে এক নতুন রূপে—এই নতুন রূপ তাকে উন্নীত করেছে স্থাপত্যের নতুন নতুন বিজয়কীর্তি স্থাপনে।' উল্লিখিত বিজয়কীর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য হলো দুটি : বীর্য ও সৌন্দর্য, ফলে স্বভাবতই ইসলাম কর্তৃক প্রভাবিত দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাধিক স্মরণীয় ও সমৃদ্ধ স্থাপত্য রচনায় সমর্থ হয়েছে। চুন, বালি, জল ইত্যাদির মিশ্রণে ইঁট-পাথর গাঁথা ও জমাটবদ্ধ করার কৌশল হিন্দুরা জানত বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে এসবের বিশেষ প্রচলন ছিল না। পক্ষান্তরে বিদেশাগত স্থপতিরা গ্রন্থনার কৌশলেই বড়ো বড়ো খিলান ও গম্বুজ বানাতে শেখাল। খিলান ও গম্বুজের নানারকম হেরফেরে এবং মিনার ও মিনারেটের দ্রাঘিমার যোগে ভারতীয় স্থাপত্য অচিরেই হয়ে উঠল সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়।

কিন্তু স্থাপত্য হলো এমন এক শিল্পরূপ যেখানে জনসাধারণের অন্তর্গত শিল্পীর নিজস্ব অবদান সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য যেহেতু এই শিল্পরূপটাই হলো ব্যয়বহুল ও সংগঠনসাপেক্ষ এবং সে ব্যয় ও সংগঠন সাধারণত নবাব-বাদশা বা রাজা-মহারাজার পক্ষেই করা সম্ভব। তবু দেখা যায় যে সম্রাট-বাদশাহের কর্তৃত্বও স্থপতি ও কারিগররা সর্বদা মানেনি, তাজমহলের স্থপতি এটাকে মুসলিম রীতিতে গড়েননি, তাই পশ্চিমমুখী না হয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে এখানে প্রবেশ করতে হয় এবং এর প্রধান কারিগরদের মধ্যে চিরংজীব লাল, মন্নুলাল, ছোটে লাল, মনোহর লাল প্রভৃতি হিন্দুই ছিলেন। আবার অনেক হিন্দু মন্দিরের বা গৃহের স্থাপত্যে ইসলামীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত প্রকট—বাংলা দেশের মন্দিরগুলির কুঁড়েঘরের মতো ছাদ খসিয়ে দিলেই মসজিদের মতো গম্বুজ বেরিয়ে পড়ে এবং জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দির বাইরে থেকে একেবারে মুসলিম গৃহ বলে মনে হয়। কিন্তু মোটের উপর স্থাপত্যের চাইতে চিত্রশিল্পে ও সংগীতে জনসাধারণের জীবনের পরিচয় আরও স্পষ্ট করে পাওয়া যায়, কেননা এসব শিল্পরূপে শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক বিযুক্ত অবস্থায়, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভাবে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হয়। সেকালে সমস্ত শিল্পীকেই আনুকূল্যের জন্যে উচ্চশ্রেণী বা শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে হতো, কিন্তু জীবনধারণের জন্যে স্বাধীন কোন বৃত্তি বা জীবিকা বা কৃষিকর্ম করাও যেত এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্প ও সংগীতের অনুশীলনও করা যেত—এতে কোনও সন্দেহ নেই যে এ দুটোই হলো বহুলাংশে অবসর সময়ের শিল্প।

ইসলাম ধর্মে প্রতিচিত্রণ নিষিদ্ধ এবং সম্ভবত এই কারণেই মুসলিম দেশগুলিতে চিত্রশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য আড়ষ্ট ও নিষ্প্রাণ, সেখানে নানারকম নকশার চমকপ্রদ বিন্যাস থাকলেও তার সঙ্গে জীবনের সংযোগ ছিল না। পক্ষান্তরে সমসময়ে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যেও শূন্যতার পর্ব চলছিল—বিপুল সমৃদ্ধ ধ্রুপদী যুগের পরে ভারতীয় চিত্র বলতে বোঝায় বাংলা-বিহার-নেপালের একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ পুঁথিচিত্র—কিন্তু এগুলি উচ্চাঙ্গের শিল্প হলেও পরিমাণে অত্যন্ত নগণ্য ; আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাশেষি গুজরাতে এক রক্ষণশীল চিত্রধারা উৎসারিত হয় যার পৃষ্ঠপোষক ছিল ওই অঞ্চলের বিত্তবান নৌবণিক শ্রেণী—অলঙ্কারবাহুল্য, বর্ণাঢ্যতা ও প্রতিমানের মসৃণতা গুজরাতী চিত্রশৈলীকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে এবং ব্যক্তিচিত্রগুলি কোণবিশিষ্ট, পুত্তলীপ্রতিম গতিভঙ্গি ও তীক্ষ্ণ পার্শ্বচিত্র সংবলিত। ক্রমে ক্রমে গুজরাতী চিত্রশৈলীর সঙ্গে মুঘল আমলের মিনিয়েচর বা চিত্রিকা-শৈলীর সংমিশ্রণে রাজপুত চিত্রিকাশৈলীর উদ্ভব হয়।

স্পষ্টতই ভারতীয় চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যে মুসলিম ধারা নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল; সুতরাং মুসলিম ধারাটির পরিচয় ও ইতিহাস জানা দরকার। যদিও ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে মুঙ্গল সেনাপতি তৈমুরলঙের ভারতাভিযানের স্মৃতি শুধুই বিভীষিকাময় তবু তাঁর নাম এখানে অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে, কেননা ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, তৈমুরের বংশ ছিল ধ্বংসের মতো সৃজনেও সমান সমর্থ এবং এঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্য চিত্রশিল্পের অকল্পনীয় সমৃদ্ধি ঘটেছিল। খোরশানের সুলতান হুসেনের আমলে বেহজাদ নামে এক অসামান্য শিল্পীর আবির্ভাব হয় যাঁর সম্বন্ধে বাবর তাঁর স্মৃতিকথায় 'সকল শিল্পীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ' বলেছেন। মুঘলদের ভারতে শক্তিপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পারসিক ও তৎসম্পর্কিত চিত্রশিল্পের ধারাগুলিতে অভিজ্ঞ শিল্পীরা ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেন ও পূর্ববর্তী যুগের মুসলিম সাধকদের মতোই ভারতীয় শিল্পসাধনার অঙ্গীভূত হতে থাকেন। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল সেকালের বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে কলমকার, ফাররুখ, সিরাজী আব্দউস সামাদ, তবরীজের মীর সৈয়দ আলী ওরফে জুদ্দি প্রভৃতির নাম করেছেন কিন্তু এসব বিদেশী নামের পাশাপাশি বসওয়ন, দসওয়ন্ত, কেসুদাস প্রভৃতির নামও উল্লিখিত হয়েছে—দসওয়ন্ত বা যশোবন্ত জাতিতে কাহার বা পালকি বাহকের পুত্র।—এবং এই হিন্দু শিল্পীরা এতই প্রতিভাবান ছিলেন যে এঁদের উপরেই পারস্য কবি নিজামীর রচনাবলী অলঙ্করণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিদেশী ও স্বদেশীদের নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র চিত্রশিল্পীদের

সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও একে অপরের অভিজ্ঞতায় লাভবান হওয়ার জন্যে উন্মুখ ছিল এবং এরূপ পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়ায় দুটি ধারার সমন্বয়ই ছিল একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। এভাবে ভারতীয় চিত্রশিল্পে মুসলিম, বা আরও যথার্থ রূপে, মুঘল পর্বের সূচনা হয়। এই মুঘল ধারার সঙ্গে দেশীয় ধারার সংমিশ্রণের একটি উৎকৃষ্ট ফসল হলো 'নিমৎ-নামা' পাণ্ডুলিপির চিত্রাবলী যা সম্ভবত মালোয়ার রাজপুত শিল্পীদের কীর্তি। ফুল, ঘাস, মেঘমালা, পাথর, ফুলে ভরা গাছপালা নিয়ে নিসর্গ দৃশ্যগুলি পারসিক ধারায় অঙ্কিত কিন্তু অধিকাংশ নরনারীর চিত্রই গুজরাতী ধারায় অঙ্কিত।

মুসলিম যুগের সমস্ত উত্তর ভারতীয় চিত্রশিল্পকেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিহ্নিত করা হতো মুঘল শিল্প বলে, কারণ এ দুয়ের পার্থক্য তখনকার শিল্প সমালোচকদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। এর থেকে বোঝা যাবে যে মুঘল শিল্প ও রাজপুত শিল্পের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গভীর সাদৃশ্য বর্তমান এবং সে সাদৃশ্য প্রকরণগত হলেও বিভ্রান্তিকর। পরে ধরা পড়ল যে প্রকরণে সাদৃশ্য থাকলেও মুঘল ও রাজপুত শিল্পের আদর্শে ও প্রসঙ্গে গভীর পার্থক্য আছে: মুঘল শিল্পের সমাজ হলো সম্ভ্রান্ত, অঙ্কনশৈলী হলো একান্ত বাস্তবানুগ, পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের সমাজ নিয়ে ভাবমূলক শৈলীতে রচিত হয়েছে রাজপুত শিল্প। হয়তো প্রতিচিত্রণের প্রতি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়াতেই মুঘলদের আনুকূল্যে বিকশিত শিল্পধারা গুরুত্ব দিয়েছে অবিকল ভাবে আঁকার উপরে আর প্রতিচিত্রণের পথ খোলা ছিল বলেই রাজপুতরা অন্য পথের সন্ধান করেছে। মিনিয়েচর বা চিত্রিকা অঙ্কনের প্রকরণকে আয়ত্ত করে রাজপুত শিল্পীরা নিজস্ব জীবনেই প্রত্যাবর্তন করেছে।

কাপড় ছাপা, কার্পেট বোনা ও রাজস্থানের অন্যান্য বিখ্যাত বৃত্তিজীবীদের কাজকর্ম, হাটে বাজারে গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষদের কেনাবেচা, মাঠে বা বনের ধারে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, কুয়োতলায় জল নেওয়ার জন্যে কলসী নিয়ে মেয়েদের ভিড়, বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান—এমনই নানা দৃশ্যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন রাজপুত চিত্রিকাগুলিতে অসাধারণ মহিমান্বিত রূপ পেয়েছে। আবার এরই পাশাপাশি আছে কৃষ্ণ ও রাখাল বালকদের, কৃষ্ণ ও রাধার প্রেম নিয়ে পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তিতে অঙ্কিত চিত্রিকাবলী, কিন্তু দেবদেবীর ছবি আঁকার সময়েও রাজপুত চিত্রিকার শিল্পীরা দেবদেবীকে অলৌকিকতার পরিবর্তে মানবিকতায় মণ্ডিত করেছেন। জন্তু জানোয়ারের ছবি আঁকতে গিয়েও রাজপুত শিল্পীরা মানবিক সম্পর্কই অনুভব করেছেন: মুঘল

চিত্রিকায় পশু-শিকারের ও পশুতে পশুতে লড়াইয়ের দৃশ্য দেখি, কিন্তু রাজপুত শিল্পে পশু অঙ্কিত হয়েছে মানুষের বন্ধু হিসেবে। এইভাবে মুঘল চিত্রিকার উপকরণ অর্থাৎ কাগজ-কলম-রং ইত্যাদি এবং প্রকরণ অর্থাৎ মূল ছবিটি বা তসবীরকে কেন্দ্রে কিংবা মোটামুটি মধ্যে স্থাপন করে তার চারপাশে অলঙ্কৃত সীমানা বা হাশীয়া টেনে দেওয়ার রীতিকে বজায় রেখে রাজপুত চিত্রিকার প্রসঙ্গবস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গিকে দেশীয় জীবনের শামিল করে নেওয়া হলো।

এদিকে শাহজাহানের সময় থেকে মুঘল চিত্রশিল্পের যে অবক্ষয় শুরু হয় তা তল স্পর্শ করে ঔরঙ্গজেবের আমলে, কেননা একজন খাঁটি রক্ষণশীল মুসলিম হবার সাধনায় চিত্রচর্চার বিরোধিতা করাকে তিনি কর্তব্য মনে করেছিলেন। চিত্রশিল্পীরা যখন দেখলেন যে মুঘল দরবার থেকে কোনরকম প্রশ্রয় পাওয়ার আর আশা নেই তখন তাঁরা দিল্লী ছেড়ে নতুন আশ্রয় ও আস্তানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। মুঘল দরবারের শিল্পীরাই পাঞ্জাব ও গাড়োয়াল অঞ্চলের বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যে গিয়ে পাহাড়ী কলম বা কাংড়া চিত্রিকার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন কিনা নিশ্চিত করে বলা কঠিন কিন্তু মুঘল শিল্পীদের দিল্লী ত্যাগ ও পাহাড়ী কলমের উৎপত্তির মধ্যে পারম্পর্য রয়েছে। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে নাদির শাহের দিল্লী লুণ্ঠনের পরে অকস্মাৎ পাহাড়ী কলম অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করে। মনে হয় যে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পরেও অনেক শিল্পী চিত্রিকা শিল্পের এককালীন কেন্দ্র দিল্লী ত্যাগ করেননি, শিল্পের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যে বাদশাহী আনুকূল্যের অভাবজনিত অসুবিধা স্বীকার করেও দিল্লীর মাটি আঁকড়ে পড়ে ছিলেন, কিন্তু ১৭৩৯-র পরে তাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে কাংড়া উপত্যকায় আশ্রয় পেলেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম প্রকরণের সঙ্গে হিন্দু প্রসঙ্গাদর্শের সমন্বয়ে মুখ্যত কাংড়া উপত্যকার এক ছোট রাজ্য গুলেরের রাজা গোবর্ধন সিংহের ১৭৪৪-৭৩ রাজত্বকালে অঙ্কিত চিত্রিকাগুলোই ভারতীয় চিত্রিকাশিল্পের সবশ্রেষ্ঠ তথা ভারতবর্ষের ধ্রুপদী ও আধুনিক যুগের মধ্যে বিকশিত চিত্রশিল্পের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় নিদর্শন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাগমালা অবলম্বনে রাজপুত চিত্রশিল্পের নিদর্শনগুলি থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় জনজীবনে সংগীতের ভূমিকা কতটা ব্যাপক ও গভীর। রাগমালা চিত্রিকাগুলির প্রথম বর্ণনা বোধকরি মীর্জা খাঁ-ই দিয়েছিলেন 'তুহফাত-উল হিন্দ' নামক ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রচিত গ্রন্থে। সংস্কৃত ভাষার রচিত 'সংগীতদর্পণ', 'সংগীত-বিরোধ' প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন রাগরাগিনীর ধ্যানগত মূর্তির বর্ণনা আছে, কিন্তু চিত্রের উল্লেখ নেই। মীর্জা খাঁয়ের সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর

শেষভাগে চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংগীতশিল্পের এমন একটা সংযোগ হয়েছিল যেমনটি আগে হয় নি আর এই সংগীতের ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলিমের সংযোগ হয়েছে অত্যন্ত প্রকটরূপে অন্তরঙ্গ। সংগীত-শিল্প মুসলিমশাস্ত্রে নিষিদ্ধ অথচ যাকে হিন্দুস্তানী সংগীত বলা হয় তাতে হিন্দুদের চাইতে মুসলিমদের অবদান বেশি ছাড়া কম নয়। মুসলিমদের মধ্যে সংগীত সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ ও আগ্রহ হিন্দুদের সংস্পর্শে-ই জেগেছিল এমন সন্দেহ স্বভাবতই জাগে। হিন্দুদের ধর্মক্ষেত্রের মতো মৈনউদ্দিন চিশতী বা সেলিম চিশতীর দরগাহ্‌র মতো ধর্মক্ষেত্রগুলিতেই সংগীতের চর্চা শুরু হয় এবং এখনও এজন্যে পুণ্যার্থীরা সংগীত শিল্পীদের দক্ষিণা দেয়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সাধনারই ফল হলো আজকের হিন্দুস্তানী সংগীত।

ভারতীয় তন্ত্রী-বাদ্য হিসেবে আজকাল যেগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে সেতার, রবাব, সুরবাহার, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি মুসলিমদের অবদান। প্রাক-মুসলিম যুগে বীণাই ছিল প্রধান তন্ত্রী-বাদ্য। তবলার সংগত ছাড়া হিন্দুস্তানী সংগীত অচল বললেই হয়, তবলা একেবারে মুসলিম বাদ্য। হিন্দুস্তানী সংগীতে 'নায়কী' অথবা রাগরাগিনীর মূল স্বরূপটি গেয়ে শোনাবার পরে ওস্তাদরা নিজস্ব পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্যে যে-ভঙ্গিতে গান করেন তাকে 'গায়কী' বলা হয় এবং তাতেই প্রমাণিত হয় গায়কের কৃতিত্ব। প্রাক-মুসলিম যুগে সংগীতের বিচার হতো 'নায়কী' অনুসারে, পক্ষান্তরে 'গায়কী' হলো মুসলিমদের প্রবর্তিত রীতি। কর্ণাটকী সংগীতে প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের কিছু কিছু শব্দ-রূপ পাওয়া যায়, কিন্তু উত্তর ভারতীয় সংগীতে সেটুকুও দুর্লভ। কনকাঙ্গী ঠাটের পরিবর্তে হিন্দুস্তানী সঙ্গীত যে মুখ্যত বেলাওলী ঠাটে গাওয়া হয় এটাও মুসলিম প্রভাবের ফল। তবে খুব সুস্পষ্ট কারণেই একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে অথবা তাদের আশ্রিত সমাজের মধ্যে সংগীতের শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

ভারতীয় সংগীত জগতে প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিমের নাম শেখ বাহাউদ্দিন জাকেরিয়া। দুঃখের বিষয় তাঁর সম্বন্ধে অল্পই তথ্য মেলে: মুলতানে তাঁর জন্ম হয় ও ৬৬৬ হিজরী সন বা ১২৬৭-৮ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে মৃত্যু হয়। ইনি মূলতানী ও মুলতানী-ধানশ্রী রাগ দুটি প্রচলন করেন। তাঁর পরে আমীর খসরুর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত মত অনুসারে তিনি হলেন সেতারের প্রবর্তক এবং পারসিক রাগ ইমনকে ভারতীয় সংগীতের অঙ্গীভূত

করেন। ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে তাঁর কোনও বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল কিনা বলা মুশকিল, তবে ভারতীয় সংগীতের সনাতন অনুশাসনগুলি সম্বন্ধে তাঁর যে কোনও শ্রদ্ধা ছিল না তা অনুমান করা যায় এবং একারণেই ওইসব অনুশাসন ভেঙে সহজেই পারসিক সঙ্গীতের নানা বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সংগীত শিল্পে যোগ করেছিলেন। কারণ যা-ই থাক, তিনি যে সনাতন ভারতীয় সংগীত-শিল্পকে রক্ষণশীলতার নিগড় থেকে মুক্তি দিলেন এতে কোনও সন্দেহ নেই এবং ঐতিহাসিকের কাছে তিনিই হিন্দুস্থানী সংগীতের জনক।

পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জৌনপুরের সুলতান হুসায়ন শাহ শর্কী যুদ্ধ-বিদ্যার মতো সংগীতবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন: তিনি বিভিন্ন প্রকার তোড়ী ও শ্যাম রাগ প্রচলন করেন। জৌনপুর সম্ভবত সংগীত চর্চার একটা বড়ো কেন্দ্র ছিল। রামকৃষ্ণ কবি রচিত 'ভারতকোষ, থেকে জানা যায় যে ১৪২৯ খ্রীস্টাব্দে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিমের অধীনস্থ কাড়ার মুসলিম সামন্ত বা সুলতান শাহীর আহ্বানে সেকালের বিখ্যাত গুণীদের সমাবেশে এক পণ্ডিত-মণ্ডলী বা সংগীত সম্মেলন হয়, তার সভাপতি হিসেবে সুলতানশাহী 'সংগীতশিরোমণি' নামে একটি বইও লেখান, কিন্তু তার পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, শুধু তার ছিন্ন অংশই পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে বা মুঘল যুগে সংগীত বিষয়ে যে সব বই লেখা হয় তার মধ্যে আইন-ই-আকবরী'তে সংগীত সংক্রান্ত অধ্যায়, ফকীর উল্লাহ প্রণীত 'রাগদর্পণ' ও মীর্জা খাঁ-র 'তুহফাত-উল হিন্দ'-এর সংগীত সম্পর্কিত অংশ বিশেষ উল্লেখ্য। 'রাগদর্পণ' গ্রন্থটির একাংশ হলো গোয়ালিয়রের রাজা মানসিং তোমরের রচনা 'মানকুতূহল' গ্রন্থের অনুবাদ, বাকিটা মুঘল ভারতীয় সংগীতের বিশদ বিবরণ, অবশ্য তার মধ্যেও অন্তত তিনটি অধ্যায় দৌলতবাদের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শার্ঙ্গদেবের 'সংগীতরত্নাকর' থেকে সংকলিত। মুসলিম শাসনকালে যেসব সংগীত-সমালোচকের আবির্ভাব উত্তর ভারতে হয়েছে তাঁদের মধ্যে ফকীর উল্লাহ্-ই বোধকরি সবচাইতে উচ্চাঙ্গের সংগীত-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। ১৩৭১ বঙ্গাব্দে রাজ্যেশ্বর মিত্র কর্তৃক 'আইন-ই-আকবরী', 'রাগদর্পণ' ও 'তুহফাত-উল হিন্দ' গ্রন্থ তিনটির সংগীত বিষয়ক অংশগুলির সার অনুবাদ 'মুঘল ভারতের সংগীতচিন্তা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

একদা সালগ পর্যায়ের প্রবন্ধসংগীত ধ্রুব নামে পরিচিত ছিল এবং এই ধ্রুব পদগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়ার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস রাজা মানসিং তোমরই পেয়েছিলেন। ফকীর উল্লাহ-র বিবরণ থেকে জানা যায় যে

নায়ক বখশু, নায়ক ভানু, মাহমুদ, কিরণ ও লোহঙ্গ নামে পাঁচজন ওস্তাদের এ-বিষয়ে বিশেষ অবদান ছিল। ওস্তাদদের নাম থেকেই স্পষ্ট যে এঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গুণীই ছিলেন। নায়ক বখশু প্রচুর ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন, কিন্তু তানসেন ও তাঁর শিষ্যরা সেসব চালু রাখার চেষ্টা করেন নি, ফলে আকবারের আমল থেকে সেগুলি লোপ পেয়ে যায়। তানসেনকে একমাত্র ধ্রুপদ রচয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যে একাজ সুপরিকল্পিত ভাবে করা হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। খেয়ালের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ফকীর উল্লাহ্-র চোখের সামনে এবং এর মূলে ছিল সংগীতের উপভোগ্যতার উপর অধিক গুরুত্ব দান। মিষ্টত্ব ও লালিত্যই খেয়াল গানের সবচাইতে বড়ো আকর্ষণ। প্রকাশ থাকে যে ঘোর সংগীত-বিদ্বেষী বলে পরিচিত ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই ফকীর উল্লাহ 'রাগদর্পণ' রচনা করেন এবং গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে স্বয়ং বাদশাহকে। শুধু তাই নয়, খুৎবা পড়ে 'রাগদর্পণ' গ্রন্থটিকে ঘোষণা করার জন্যেও তিনি ঔরঙ্গজেবকে অনুরোধ করেছেন, তবে সে-অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল কিনা জানা নেই।

ঔরঙ্গজেবের আমলে শ্রেষ্ঠ সংগীত-শিল্পী ছিলেন খুশহাল খাঁ ও বিশ্রাম খাঁ। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ওইসব বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের দরবারে গান গাওয়া বাদশাহ নিষিদ্ধ করে দেন, কিন্তু ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যে প্রধান গুণীদের উপহারাদি দিয়েছেন তার প্রমাণ আছে। আজিমুশশান যখন ঢাকার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হন তখন সহচররূপে প্রথমে আলম পণ্ডিত ও পরে কলাবত কালিদাস ত্রিবেদীকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রণয়িনীকে ছেড়ে আলম ঢাকায় যেতে চান নি আর বাদশাহ কালিদাসকে ছাড়তে চান নি বলেই আজিমুশশান বৃন্দ কবিকে নিয়ে ঢাকায় যান। ঔরঙ্গজেবের জন্মদিনে ও অভিষেকদিনে নতুন নতুন গান রচিত হতো এবং এইসব গানে টোড়ী, গান্ধার ও আশাবরী রাগের আধিক্য থেকে মনে হয় যে এগুলি ছিল বাদশাহের প্রিয় রাগ। মীর্জা খাঁর 'তুহফাত-উল হিন্দ' বা 'ভারতবর্ষের উপহার' গ্রন্থটিও ঔরঙ্গজেবের আমলে, সম্ভবত ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, রচিত হয়। এতে পারস্যের কয়েকটি সুরের রঙ্গে ভারতীয় রাগের ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে, কিন্তু দু দেশের সংগীতের মধ্যে ঠিক কতখানি যোগ-সাধন হয়েছিল তার বিশ্লেষণ নেই। গ্রন্থটির সংগীতাংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুঘল আমলের প্রধান আঠারো-জন কলাবিতের নাম দেওয়া হয়েছে—এঁদের মধ্যে মুসলিমরাই সংখ্যায় অধিক।

লক্ষণীয় যে মুসলিম প্রভাব সত্ত্বেও ধ্রুপদের মৌল সত্তা মোটামুটি অবিকৃত ও শাস্ত্রকথিত বিধিগুলি অপরিবর্তিত থেকেছে, সাধারণত চৌতাল, ধামার প্রভৃতি ছন্দে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ কলি চারটি পরম্পরায় গীত হয়। তানসেন নাকি গুরু স্বামী হরিদাসের নির্দেশে শুদ্ধবাণী ধ্রুপদ গাইতেন, যদি পরবর্তীকালে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের প্রচলনে অলঙ্করণ ও বৈচিত্র্যের অবকাশ প্রশস্ত হয়। আধ্যাত্মিক ও গম্ভীর ভাব প্রকাশের জন্যে ধ্রুপদকে সবচাইতে উপযুক্ত বাহন মনে করা হয়। কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শে ভারতীয় সংগীতে যে-বিপ্লব সাধিত হয় তার সর্বশ্রেষ্ঠ সফল হলো খেয়াল ও ঠুংরি জাতীয় গানগুলি। কথিত আছে আমীর খসরুই খেয়াল গানের প্রতিষ্ঠাতা। ঠুংরি অপেক্ষাকৃত লঘু রীতির সংগীত, কিন্তু সুর ও বাণীর সম্পদ হলো এর বৈশিষ্ট্য।

এযাবৎ সংগীত ছিল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভাবের আশ্রিত শিল্প। কিন্তু খেয়াল জাতীয় সংগীতের সূত্রে ধর্মীয় বন্ধন ও সংস্কার থেকে ভারতীয় সংগীত সৌন্দর্য ও লালিত্য সৃষ্টির জগতে মুক্তি পেল অর্থাৎ ভারতীয় সেক্যুলার বা ধর্মীয় সংস্কার-মুক্ত মার্গসংগীতের উদ্ভব হলো মুসলিম সংযোগের পরিণামে। আবার এরই পাশাপাশি সংগীতে শিল্পীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার নীতি প্রচলিত হলো: রাগের সীমার মধ্যে শিল্পীর খেয়াল বা স্বতন্ত্র ইচ্ছে অনুযায়ী সুর বিকাশের অবাধ স্বাধীনতাতে খেয়াল গানের চমৎকারিত্ব নিহিত এবং সুর বিকাশের বিভিন্ন পদ্ধতির থেকে বিভিন্ন ঘরানার, আবার ঘরানার নির্দিষ্ট রূপটিকে রক্ষা করে, শিল্পীর ব্যক্তিগত গীতশৈলী থেকে গায়কীর উদ্ভব। অধুনা প্রচলিত মার্গসংগীতের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে ভারতীয় গায়ক বা যন্ত্রী পূর্ববর্তীর রচনাকে অনুসরণ করেন না, অনুশীলন করেন মাত্র। শিল্পীর স্বতন্ত্র বা স্বকীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্যে এই সংগীতে যে-পরিমাণ স্বাধীনতা স্বীকৃত তা অন্যান্য দেশের সংগীতে দুর্লভ—এই সংগীতের প্রকৃত উৎকর্ষ শিল্পীর নিজস্ব ও ক্রমান্বয়ে বিকাশশীল সুরের উদ্ভাবনী প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ পারসিক সংগীতের ধারাকে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে গ্রহণ করে একদিকে যেমন ধর্মের আধিপত্য থেকে অন্যদিকে তেমনই সনাতন প্রাকরণিক অনুশাসনগুলির আধিপত্য থেকে ভারতীয় সংগীতকে স্বাধীন করা হলো।

মুসলিম সংযোগ শুধু স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত এবং সংগীতকে স্বাধীন করল না, ভাষার ক্ষেত্রেও তা ভারতীয় চিন্তার জগৎকে সংস্কৃত ভাষার

বন্ধন থেকে মুক্ত করল এবং তার ফলে অবারিত হলো আঞ্চলিক ভাষাগুলি চর্চার পথ। সংস্কৃত ছাড়াও যদি অন্য ভাষা অর্থাৎ আরবী ও ফার্সী চর্চার যোগ্য ভাষা হয়ে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের লোকমুখে প্রচলিত অন্যান্য ভাষাগুলোই বা চর্চার যোগ্য হবে না কেন? সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা ছিল কঠোর পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং সংস্কৃতের চর্চাও ছিল শুধু বিদ্বানদের ক্ষুদ্র সমাজে সীমাবদ্ধ, তার সঙ্গে সাধারণ দেশবাসীর সম্পর্ক ছিল না, তদুপরি কোন কোন কৌম, গোষ্ঠী ও বর্ণের কাছে সংস্কৃত ছিল একেবারে অজ্ঞাত বা নিষিদ্ধ জগৎ, পক্ষান্তরে আরবী ফার্সী শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও সেগুলি শিক্ষা করার সুবিধা খুব অল্পসংখ্যক লোকই পেত এবং সুবিধা পেলেও উপযুক্ত পরিশ্রম করার সাধ্য অনেকেরই কুলোত না। শাস্ত্রীয় অথবা বিদেশী ভাষা শিক্ষার পরে সেই ভাষাতে আপন মনোভাব প্রকাশ করা সর্বকালেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তার চাইতে মাতৃভাষা শিক্ষা করে মনোভাব প্রকাশ করা শুধু সহজসাধ্যই নয়, মাতৃভাষাতে প্রকাশিত মনোভাব আন্তরিক ও যথাযথও হয়। আরও একটা কথা স্মরণীয় যে অন্যান্য সমস্ত শিল্পের চাইতে সাহিত্যের জন্যে বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন সবচাইতে কম হয়, ক্ষেত্র-বিশেষে আদৌ হয় না এবং বিভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির মধ্যে সাহিত্যের মাধ্যমটাই সবচাইতে ব্যাপক ও সর্বজনীন রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—মাতৃভাষা যখন সাহিত্যের মাধ্যম হয় তখন তা শুধু জ্ঞানচর্চার বা রসসৃষ্টির মাধ্যম নয়, তা মানুষের প্রাত্যহিক ভাব বিনিময়েরও মাধ্যম। অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পে যেমন সাধারণ মানুষের জীবন, আকাঙ্ক্ষা, প্রবণতা ইত্যাদির প্রতিফলন হয় তেমনই অন্যান্য সব শিল্পের চাইতে সাহিত্যে ওই প্রতিফলন আরও যথার্থ ও সম্যক হয় এবং সাহিত্যই হলো জনজীবনের প্রকৃত পরিচায়ক।

মুসলিমদের আগমনের অনেক আগেই প্রথমে প্রাকৃত ও পরে অপভ্রংশতে সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সংস্কৃতের প্রাচীন প্রতিপত্তি তাতে অল্পই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। স্বভাবতই মুসলিম শাসনকালে সে-প্রতিপত্তি আর থাকল না এবং তার ফলে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা পূরণ করতে বিভিন্ন আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষাগুলি ও সেসবের সাহিত্যে অঙ্কুরিত হলো। শাসকদের পক্ষেও সংস্কৃত ভাষার অপেক্ষা শাসিতদের নিত্য ব্যবহার্য ভাষাগুলি শেখা ও সেই ভাষাতে শাসিতদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হলো, উপরন্তু বহুক্ষেত্রে মুসলিম শাসকরাও এসব প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাতে অনুরক্ত ও উৎসাহী ছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অন্যতম আলাউদ্দিন

হোসেন শাহের নাম এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে পড়ে—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা সাহিত্যের যে অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল তার সঙ্গে হোসেন শাহের নাম নানাভাবে জড়িত এবং পরবর্তীকালে বিশ্বের অগ্রণী সাহিত্য রূপে বাংলা যে স্থান লাভ করে তার ভিত্তি হোসেন শাহের আমলেই স্থাপিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে নবাফ খাঁ, আবদর রহিম প্রভৃতি সংস্কৃতে কাব্যরচনা করলেও মুসলিম সাহিত্যিকরা অচিরে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করলেন যে সংস্কৃত অথবা আরবী বা ফার্সী জাতীয় কোনও ভাষার মাধ্যমেই তাঁরা বৃহত্তর জনমানসকে প্রকাশ করতে পারবেন না এবং ওইসব ভাষার বাহনে জনসাধারণের হৃদয়েও পৌঁছতে পারবেন না, সুতরাং তাঁদের আত্মপ্রকাশের তাগিদ শেষ পর্যন্ত পথ খুঁজে পেল প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে।

মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে সাহিত্যের যে-চর্চা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতস্তত ভাবে শুরু হয়েছিল তা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিলক্ষণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। দক্ষিণ ভারতের চিত্র অবশ্য অন্যরকম। সেখানে বরাবরই প্রাদেশিক ভাষাগুলির, বিশেষত তামিল ভাষার, একটা প্রাচীন জীবন্ত ধারা থেকে গেছে। কিন্তু সংস্কৃতের আশ্রয়ে উত্তর ভারতের যেসব ভাষা এতকাল জনসাধারণের মুখের ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল সেগুলির অধিকাংশই মুসলিমদের সংস্পর্শে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের বাহন হয়ে উঠল এবং এসব ভাষার মধ্যে আওধী, কোশলী বা তথাকথিত পূর্বী হিন্দী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী ও বাংলা সাহিত্যই প্রধান।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী প্রথম থেকেই ভারতীয় কল্পনায় গভীর ও ব্যাপক আসন অধিকার করে থেকেছে এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্যে এসব কাহিনীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখা যায়। এরই পাশাপাশি বিকশিত হলো শৌর্য-ও-প্রেম-মূলক বিভিন্ন লোকপ্রচলিত আখ্যান অবলম্বনে গাথা কাব্য ইত্যাদি রচনার নতুন ধারা। হিন্দীতে এজাতীয় রচনার সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন হলো লোরিক বা লোর ও চন্দার প্রেমোপাখ্যান নিয়ে ১৩৭০ খ্রীস্টাব্দে মৌলানা দাউদ কর্তৃক রচিত 'চন্দায়ন'। পঞ্চদশ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যের নায়ক হলেন সাধক কবি কবীর, তাঁর প্রথম দিকের কাব্যের ভাষা ছিল ভোজপুরী, কিন্তু কালক্রমে তাঁর কাব্যে কোশলী, খাড়ীবোলী ও ব্রজভাষার সমন্বয় ঘটে এবং ভাব ও ভাষার এক বহুব্যাপ্ত আবেদনের দরুন ক্রমে কাব্য বিহার থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সর্বত্র অশেষ সমাদরের বস্তু হয়ে ওঠে। ১৫০১ খ্রীস্টাব্দে 'মৃগাবতী' নামে কুতবন যে-কাব্য রচনা করেন তা রাজপুত

উপাখ্যান অবলম্বনেই রচিত, কিন্তু বছর ত্রিশেক পরে মঞ্ঝন কর্তৃক রচিত 'মধুমালতী' উচ্চ কল্পনাশক্তিতে মূল্যবান—'মধুমালতী'র অংশ বিশেষ পাওয়া গেছে, এই অংশ বিশেষ থেকেই বোঝা যায় যে কাব্যটি একালের শ্রেষ্ঠ কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য-কীর্তিগুলির অন্যতম। এর পরেই 'পদ্মাবতী'র কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী ও 'রামচরিত মানসে'র কবি গুসাই বা গোস্বামী তুলসীদাসের আবির্ভাবে হিন্দী সাহিত্য অসাধারণ সমৃদ্ধ হয়েওঠে। যোগমার্গের গভীর ও নিগূঢ় তত্ত্বগুলিতে জায়সীর যে কতখানি অধিকার ছিল তার অকাট্য পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'পদ্মাবতীতে: পরমাত্মা, জীবাত্মা ও দুরাত্মার পারস্পরিক সম্পর্কে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে যে-নাটক নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারই স্বাশ্রয়ী সাহিত্য-রূপ হলো 'পদ্মাবতী'। রামের মতো রাজা রতন সেন হলেন পরমাত্মা, রাবণের মতো দুরাত্মা হলেন আলাউদ্দিন এবং সীতার মতো পদ্মিনী জীবাত্মা এবং সীতা ও পদ্মিনীর জীবনের পরিণামও সমজাতীয়।

তবে একটি কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয় আওধী, কোশলী, মৈথিলী, ব্রজবুলি, ডিঙ্গলী প্রভৃতি ভাষাকে একালে অনেক সময় হিন্দী ভাষা বলা হয়, কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের দিক থেকে এ সমস্তই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা অর্থাৎ হিন্দী বলে যা পরিচিত তা আসলে নিতান্তই অর্বাচীন ভাষা। কিন্তু কাজ চালানোর সুবিধের জন্যে যে সাধারণ অর্থে হিন্দী ভাষাকে চিহ্নিত করা হয় সে অর্থেই আমরা এখানে হিন্দী শব্দটা ব্যবহার করব।

হিন্দীর সাহচর্যে রাজস্থানী, পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ভাষাগুলি স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান শুরু করল। মীরবাঈয়ের পদ বা গানগুলি কালক্রমে হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়ে থাকলেও এগুলি আদতে রাজস্থানী বা তার অন্তর্গত ভাষা মাড়ওয়ারী ভাষাতে রচিত হয়েছিল। পশ্চিমী পাঞ্জাবী ভাষার সাহিত্য সম্পদ উল্লেখ্য নয়, পক্ষান্তরে পূর্বী পাঞ্জাবী অর্থাৎ বর্তমান পাঞ্জাবী সাহিত্যের ভাষা ও হিন্দীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, কিন্তু পূর্বী পাঞ্জাবীতে বালা কর্তৃক রচিত 'জনম সাখী' নামক গুরু নানকের জীবনী ভারতীয় গদ্য সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে গুরু অর্জুন 'আদি-গ্রন্থ' প্রথম সংকলন করেন, কিন্তু তাঁর ভাষাতে ব্রজভাষা ও কোশলী হিন্দীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পাঞ্জাবী সাহিত্যে মুখ্যত সুফীদের মরমী কাব্যের ধারায় বিকশিত হতে থাকে এবং একালে অধিকাংশ পাঞ্জাবী কবি-ই আসলে সুফী মতাবলম্বী: লাহোরের চন্দর-ভাণ কর্তৃক রচিত 'বরহ্‌মন' বা 'ব্রাহ্মণ', ন'হাজার পদ্য সংবলিত আবদুল্লাহ-র 'বার অব' বা 'বারোটি প্রসঙ্গ', ছ' স্তবক বিশিষ্ট বুল্লে

শাহ্-র 'কাফী' নামে চিহ্নিত ক্ষুদ্র কবিতাবলী, আলী হায়দর রচিত ত্রি স্তবক বিশিষ্ট 'সী-হরফীস' প্রভৃতি অবলম্বনেই পাঞ্জাবী সাহিত্যের স্বাধীন যাত্র শুরু হয়।

গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে বিতর্ক বিদ্যমান। দ্বাদ শতাব্দীর বিখ্যাত জৈন সাধক ও পণ্ডিত হেমচন্দ্র এক শ-র উপর যে-পদগুলি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলিকে গুজরাতী, রাজস্থানী বা হিন্দী ভাষার নিদর্শ হিসেবে এক-এক পণ্ডিত এক-এক দাবি করেছেন। জনৈক অজ্ঞাত কবি রচিত 'বসন্ত-বিলাস' বোধকরি প্রথম যুগের সত্যিকার গুজরাতী সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত, এ যুগের অন্যান্যকাব্যের মধ্যে রণমল্ল-ছন্দ', 'উষা-হরণ,' 'সীতা-হরণ,' 'প্রবোধ চিন্তামণি' প্রভৃতির সঙ্গে জনৈক অজ্ঞাত লেখকের গদ্যরচন 'পৃথ্বীচন্দ্র'-চরিত্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুজরাতী সাহিত্যের নবযুগ সূচিত হলো নরসিংহ মেহতার আবির্ভাবে—ঝুলন নামক নতুন ছন্দে রচিত তাঁর গীতিকবিতাগুলি আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক সচেতনা ও শব্দগৌরবের বিস্ময়কর নিদর্শন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে একে একে আবির্ভাব হলো আখো বা অক্ষয়দাস, প্রেমানন্দ ভট্ট ও সামল বা শ্যামলদাস ভট্ট-র। প্রেমানন্দ ও সামল দুজনেই পৌরাণিক উৎস থেকে তাঁদের কাব্যের প্রসঙ্গে আহরণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কাব্যে পৌরাণিক চরিত্রগুলি গভীর মানবিকতায় বিশিষ্ট। আখো ছিলেন স্বর্ণকার, জড়বাদ ওধর্মীয় রক্ষণশীলতার তীব্র সমালোচক এবং সামাজিক সাম্যের প্রচারক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যেসব গুজরাতী কবি বিখ্যাত হন তাঁদের মধ্যে প্রীতম, ধীরো, প্রাগো প্রভৃতি জ্ঞানবাদী আর রাজা, রণছোড, রঘুনাথ প্রভৃতি ছিলেন ভক্তিবাদী, এদের মধ্যে রাজা ছিলেন ধর্মে মুসলিম, কিন্তু কবিতা লিখতেন শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে।

ভাষার ভৌগোলিক মানচিত্রে গুজরাতীর পশ্চিমে সিন্ধীর স্থান, কিন্তু গাথা সাহিত্যের মূল্যে সিন্ধীর স্থান সম্ভবত মানচিত্রের কেন্দ্রস্থানে হবে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ব্যালাড বা গাথার প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যেই প্রথম যুগের সিন্ধী সাহিত্য বিশিষ্ট: দলু-রই, সিন্ধুনদের দেবতা বরুণের অবতার উড়েরো-লাল, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সিন্ধুতে পরাক্রমশালী সুম্র বংশের বিভিন্ন নৃপতি যেমন ভুঙ্গের, দুদা, চনেসর বা চন্দ্রেশ্বর প্রভৃতিকে নিয়ে রচিত প্রতিটি গাথাই উল্লেখযোগ্য, আবার এসবের মধ্যেও চন্দ্রেশ্বর, তার অনুগতা পত্নী লীলা ও তার প্রেমিকা কৌনরোকে নিয়ে রচিত গাথাটি

বিশ্বসাহিত্যের একটি সম্পদ। কিন্তু এসব গাথার রচয়িতাদের নাম নিশ্চিত ভাবে স্থির করা কঠিন। একালে যাকে সিন্ধী ভাষা বলা হয় সে ভাষায় সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম হলো শাহ লতিফ—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ তাঁর সাহিত্যচর্চার কাল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে যেমন গুজরাতী, রাজস্থানী ও সিন্ধী তেমনই পূর্ব সীমান্তে অসমীয়া. ওড়িয়া ও বাংলাই প্রধান। অসমীয়া ভাষা কোন সময়ই সংস্কৃত ভাষা অথবা মুসলিম সংস্কৃতি দুটির কোনটির দ্বারাই বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয়নি, কেন না আসামের উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত দিয়ে কিরাত ভাষাগোষ্ঠীর জনসাধারণ সর্বদাই আসা যাওয়া করেছে এবং তারাও অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রথম সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অসমীয়া ভক্তি আন্দোলনের উদ্গাতা শঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য মাধবদেবের জীবনব্যাপী সাধনা ও সংগ্রামে। পক্ষান্তরে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ওড়িশাতে সাহিত্যের ভাষা ছিল পূর্বী মাগধী অপভ্রংশ এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্বী মাগধী অপভ্রংশের স্থান নেয় সংস্কৃত, রাজনীতির দিক থেকেও ওড়িশার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র, কেন না ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ওড়িশা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা শাসিত স্বাধীন রাজ্য। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শ বছর পরে উপেন্দ্র ভঞ্জর জন্ম হয় এবং তাঁর থেকেই শুরু হয় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব মুক্ত ওড়িয়া সাহিত্যের যাত্রা।

মুসলিম সংযোগের ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি বোধকরি বাংলাতেই হয়েছে। হোসেন শাহেরও আগে রুকনউদ্দিন বারবক শাহ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র কবি মালাধর বসুকে গুণরাজ খান উপাধি ও বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস ওঝাকে বিপুল সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রথম বাংলা মহাভারত ও ছুটি খানের নির্দেশে শ্রীকর নন্দী দ্বিতীয় বাংলা মহাভারত রচনা করেন. দামোদর যশোরাজ খান, কবিশেখর প্রভৃতি পদকর্তাগণ ছিলেন হোসেন শাহের আশ্রিত অথবা অনুগৃহীত। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যে-গৌরব তার সবটাই সুলতান, আফগান ও মুঘলদের রাজত্বকালে সৃষ্ট। শুধু হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নয়, ইসলামধর্মাবলম্বীরাও এসময়ে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং এসব মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতা সাবিরিদ খান, 'জ্ঞানপ্রদীপে'র কবি সৈয়দ সুলতান, তাঁর

শিষ্য মোহাম্মদ খান, কুতবনের লেখা 'মৃগাবতী'র অনুবাদকর্তা মহম্মদ খানের ও করিমুল্লা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

লক্ষণীয় যে মুসলিম সাহিত্যিকদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের এবং মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিদ্বয়ও পূর্ববঙ্গের—এই দুজন কবি হলেন দৌলত কাজী ও আলাওল। চিত্রশিল্পকে ও বিশেষ করে সংগীতশিল্পকে যেমন মুঘল ধারার শিল্পীরা ধর্মীয় বিষয় ও সংস্কার থেকে মুক্ত করেছিলেন তেমনই বাংলার মুসলিম কবিরা, বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে, ধর্মের প্রকটিত প্রভাব মুক্ত লৌকিক কাব্য ও বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক কাব্য রচনার পথ খুলে দিলেন: দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী, একান্ত মানবিক প্রেমের কাহিনী এবং এই ধারাতেই পরে অজ্ঞাতনামা কবিদের দ্বারা ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা রচিত হয়। বৈষ্ণবকাব্যের ও মঙ্গলকাব্যের কবিরা যখন মানুষের কথা বলেছেন তখন ধর্মের ঘোমটা টেনেছেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আড়ালে গোপন রেখেছেন লৌকিক অনুভূতিকে, কিন্তু পূর্ববঙ্গ-গীতিকাতে ওই লৌকিক প্রেমকেই প্রকাশ করা হয়েছে অ-লৌকিক কাব্যের আধারে। তবে বিভিন্ন শিল্প ও সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে একথা মানতেই হবে যে ইসলামের চ্যালেঞ্জ বা আহ্বানের মুখে দেশের সমষ্টিগত অচেতনায় মানবিকতার উন্মেষ শুরু হয়েছিল। এবং এজন্যে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এমন এক শিল্পের ঐতিহ্য ভারতবর্ষে গড়ে উঠতে থাকে যেখানে শিল্পীর ধর্মীয় সত্তা অথবা কোনও দিব্য শক্তির হাতে ক্রীড়নক হিসেবে পরিচয় গৌণ হতে থাকে, তার পরিবর্তে শিল্পীও যে মানুষ, তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি যে লৌকিক একথাটাই ক্রমশ পরিস্ফুট হতে থাকে।

কিন্তু মনে রাখা উচিত যে মানবিকতার উন্মেষ আর মানবিকতার প্রকাশ একই ঘটনা নয়, তা হলো একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দুটি সতন্ত্র পর্যায় মাত্র। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝব? প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি হলো ভারতীয় রাজা-মহারাজা বা সুলতান-বাদশাহের নয়, উচ্চবর্ণ বা উচ্চশ্রেণীর নয়, বৃহত্তর জনসাধারণের চরিত্রে ও চৈতন্যে সংগুপ্ত অভীপ্সা অনুসারী একটা জীবনপ্রবাহ। ভারতবর্ষে এই প্রবাহ যেমন প্রাচীন যুগে বিদেশী রক্তকে তেমনই মধ্যযুগে বিদেশী ধর্মকে প্রাথমিক সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে স্বীকার করে নেওয়ার পর রক্ত-ও-ধর্ম দিয়ে চিহ্নিত পরিচয়ের অতীত মানুষের অন্তর তথা যথার্থ পরিচয় অন্বেষণ করেছে এবং এই অন্বেষণ-বৃত্তিই ভারতীয় ইতিহাসকে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা ও জীবন দান করেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[বাংলার পরিপ্রেক্ষিত বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং এই পরিপ্রেক্ষিতের বিচার—বাংলার আদি অধিবাসীদের লোক-সত্য ও বৈদিক আর্যদের ব্রাহ্মণ-সত্য—ইসলামের আগমন ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব চৈতন্য কর্তৃক বাংলার লোক-সত্যের পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—বাংলার লোক-সাধনা।]

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শেষে উল্লিখিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ হবে যদি বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। বিশেষ ভাবে বাংলার ইতিহাসকেই পর্যালোচনার জন্যে নির্বাচন করার কতকগুলি কারণ আছে।

ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র দিল্লী থেকে বহুদূরে বাংলা অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই পোর্তুগিজ পর্যটক দুয়াতে বারবোসা বাঙালীদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের এক প্রবল প্রবণতা লক্ষ করেছিলেন। এর প্রায় সাড়ে চার শ বছর পরে দিল্লীর সংলগ্ন রাজপুতানা বা রাজস্থান, যুক্তপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশে, এমনকি বিহারও পার হয়ে এসে এই বাংলাতেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এমন বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে যে বাংলার বৃহত্তর অংশকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছিল এবং তার প্রায় পঁচিশ বছর পরে বাংলা ভাষী অধ্যুষিত বৃহত্তর ভূখণ্ডই, যা একদা বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব বাংলা ও পরে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল, অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলাদেশ নামে এক স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে বিশ্বের রাষ্ট্রপুঞ্জে স্বীকৃত হয়। এর থেকে নতুন করে প্রমাণিত হয় যে ধর্মের বন্ধনের চাইতে ভাষার সংহতি-সাধনের ক্ষমতা বেশি, কারণ ভাষা-ই হলো মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রকৃত মাধ্যম এবং ধর্মের মতো সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ভাষার বাহনেই মানুষের মনের জগতে প্রবেশ করে ও নির্গত হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা যেমন ঐক্য ও সংহতির কারণ হয়েছিল তেমনই আধুনিক ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষার সূত্রেই জাতীয়তাবোধের উৎপত্তি ও প্রসার হয়। বর্তমান অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক যেমন বাঙালী তেমনই ভারতের অন্তর্গত পূর্ব-প্রত্যন্তে অবস্থিত পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশই বাঙালী—দু দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও দুজনকেই কী করে ও কেন বাঙালী বলছি? বলছি এ জন্যে যে দুজনেরই মাতৃভাষা বাংলা। আমার এক বন্ধু কায়সুল হকও বাঙালী আবার এক বন্ধু দেবদাস জোয়ারদারও বাঙালী;

অথচ একজনের নাগরিকত্ব বাংলাদেশের আর একজনের ভারতের এবং নাম থেকেই অনুমাণ করা যায় যে একজন মুসলমান আর একজন হিন্দু। তবু এঁরা বাঙালী, কারণ বাংলাই এঁদের মাতৃভাষা। অর্থাৎ বাঙালীর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো বাংলা ভাষী।

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত বইগুলো থেকে মনে হয় যে বাংলায় বহুকাল ধরেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। কিন্তু অমলেন্দু দে ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'রুটস অফ সেপারিটিজম ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল' গ্রন্থে এবিষয়ে বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য নিরপেক্ষ ভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। 'নোটস অন দ্য রেসেস, কাস্টস অ্যাণ্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল' প্রণেতা ডক্টর জেমন ওয়াইজের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন, 'Previous to the eighteenth century the Hindu inhabitants of Beugal far exceeded the Muhammadan in numders.' তখন পর্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে লোকগণনা শুরু হয়নি, তাই প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই ব্যাপারটা বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে যে যখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হাতে সত্যই অনেক শক্তি ছিল তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় লঘু ছিল। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দেও দেখা গেছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৮১ লক্ষ, পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৭৬ লক্ষ, অর্থাৎ দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যে জনসংখ্যাগত ব্যবধান অনেক কমে এসেছে। কুড়ি বছরের মধ্যে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল—১৮৯১-র লোকগণনার হিসাবে দেখা যায় যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা যেখানে ১৮,০৬৮,৬৫৫ সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৫৮২,৩৪৯ এবং এ প্রসঙ্গে অমলেন্দু দে 'সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া ১৮৯১'-এর প্রণেতা সি. জে. ও. ডোনেলের যে-মন্তব্য উদ্ধার করেছেন এখানেও সেটা উদ্ধার করার প্রলোভন সংবরণ করা অসম্ভব। ডোনেল সাহেব লিখেছেন, 'The slight increase of Hindus between 1872 and 1881, amounting to only 141, 135 persons or 0·8 per cent., that of Musalmans being 7·1 per cent., was a sufficiently noticeable fact, but from the foregoing figures it appears that nineteen years ago in Bengal Proper Hindus numbered nearly half a million more than Musalmans did, and that in the space of less than two decades, the Musalmans have not only overtaken the Hindus, but have surpassed them

by a rmillion-and-a-half.' এ-প্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়—যে শ্রেণীর থেকে অকস্মাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল সেটা কোন শ্রেণী? সম্ভ্রান্ত হিন্দু শ্রেণীকে যেমন মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক শ্রেণী বলে তেমনই মুসলিম সম্ভ্রান্তকে শরিফ শ্রেণী বলে। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের বলে আজলফ বা আত্রফ শ্রেণী। চাষাভুষো, জোলা, খলিফা বা দর্জি, দপ্তরী, হাজম, মাদারী' বেদে প্রভৃতি নানাধরনের বৃত্তিজীবীদের নিয়েই আত্রফ শ্রেণী গঠিত। যে-ব্যাপারটা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য সেটা হলো মূলত আত্রফ শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। এই সঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যখন বাংলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এক নতুন উত্থান ও জাগরণের চেতনাতে গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সেই ঘটনার কালেই বাঙালী মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার গৌরব অর্জন করে। বাংলার জনসমষ্টির এক ধর্মীয় বিন্যাসের রূপান্তর কি অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের বিষয় নয়?

এই অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহল নিয়ে বাঙালী চরিত্র ও সংস্কৃতির মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রথমেই আসে বলপ্রয়োগে ধর্ম প্রচারের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমের প্রশ্ন। যদি অস্ত্রের সাহায্যেই বা বলপ্রয়োগেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়ে থাকে তাহলে মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র থেকে এত দূরে—বাংলাতেই—ইসলাম ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করল কী করে? বলপ্রয়োগে ধর্ম প্রচারের তত্ত্ব সত্য হলে মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতেই ইসলামের অধিকতর প্রতিষ্ঠা হওয়াই উচিত ছিল নাকি? কিন্তু কার্যত তা হয়নি। স্পষ্টতই বল-প্রয়োগের তত্ত্ব দিয়ে বাংলায় ইসলাম প্রচারের মূল কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেকে মনে করেন, নবাব-সুলতাননের দরবারে ও দপ্তরে উচ্চপদ পাওয়ার লোভেই জনসাধারণের একটা অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এটাই যদি সত্য হয় তাহলে দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলেই মুসলিমদের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত, কেননা সেখানেই উচ্চপদের সংখ্যা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সবচাইতে বেশি। সুতরাং উচ্চপদের প্রলোভন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রধান কারণ হতে পারে না। অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করা হয় দুটি পন্থায়—একটিকে তিনি তুর্কানা তরীকা এবং অন্যটিকে সুফীয়ানা তরীকা বলেছেন। তুর্কানা তরীকা হলো তুর্কী আরব পাঠান প্রভৃতি সৈনিকদের বলপ্রয়োগে ধর্ম-প্রচারের পন্থা এবং সুফীয়ানা তরীকা হলো মরমী সুফী সাধকদের প্রেমধর্ম

প্রচারের পন্থা। অস্ত্রশক্তিকে যেভাবে ভারতীয়রা ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছে প্রেমশক্তিকে সেভাবে প্রতিরোধ করতে পারেনি। যেখানে সুফীয়ানা তরীকাতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয় সেখানেই ইসলাম ধর্মকে প্রতিরোধ করা তথাকথিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে এবং বঙ্গ বা পূর্ব বাংলাকে এই ব্যাখ্যার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হিসেবে সুনীতিকুমার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী দুটি ব্যাখ্যা অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করে বা উচ্চপদের প্রলোভন দিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের তত্ত্বের চাইতে অনেক বেশি বাস্তব ও সঙ্গত হলেও সম্পূর্ণ নয়। কেননা সুফী সাধকরা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সাধনার অনুকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ছিল বলে সুফী সাধকরা বাংলায় বেশি পরিমাণে এসেছিলেন এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বেশি সংখ্যায় এসেছিলেন বলেই কি এখানে তাঁদের ধর্ম বেশি প্রচারিত হয়? তাছাড়া, বিশেষ করে বাংলাতেই তাঁরা অনুকূল সামাজিক পরিবেশ পেলেন কী করে?

রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ' গ্রন্থে লিখেছেন যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের নির্যাতন করত, তাই নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণের অত্যাচার থেকে অব্যাহতির আশাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এটা আংশিক সত্য হলেও এতেও পরিস্থিতির পূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না। কারণ ভারতবর্ষের সর্বত্রই নিম্ন-বর্ণের প্রতি উচ্চ-বর্ণ অত্যাচার ও শোষণ করেছে—করছে; হিন্দু নেতারা নিজেদের ধর্মকে যতটা উদার ধর্ম বলে প্রচার করেন, হিন্দু ধর্ম যে সত্যই ততটা উদার নয় এর, উদারতা যে বহুলাংশে প্রচারসর্বস্ব, তার প্রমাণ নিম্ন-বর্ণের আচরণেই মেলে।

কেরালার নিম্ন-বর্ণের প্রতি উচ্চ-বর্ণের অমানুষিক ব্যবহার অকল্পনীয়; রাজস্থানে এই বর্ণভেদ প্রথা যে বাংলার চাইতে কত সহস্র গুণ ভয়াবহ তা আমার স্বচক্ষে দেখা—সাধারণত নিম্ন-বর্ণের লোকদের বর্ণ অনুসারে পৃথক পৃথক পোষাক ও গহনা আছে এবং নিম্ন-বর্ণের লোকের পক্ষে এমন সাজ-পোশাক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যা উচ্চ-বর্ণের লোকের উপযুক্ত সাজপোশাক—১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে লক্ষ করেছি যে শহরাঞ্চলে কিংবা যোধপুর জেলার অন্তর্গত বৌরুন্দার মতো গ্রামে এইসব বিধি-বিচার শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ১৯৬৫-তে ওইসব নিয়ম অনেক কঠোর দেখেছিলাম; ১৯৭২-এর ১৭শে নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকাতে ব্রাহ্মণদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উত্তর প্রদেশের এক হাজার হরিজনের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের খবর প্রকাশিত হয়,

-এর কিছুদিন পরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের বান্দাতে ধনবান ব্রাহ্মণদের সশস্ত্র আক্রমণে গ্রামসুদ্ধ হরিজনরা ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরে এসে জেলা সমাহর্তার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে—সেই সময় দিল্লী যাওয়ার পথে এলাহাবাদ থেকে যাত্রীদের মুখে শুনি; রাঁচী-চক্রধরপুর রোডে অবস্থিত বাধগাঁওয়ের মিশনারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইকেল ডোঙ্রা আমায় বলেছিলেন, তাঁর বাবা একবার উচ্চ-বর্ণের লোকদের মতো হাঁটুর নিচে ধুতি পরেছিলেন, এবং তাঁর ওই স্পর্ধার জন্যে তাঁকে জমিদার বাড়িতে ডেকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয় এবং তার পরে তিনি খ্রীস্টান হয়ে যান। বাংলায় বর্ণভেদ প্রথা কখনই বাকি ভারতবর্ষের মতো অমানুষিক পর্যায়ে যায়নি। নিম্ন-বর্ণের প্রতি উচ্চ-বর্ণের নির্যাতন ও শোষণ-ই যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রধান কারণ হয় তাহলে বাংলার চাইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু অঞ্চলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন ব্যাপারটাকে কোন সরল তত্ত্ব দিয়ে বিচার করা যাবে না। বাংলাভাষী অর্থে বাঙালীরা যে অধিকাংশই মুসলমান একথাটা আজ বিশ্বের কাছে জলের মতো স্পষ্ট—ভদ্র বাঙালীরা একথা মানুক চাই না-ই মানুক, এটাই সত্য।

ভারতবর্ষের একেবারে পূর্ব প্রান্তে আসাম ও বাংলা। এই অঞ্চলের প্রথম দিকের অধিবাসীদের মধ্যে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়ীয় ও সর্বোপরি চীনা তিব্বতী ভাষা-গোষ্ঠী কিরাতদের শোণিত ও সংস্কৃতিই প্রধান। অষ্ট্রীক, দ্রাবিড়ীয় ও আর্য-ভাষীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তীর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু কিরাত-ভাষীরা প্রধানত মিথিলা-মগধ প্রভৃতি নিয়ে উত্তর বিহার থেকে সমগ্র বাংলায় ও আসামে বসবাস শুরু করে এবং এর বাইরে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ ছড়ায়নি। ভারতবর্ষে কিরাত জাতির ভূমিকা ও অবদান নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কিরাত-জন-কৃতি' নামক ইংরেজী গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ কপালী কিরাতরা আসামে এবং হ্রস্ব কপালী কিরাতরা আরাকান চট্টগ্রাম দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করে। উত্তর বিহার ও উত্তর বাংলার কিরাতরা সরাসরি হিমালয় থেকে নেমে আসে। লিচ্ছবী, শাক্য, মৌর্য প্রভৃতিদের কিরাতী ধারা থেকেই উদ্ভব; রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজ এদেরকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবেই গণ্য করত; লিচ্ছবীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করলেও মনু এদেরকে ব্রাত্য বা নীচ-ক্ষত্রিয় বলেছেন। এখানে তারাই ব্রাত্য যারা আর্যদের মতো যজ্ঞ পালন না করে ব্রত পালন করে। একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে বুদ্ধদেব শুধু আর্যদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী ছিলেন না, তিনি স্বয়ং কিরাত বংশোদ্ভূত।

এটা কৌতূহলোদ্দীপক নয় কি যে যেখানে আর্য ঋষিদের বর্ণনায় দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রুর উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে বুদ্ধদেব ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দুজনেই মস্তক মুণ্ডন ও ক্ষৌর করণকে ধর্ম সাধনার অঙ্গ হিসেবে নিয়েছিলেন? বৌদ্ধতন্ত্র ও সহজিয়া তত্ত্বগুলি বিশেষভাবে কিরাত জনগোষ্ঠীরই ধর্মীয় চিন্তা। পরে ওই সব তন্ত্র-তত্ত্ব স্বকীয় মাহাত্ম্যে সংস্কৃত রূপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় চিন্তার পরিসরে প্রবেশ ও স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত সমাজে কিরাতদের স্থান নিঃসন্দেহে নিচের দিকেই ছিল—কুরুক্ষেত্রে অংশ গ্রহণকারী প্রাগজ্যোতিষের রাজা ভগদত্তকে মহাভারতে 'ম্লেচ্ছ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে; বড়গাঁওয়ের তাম্রলিপিতে ৬৫০ থেকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আসামে শালস্তম্ভ বংশের রাজত্ব 'ম্লেচ্ছাধীনতা' বলে বর্ণিত।

বাংলায় আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ নাকি আদিশূরের আমল থেকে শুরু হয়; কিন্তু 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন, আদিশূরের আগে থেকেই বাংলায় ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব ছিল এবং অষ্টম শতকে বাংলার সর্বত্র ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। একথা সত্য যে পাল, চন্দ্র ও অন্যান্য প্রাচীন বাঙালী রাজবংশ ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্বীকার করেনি; তাছাড়া আদিশূরের আগে বাংলায় ব্রাহ্মণদের বসবাস থাকলেও তারা নিঃসন্দেহে ছিল প্রভাবহীন সম্প্রদায়; ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় শূর, সেন, বর্মণ প্রভৃতি রাজবংশের কালে আর এ-প্রসঙ্গে এটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাতা ঐ রাজবংশগুলি বাঙালী রাজবংশ ছিল না, তারা সকলেই ছিল অবাঙালী। এই অবাঙালী রাজবংশদের দিয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় যারা বসবাস করত তাদেরকে অর্থাৎ সেই আদি বাঙালীদেরকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধ্বজাধারীরা কী বলত? ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বাঙালীদের 'বয়াংসি' বা 'পক্ষী বিশেষাঃ' বলা হয়েছে; আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পুণ্ড্র বা উত্তর বাংলার অধিবাসীদের 'দস্যু' বলা হয়েছে। এছাড়া আর্যভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোতে বাঙালীদের উল্লেখ না থাকাতে বোঝা যায় যে উত্তর ভারতবর্ষের আর্যভাষীরা বাংলা সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন ছিল। এর পরে মহাভারতে এসে দেখা যায় যে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ভীম বাংলার সমুদ্র-তীরবাসী 'ম্লেচ্ছ'দের সাক্ষাৎ পান। ভাগবতপুরাণে যাদেরকে মূর্তিমান 'পাপ' বলা হয়েছে তাদের মধ্যে বাংলার অধিবাসীরা অন্যতম প্রধান অংশ। পুণ্ড্র বা উত্তর বাংলায় আর বঙ্গ বা পূর্ব বাংলায় যারা যাবে তাদেরকে স্বদেশে প্রত্যা-বর্তনের পরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এইরূপ বিধান বোধায়নের ধর্মসূত্রে পাওয়া

যায়। উচ্চ সমাজের বা উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই মনোভাব একদা যে সংস্কৃত ভাষী বৌদ্ধদের মধ্যেও সংক্রমিত হয় তার প্রমাণ হলো, আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প গ্রন্থটিতে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষাকে 'অসুর' ভাষা বলা হয়েছে। এইসব দেখেশুনে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর-ও-মধ্য-ভারতের লোকেরা পূর্বতম ভারতের বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, যেকালে এইসব কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবহার অন্যতর। এই অন্যতর জাতি, অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষাভাষী লোকদের সেইজন্যেই বিজেতৃ সুলভ দর্পিত উল্লাসিকতায় বলা হইয়াছে 'দস্যু', 'ম্লেচ্ছ', 'পাপ', 'অসুর' ইত্যাদি।"

প্রধানত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় থেকেই বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসার পেতে থাকে। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এই ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য প্রাচীন বা মধ্য যুগের কোনও পর্যায়েই বাংলার আদি অধিবাসীদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মেশেনি,তাদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করেনি,তা মুখ্যত উচ্চ-বর্ণ ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে একটা বিশেষ সামাজিক শক্তি হিসেবে সীমাবদ্ধ থেকেছে। আবার এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিও বহু ক্ষেত্রেই বাংলায় স্বকীয় লোক সত্য দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে—শুধু বিবাহের ব্যাপারেই দেখা যায় যে পান খিলি, গাত্রহরিদ্রা, গুটিখেলা, ধান ও কড়ি নিয়ে বিভিন্ন স্ত্রী আচার, খই ছড়ানো, ঝাঁপি স্থাপনা, দধিমঙ্গল প্রভৃতির কোনটাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অঙ্গীভূত জিনিস নয় এবং সম্প্রদান যজ্ঞ ও সপ্তপদী তথা মন্ত্রোচ্চারণের অংশ ব্যতীত বাঙালী বিবাহের সমস্তটাই অব্রাহ্মণ্য, অবৈদিক ও অস্মার্ত। বাংলাতে প্রচলিত বহুপুজো-আচারে, বহু ব্রত-অনুষ্ঠানে যে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না এটা বাঙালী জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ। বাংলার আদি অধিবাসীদের দুটো বড়ো অনুষ্ঠান এখনও রাঢ় বাংলায় সুপ্রচলিত—একটি ধর্ম ঠাকুরের পুজো, অন্যটি চড়ক পুজো, তবে দুটোই বর্তমানে শিবপুজোর সঙ্গে জড়িত। তবে নিম্নশ্রেণীর মানুষ যেমন প্যান্ট-শার্ট পরে হাতে ঘড়ি বেঁধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শামিল হতে চায় তেমনই মনসা, শীতলা, শনি প্রভৃতি লৌকিক পুজো-আচারগুলো ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে গ্রাহ্য হতে চাইছে, কিন্তু এগুলো আসলে একেবারে অব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান। বাংলার লোক-সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কত রকম অবৈদিক অনার্য উপকরণ দেখতে পাওয়া যায় তার বিশদ বিবরণ একালের বহু গবেষকের রচনাতে সুলভ। এই কারণেই বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম একদা সহজেই বিশেষ প্রভাবশালী হয়েছিল। পরে

সেন-বর্মণ প্রভৃতি বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়, কিন্তু মনে রাখা ভালো যে সে প্রভাব সমাজের উচ্চ স্তরে ও উচ্চ শ্রেণীতেই প্রতিষ্ঠা পায় বেশি।

মানুষের স্বভাব যেহেতু ঊর্ধ্বাভিমুখী তাই নিম্ন শ্রেণী ক্রমশ উচ্চ শ্রেণীর আচার-অনুষ্ঠান অনুকরণ শুরু করে আর তার ফলে অব্রাহ্মণ্য উপকরণ ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য উপকরণে রূপান্তরিত হতে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাঙালীর ধর্মীয় চিন্তার ভিত্তি হতে পারেনি, তা বাঙালী মানসিকতা ও সংস্কৃতির উপরিতলের বস্তু হয়েই থেকেছে, আপন লোক-সত্যের সরস মাটিতে শিকড় চালিয়ে বাঙালী বরাবরই ভারতীয় জন-অরণ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিচারে বৈদিক অনুষ্ঠানাদি বাঙালী জীবনের পল্লবপুঞ্জ বা প্রকট অলঙ্কার হয়েই থেকেছে এই নির্জলা সত্যটা সর্বতোরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তরা যখন ওই পল্লবপুঞ্জে নিজেদের প্রভূত পরিমাণে আবৃত ও সজ্জিত করল তখন ওইশ্রেণী স্বভাবতই বাংলার বৃহত্তর জনজীবন থেকে কী করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সে ইতিহাস যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট যে বাঙালী জনসাধারণের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের শোণিত সম্পর্ক নেই, থাকলেও তা এত অল্প যে তাকে গণ্য করাই ভ্রান্তিবিলাস এবং বৈদিক আর্য-সত্যের সঙ্গে বাঙ্গালী লোক-সত্যের সম্পর্ক এতই আপাত, এতই বাহ্যিক, এতই পল্লবগ্রাহী যে তাকেও নিঃসম্পর্কতা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

এবার এই বাঙালী লোক সত্যের ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসরণের চেষ্টা করা যাক। শুরু থেকে এই অনুসরণের চেষ্টা এখানে অকারণ, শুধু ইসলাম আগমনের অব্যবহিত পূর্ব থেকে অনুসরণ করাটাই এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

পাল রাজাদের আমলে বাংলার জনসাধারণের একটা খুব বড়ো অংশই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। পরে সেন রাজাদের আমলে প্রচণ্ড আগ্রহে ও প্রচারের জন্যে উৎসর্গিত প্রাণের উদ্দীপনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে বাঙালী সমাজে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণদের প্রতাপ এত বেশি বেড়ে যায় যে তা অচিরে অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায়; ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধার নয়, বলতে গেলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নতুন করে এই প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় সমাজের বিন্যাসকে দৃঢ়তর করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেজন্যে বহুতর অনুশাসনাদির বিধান দেওয়া হয়, যেমন প্রায়শ্চিত্তের অতীত পাপ বলে সমুদ্রযাত্রাকে নিষিদ্ধ করা হয় অথবা বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তিত হয়; প্রশাসনিক শাস্তির চাইতে সামাজিক শাস্তিকে জনসাধারণ বেশি ভয় করতে

থাকে, মহাসান্ধিবিগ্রহিকের চাইতে মৌহূর্তিক অনেক বেশি শক্তিশালী বা প্রভাবশীল হয় এবং এতে সূচিত হয় সঙ্ঘশক্তির অপ্রতিরোধ্য অবক্ষয়।

ব্রাহ্মণদের প্রতাপবৃদ্ধি, কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন, সামাজিক শাস্তির নানারূপ বিশদ বিধান—আপাত দৃষ্টিতে এসমস্তই গৌরবব্যঞ্জক ছিল এবং এখনও বহু বাঙালী পরিবার বিবাহ-জাত-শ্রাদ্ধ-কৃত্যাদির সময় সেই লুপ্ত গৌরবকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে মানতে হবে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাঙালী সমাজকে অসাড় ও জড়বৎ করে ফেলেছিল, দুর্বল করে ফেলেছিল সঙ্ঘশক্তিতে, উপরন্তু সমাজপতিদের প্রতি জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাকে বিরূপ করে তুলেছিল। সঙ্ঘশক্তি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছিল বলেই তন্ত্র-মন্ত্র-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতিতে মানুষের অন্ধবিশ্বাস জন্মেছিল; যখন এসব আচার-অনুষ্ঠান ও অলৌকিক শক্তির চর্চায় জনগণ অতিরিক্ত ব্যাপৃত হয় তখন তা মনুষ্যত্বের বিপর্যয়কেই সূচিত করে। এসময় এরূপ বিধানও দেওয়া হয়েছিল যে দেশ যদি শত্রুসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহলে সাদা অপরাজিতার মূল ধুতুরা পাতার রসে বেটে কপালে তিলক এঁকে মন্ত্র জপ করতে হবে,

ওং অং হং হলিয়া হে মহেলি বিহঙ্গহি সাহিণেহি
মশাণেহি খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুং ফট্ স্বাহা।

এবং শ্মশানভস্মে মণ্ডিত তূর্য বাজাতে হবে, তাহলেই ভবতি পরচক্রভঙ্গঃ স্বসৈন্যবিজয়ঃ।

'ধর্ম পূজাবিধান' নামক গ্রন্থ থেকে জানতে পাই যে এসময় ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে জনসাধারণ এতই উত্ত্যক্ত হয়ে উঠল যে তারা শেষে ধর্মঠাকুরের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করল,

মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইরূপ দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
এ বড় হইল অবিচার।

উৎপীড়িতের প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠে ধর্মঠাকুর আর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারলেন না, ব্রাহ্মণদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে যবন বা মুসলমান রূপ ধরে নেমে এলেন পৃথিবীতে—

বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল খনকার।

ধর্ম হইলা যবনরূপী　　　শিরে পরে কাল টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়　　　দেবগণে লাগে ভয়
খোদায় হইল এক নাম।
ব্রহ্মা হইল মোহাম্মদ　　　বিষ্ণু হইল পেগম্বর
মহেশ হইল আদম।
গণেশ হইল গাজী　　　কার্তিক হইল কাজী
ফকির হইল মুনিগণ।
তেজিয়া আপন ভেক　　　নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য আদি যত　　　পদাতিক হইয়া শত
উচ্চস্বরে বাজায় বাজনা।

পদ্যটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা নিষ্প্রয়োজন, তবে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না যে ব্রাহ্মণ্য প্রাধাণ্যের ফলে বৌদ্ধ ও নিম্ন-বর্ণের জনসাধারণ খুবই ক্লিষ্ট ও নির্যাতিত জীবন যাপন করছিল ও তারা নিষ্কৃতির জন্যে ঐশী শক্তির কাছে প্রার্থনা করছিল এবং সেসময় বাংলায় মুসলমান বিজয়াভিযান হলে তারা বেশ সমাদরের সঙ্গেই বৈকুণ্ঠ থেকে অবতীর্ণ পরিত্রাতা রূপে মুসলমানদের বরণ করেছিল। একদিকে সঙ্ঘশক্তির অভাব, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিপোষক রাজশক্তির প্রতি দেশীয় জনসাধারণের মনোভাব এবং সর্বোপরি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা—এই তিনটি কারণ মুসলিম অভিযাত্রীদের জন্যে বাংলা বিজয়ের কাজকে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছিল বলেই হয়তো এমন কাহিনী প্রচলিত হয় যে ইখতিয়ার-উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে লখনৌতি বা লক্ষ্ণাবতী অর্থাৎ গৌড় জয় করেন। মনে হয় একাহিনীর তাৎপর্য এই যে বখতিয়ার বিনা প্রতিরোধে এত অনায়াসে গৌড় জয় করেছিলেন যে সতেরো জন ঘোড়সওয়ার দিয়েই অমন জয় সমাধা করা যেত।

পশ্চিম বঙ্গে যখন মুসলিম বিজয় হয় সম্ভবত তার আগে থেকেই পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ মুসলিমদের সংস্পর্শে এসেছিল। আরব বণিকরা বা মূলত শেখ সম্প্রদায় যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজ্যজয়ের চাইতে বাণিজ্যিক তৎপরতায় অধিক আগ্রহী ছিল—তারা যেমন আরব সাগরবর্তী বিভিন্ন ভারতীয় বন্দরে ও সিংহলে পত্তনী পেতেছিল তেমনই বঙ্গোপসাগর দিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে ঘাঁটি গড়ে তোলে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতাপে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ যেমন

নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল তেমনই আবার কিছু পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় নেয় এবং দূরবর্তী অঞ্চল বলে এখানে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে বসবাস ও ধর্মচর্চা করতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি এদের মনোভাব কী ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়।

এর উপরে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী অধিবাসীদের মনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি আরও একটা কারণে বিরূপতা জাগে। 'রঘুবংশ' কাব্যে কালিদাস 'নৌসাধনোদ্যত' দেশ বলতে বাংলাকেই বুঝিয়েছেন এবং নৌসাধনোদ্যত জাতির মধ্যে আবার চট্টগ্রাম, নোয়াখালি. বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষভাবে সমুদ্রাভিযানে আগ্রহী ও অভ্যস্ত। যখন সমুদ্রযাত্রাকে প্রায়শ্চিত্তের অতীত পাপ বলে নির্দিষ্ট করা হলো তখন বাংলার অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের চাইতে অধিক পরিমাণে পূর্ববঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী জনসাধারণের স্বভাবের গতি ও রক্তের আকর্ষণকেই অস্বীকার করা হলো ও নিষিদ্ধ করা হলো। সমুদ্রের দুরন্ত বাতাস তাদেরকে নিরন্তর নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধানে যাত্রা করার জন্যে আহ্বানে উন্মনা ও অস্থির করে তুলত, সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গুঞ্জনমর্মর রক্তে জাগাত বহুকালের বহুপুরুষের স্মৃতিমদিত তরঙ্গের আন্দোলন, কিন্তু সামাজিক নিষেধের নিগড় ভেঙে সমুদ্রাভিযানে বেরিয়ে পড়ার মতো দুর্দান্ত সাহস তাদের ছিল না, কেননা তাহলে পরিবারস্থ সকলকেই জাতিচ্যুত হতে হতো। সমুদ্রে যারা নির্ভীক, সমাজে তারাই সম্পূর্ণ নিরুপায়।

এমন সময় আরব বণিকরা এসে নোঙর ফেলে চট্টগ্রামে। সমাজপতিদের ভয়ে যারা ঘরের কোণে জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছিল তাদেরকে এই আরবরা ডাকল সমুদ্রে, আশ্বাস দিল, সাহস দিল, জোগাল নতুন ভাবে বাঁচার প্রেরণা, দিল নতুন ধর্মের আশ্রয়, দিল আত্মবিস্তার ও আত্মবিশ্বাসের অধিকার, সামাজিক স্বীকৃতি ও সমতার প্রতিশ্রুতি। যাদের রক্তে ছিল পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সমুদ্রের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ তারা পরম উৎসাহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল কাতারে কাতারে। আরব বণিক সম্প্রদায়ের অর্থাৎ শেখদের কাছ থেকে তারা ইসলাম নিয়ে তারাও হলো শেখ এবং এই কারণে পূর্ববঙ্গে আজও মুসলমান বা মহামেডান শব্দের বিকল্পে শেখ বা 'শ্যাখ' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন আছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্কী, আফগান, পাঠান ও মুঘলরক্তের যতটা সংমিশ্রণ কালক্রমে হয় ততটা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়নি—পূর্ববঙ্গে বিদেশী রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকলে

আরব্য রক্ত হয়েছে এবং সেটাও খুব অল্প পরিমাণেই হয়েছে, কেননা সেখানে আরবের শেখরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি, রাজত্বও করেনি।

পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে সেই সেন রাজাদের পর থেকে মুসলিমরাই রাজত্ব করে এসেছে। ইংরেজ আমলে, বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাজানুগ্রহ লাভের আশায় যেমন ইংরেজী শেখার হিড়িক পড়ে যায়, তেমনই মধ্যযুগের বাংলাতে, বিশেষত পশ্চিম বাংলায়, একই কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্যেও জনসাধারণের মনে প্রবল উৎসাহ সঞ্চারিত হয় বলে সন্দেহ জাগে। শাসন ক্ষমতার অধিকারী মুসলমানরাও বাংলার জনসাধারণের এই উৎসাহের সদ্ব্যবহারে কোনরূপ ত্রুটি রাখেনি এবং সত্যি সত্যি ধর্মান্তরিতরা বহু ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অপেক্ষা শাসন ব্যবস্থায় উচ্চতর পদলাভ করেছে।

এ ছাড়াও তুর্কানা তরীকা অর্থাৎ বল প্রযোগ দ্বারা বহু হিন্দুকে মুসলিম করা হয়েছে। অবশ্য কোনও হিন্দুকে মুসলমান করার জন্যে সেকালে যা বল-প্রয়োগ করা হতো তাকে আধুনিক মানদণ্ডে পর্যাপ্ত বলপ্রয়োগ বলা যাবে কিনা সন্দেহ। বলপ্রয়োগ মানে অস্ত্রপ্রয়োগ নয়, কোনমতে কারও মুখে শুধু গোমাংস স্পর্শ করিয়ে দেওয়ার জন্যে যেটুকু বলপ্রয়োগের দরকার সাধারণত সেটুকুই প্রয়োগ করা হতো; যার উপরে এরূপ বল প্রয়োগের জন্যে তুর্কীরা উদ্যত হতো সে নিশ্চয়ই উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবেশীদের সাহায্য প্রার্থনা করত, কিন্তু কেউই তার সাহায্যে এগিয়ে আসত বলে মনে হয় না, কারণ কোনক্রমে সাহায্যকারীরও গোমাংসের স্পর্শ লেগে যেতে পারত এবং তা লাগলেই তারও ধর্মনাশ হতো—মুহূর্তের জন্যে আন্তরিকতম অনিচ্ছাতেও গোমাংস-স্পৃষ্ট হলে কারও আর হিন্দু ঘরে ফিরে যাওয়ার কোনও দরজা খোলা থাকত না।

কোন কোন ক্ষেত্রে তুর্কীদের বল প্রয়োগের মাত্রা যে সত্যিকার নৃশংসতার পর্যায়তেও চলে যেত সেকথাও অনস্বীকার্য, কিন্তু স্বভাবতই সে-জাতীয় নৃশংস আচরণের কারণ ঘটত খুবই কম, কারণ হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধেরও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলার প্রথম মুসলিমরা ছিল সংস্কৃতিবর্জিত তুর্কীরা—ইসলাম ধর্মের অন্তঃসার কতটা তাদের মগজে ঢুকেছিল সেটাও বলা মুশকিল। সম্ভবত তাদের কাছে স্পর্শকাতর ও প্রতিরোধে অক্ষম হিন্দুদের ধর্মনাশ করাটা যতখানি পুণ্যের বিষয় ছিল তার চাইতে বেশি ছিল নিষ্ঠুর কৌতুকের বিষয়; অনুরূপ ভাবে মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করার পেছনেও ধর্মোন্মাদনার চাইতে মন্দিরে সঞ্চিত ও বিগ্রহে সংলগ্ন ধনরত্ন ও অলঙ্কারাদি হস্তগত করার ইচ্ছাটাই ছিল অধিক প্রবল।

যাহোক, এভাবে যারা ইসলাম ধর্মকে স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করল তারা যে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ইসলামের তুলনা-মূলক সূক্ষ্ম বিচারে পারঙ্গম ছিল তা নয় : নিতান্ত আধিভৌতিক কারণেই তারা মুসলমান হয়, তাদের নাড়ীর যোগ থেকে যায় পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত গল্প-কাহিনীতেই, ইসলাম ধর্ম-শাস্ত্রাদি চর্চা না করে তারাও পূর্বপুরুষদের মতোই রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করত—

হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে (স্মরণ করে) ।।

হিন্দুরা যেমন গুরুর প্রতি ভক্তিশীল তেমনিই মুসলমানরা গুরুর পরিবর্তে পীরের প্রতি ভক্তিশীল অর্থাৎ মুসলমানের পীর হলো হিন্দু গুরুর বিকল্প এবং ক্রমে ক্রমে সত্যপীর, মানিকপীর, ঘোড়াপীর, মাদারীপীর ও কুমীরপীর নামে পাঁচ পীরের পুজো আরম্ভ হলো। মৎস্য ও কচ্ছপকে খাদ্য দেওয়া, গাছের ডালে সুতো বাঁধা ইত্যাদি গ্রাম্য হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার বাঙালী মুসলমানরা মেনে থাকে ইসলামের নির্দেশে নয়, বহু পুরুষের ধারা বাহিত বিশ্বাসে। এইভাবে হিন্দুদের বনদুর্গা বা বনদেবী, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবী মুসলমানদের বনবিবি, ওলাবিবির রূপ নিয়েছেন। বড় খাঁ গাজী বা জিন্দাপীর বা গাজীসাহেব এখনও দক্ষিণ বঙ্গের বনময় অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুজো ও হাজোত পান এবং অনুষ্ঠানের শেষে পুরোহিত বা ফকির সুর করে বলেন,

গাজী মিঞার হাজোত সিন্নি সম্পূর্ণ হলো।
হিন্দুগণে বলো হরি মোসিনে আল্লা বলো ।।

বাংলায় লৌকিক দেবদেবীর বিষয়ে অনুসন্ধানে দেখা যায় যে তাঁদের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বা পক্ষপাত নেই।

এপ্রসঙ্গে বনদুর্গার কাহিনীটি খুব তাৎপর্যময়। মুন্সী বয়নদ্দী রচিত 'বোনবিবির জহুরানামা' থেকে জানা যায় যে রসুলের নির্দেশে বনবিবি ও তাঁর ভাই শাহ্-জাঙ্গলী মক্কা থেকে সুন্দরবন জয় করতে আসেন। সুন্দরবনের রাজা দক্ষিণরায় খবর পেয়ে যুদ্ধযাত্রার জন্যে যখন প্রস্তুত হচ্ছেন তখন তাঁর মা নারায়ণী এসে বললেন, বনবিবির সঙ্গে তাঁরই যুদ্ধ করা উচিত হবে। তারপরে বনবিবি ও নারায়ণীর মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হলো, শেষে ফতেমার আশীর্বাদে বনবিবির শক্তি বেড়ে গেল, তখন আত্মরক্ষার্থে নারায়ণী তাঁকে সই ডেকে ফেললেন। যুদ্ধ থেমে গেল, দুজনে সই হলেন, নারায়ণীর পুত্র দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বনবিবি

মিলিত ভাবে সুন্দরবন শাসন করতে লাগলেন। 'বোনবিবির জহুরানামা'র সঠিক রচনাকাল নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবে এই কাব্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়নি সেটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সেই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের স্বরূপ নানা বিভেদ, মিলন, বিরোধ ও পারস্পরিক বোঝাবুঝির মধ্যে দিয়ে কোনখানে এসে দাঁড়িয়েছিল তারই রূপক যেন 'বোনবিবির জহুরানামা'য় বিধৃত হয়েছে।

তবে 'বোনবিবির জহুরানামা'র কথা পরীক্ষার্থীপাঠ্য বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না, সেসব ইতিহাসে পাওয়া যাবে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কবির আত্মপরিচয় অংশে মুসলিম শাসকদের অত্যাচারের কাহিনী। বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্তিকারগণ মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়ে প্রথম থেকেই মুসলমানী অত্যাচারের এক জলন্ত সমকালীন দলিল আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁদের ওই আবিষ্কারের ভিত্তিতে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিকও কাব্যের মর্মে প্রবেশ না করে, সমকালীন তথ্যাবলী যাচাই না করে ভাসা-ভাসা ধারণার বশবর্তী হয়ে 'বাংলাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ' গ্রন্থে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'সাধারণ কৃষক ও প্রজাগণের দুঃখ দুর্দশার অবধি ছিল না। ইহার অনেকগুলি কারণ ছিল। তাহাদের মধ্যে অন্যতম রাজকর্মচারীদের অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর গ্রন্থকার মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দামিন্যায় ছয়সাত পুরুষ যাবৎ বাস করিতেছিলেন—কৃষিদ্বারা জীবন-যাপন করিতেন। ডিহিদার মামুদের অত্যাচারে যখন তিনি পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন তখন তিন দিন ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হইল যে তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদক পান শিশু কাঁদে ওদনের তরে।' একই গ্রন্থে বাংলাসাহিত্য শীর্ষক পরিচ্ছেদের লেখক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন, 'ডিহিদার মামুদ (বা মুহম্মদ) সরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে থাকেন এবং মুকুন্দরামের প্রভু গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী করেন; তখন মুকুন্দরাম হিতৈষীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশ ত্যাগ করেন; অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া এবং ঠিকমত স্নানাহার করিতে না পাইয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হয়;' ইত্যাদি।

এইসব প্রচলিত ইতিহাসে অনেক সময় যে কতকগুলি প্রচলিত বিশ্বাসকে প্রচার করা হয় মুকুন্দরামের ব্যাপারটা তার একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চণ্ডীমঙ্গলে স্বয়ং মুকুন্দরাম ফুল্লরার দুঃখকষ্টের যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর দেশত্যাগের পরে পথের দুঃখকষ্টকে আদৌ দুঃখকষ্ট বলেই মনে হওয়া উচিত

নয়; তবে বলা যেতে পারে যে তিনি আগে কোন রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করেননি, সেজন্যে মাত্র কয়েক দিনের পথযাত্রার কষ্টও অনেক দুঃখকষ্ট। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২ কার্তিক পৌষ ১৩৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ক্ষুদিরাম দাসের লেখা 'মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্যরচনা প্রসঙ্গ' নামক মূল্যবান প্রবন্ধটির উল্লেখ করতেই হবে। সমকালীন ঘটনাবলীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলে প্রদত্ত আত্মপরিচয় অংশটি মিলিয়ে বিশ্লেষণ করে ক্ষুদিরাম দাস চারটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : 'মুকুন্দরাম বিধর্মী শাসকের অত্যাচারে বিতাড়িত হন নাই। কিন্তু কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্ট সামগ্রিক পরিবর্তনমূলক নূতন ভূমি ও শাসন-ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় গোপনে পলাইয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও নিপীড়িত হন নাই। ২, তিনি যে আরড়া গেলেন তার কারণ, উহাই সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান যেখানে পুরাতন মুদ্রামান বজায় ছিল এবং পুরাতন জমিদারের অধিকারের আশ্রয়ে সাময়িক নিশ্চিন্ততা বর্তমান ছিল। ৩, তাঁহাকে দুর্বিপাক ভোগ করিতে হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু তাহা বেশি দিনের জন্য নহে। পথযাত্রার কষ্ট ১০।১৫ দিনের হইতে পারে। ৪, তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনায় হস্তক্ষেপ ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কখনই হইতে পারে না।'

আসল কথা এই যে এতদিন পর্যন্ত দেশে যে-শাসন ব্যবস্থা ছিল তাতে ভূম্যধিকারীরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত এবং একেবারে সাধারণ প্রজারা সম্পূর্ণরূপে ভূম্যধিকারীদের অনুগ্রহ-করুণা-বিবেচনার ভরসাতেই জীবনযাপন করত। কালিকারঞ্জন কানুনগো 'শের শাহ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কেমন করে শের শাহ-ই প্রথম প্রজাদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্যে সচেষ্ট হন এবং তার ফলে তাঁর প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থা জায়গীরদার, তালুকদার প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর প্রতিকূলে চলে যায়। শের শাহের প্রয়াস সফল হয়নি, কিন্তু মুঘল আমলে প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে আরও কয়েক ধাপ এগুনো হয়। আফগান আমলের মুদ্রা বাতিল করে মুঘল মুদ্রা চালু করা হলে যারা পুরনো মুদ্রায় ধনসম্পদ মজুত করে রেখেছিল তারা মুশকিলে পড়ে; যাদের কাছে অল্প পরিমাণে পুরনো মুদ্রা ছিল তারা অবশ্য সহজেই সেগুলো নতুন মুঘল মুদ্রায় পাল্টে নিতে পারে। মুঘল আমলে নির্দেশ দেওয়া হলো যে ভূম্যধিকারীদের মাধ্যমে নয়, জমির খাজনা সরাসরি রাজ সরকারে প্রজাদেরই জমা দিতে হবে। বলাবাহুল্য, প্রথম প্রথম রাজ সরকারে নিজেরা গিয়ে খাজনা জমা দেওয়ার ব্যাপারটা প্রজাদের কাছে ঝামেলা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে জমিতে প্রজার স্বত্ব অনেক পাকা হয় এবং তালুকদাররা আর নিজেদের মেজাজ-

মর্জি অনুসারে প্রজাদের জমি থেকে উৎখাত করতে পারে না। এই সঙ্গে জমি জরিপ করে নতুন পড়চার ব্যবস্থা চালু করা হয়। যতই হিতকর হোক, সব রকম নতুন ব্যবস্থা, নিয়মানুবর্তিতা ও স্বত্বরক্ষার দায়িত্ব প্রথম প্রথম ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা বলেই জনসাধারণের কাছে মনে হয়। আর আপন শ্রেণীর সুবিধা-হরণকারী আইন যে বিত্তবানদের কাছে অত্যাচার বলে মনে হবে এটাও স্বাভাবিক। ক্ষুদিরাম দাস দেখিয়েছেন যে মুকুন্দরামের 'প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে', কারণ তিনি জমিজমা বা রাজস্বগত গুরুতর কোনও স্খলনের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ব্যাপার এমন জট পাকিয়েছিল যে পরিত্রাণের কোনও উপায় ছিল না। তালুক-দারের বিপদ দেখে ভয় পেয়েই মুকুন্দরাম দামিনা ছেড়ে এমন এক জায়গায় গেলেন যেখানে জমি-জমা ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নতুন আইনগুলো তখনও প্রবর্তিত হয়নি এবং সেখানে তখনও আফগান আমলের পুরোনো মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

এখনকার ভাষায় সমস্ত ব্যাপারটাকে এভাবে সরল করে বলা যায় যে, তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা মুঘল শাসকরা করেছিল তা স্বভাবতই কায়েমী স্বার্থের আঁতে ঘা দিয়েছিল এবং মুকুন্দরাম কায়েমী স্বার্থকে বিপন্ন হতে দেখেই স্বগ্রাম ত্যাগ করেছিলেন, কেননা তিনি নিজে পরিপুষ্ট ছিলেন কায়েমী স্বার্থের দ্বারাই। এখানে বিরোধটা ছিল সম্পূর্ণতই অর্থনৈতিক এবং এই অর্থনৈতিক বিরোধকে ধর্মীয় বিরোধের রং দেওয়ার প্রয়াসটা এযুগের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির একটা প্রকাশ।

যাহোক, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে একাধিক সুস্পষ্ট বিভেদ ছিল একথা অস্বীকারের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এই বিভেদ উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ও বড়ো বড়ো জনপদে যতখানি ছিল গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী বা নিম্নশ্রেণী বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে ততখানি ছিল না, বরং পূর্ববঙ্গের শ্রমজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভাবটাই ছিল প্রবল এবং বলপ্রয়োগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের চেষ্টাও সেখানে কম হয়েছিল, সুতরাং উৎপীড়ক হিসেবে মুসলিমের রূপটাও সেখানকার তৎকালীন লোকাভিজ্ঞতায় ছিল অস্পষ্ট অথবা অবাস্তব। তুর্কী-পাঠানদের সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা পশ্চিম বঙ্গবাসীদের রচনাতেই সীমাবদ্ধ, পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে অত্যাচারী মুসলিম শাসক অনুপস্থিত। উভয় বঙ্গের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলায় ইসলামের প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়া এক ভাবে, এক রেখায় ও এক ধারায়

বিবর্তিত হয়নি; সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক শুধু বিরোধের অথবা শুধু মিলনের ছিল না, এক জীবন্ত ও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতেই তা বিবর্তিত হয়েছে একথা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

সামগ্রিক বিচারে মানতে হবে যে, ইসলাম স্বাতন্ত্র্যে গৌরবান্বিত বাংলার জনসাধারণকে অজ্ঞাত-পূর্ব মুক্তির স্বাদ দিল। বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর তথা শ্রমজীবী জনসাধারণকে দিল ব্রাহ্মণ্য নির্যাতন ও কঠোর অনুশাসনাদির থেকে মুক্তি, প্রতি পদে সামাজিক অপমানের থেকে মুক্তি, পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রস্পৃহ জনসাধারণকে দিল ভৌগোলিক বিধি-নিষেধের বন্দী দশা থেকে মুক্তি, বহু আয়াসসাধ্য সংস্কৃত ভাষার বন্ধন কেটে জনসাধারণকে দিল মাতৃভাষাতে আত্ম-প্রকাশের অধিকার, সাহিত্যের বাহনের মতোই প্রসঙ্গ বা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও দিল ধর্মীয় বন্ধন থেকে মানবিক প্রসঙ্গে মুক্তি। একই সঙ্গে এত রকম মুক্তির স্বাদ দেওয়ার উপরে মুসলমান শাসকরা যোড়শ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত কার্যত রক্ষা করে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে। অর্থাৎ বাংলার বহু সাধনাত্মক ইতিহাসকে ইসলাম যে-ধ্রুবপদে বেঁধে দিল তার নাম স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা।

বাংলার জীবনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বহুতর অপকীর্তি সত্ত্বেও তাদের মূল অবদান যে বহুমুখী স্বাধীনতা-চিন্তার জন্মদান এবং ওইটেই যে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের হৃদয়ে ইসলামের অসামান্য জনপ্রিয়তার গুপ্তরহস্য এটা চৈতন্যদেব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মনে হয়। আচার-অনুষ্ঠান-অনুশাসন ইত্যাদিতে আধ্যাত্মিক সাধনার পথকে কষ্টসাধ্য ও বিঘ্নসঙ্কুল করে, ক্রমাগত কূর্মবৃত্তিতে সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিজের বিলুপ্তির পথকেই প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর করেছে, জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে তথা শ্রমজীবী শ্রেণীকে ঠেলে দিয়েছে ইসলামের আশ্রয়ে, পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মকে করে তুলেছে পরাভূতের মনোভাবে গোপনে গৃহকোণে সশঙ্ক ও সন্ত্রস্ত ভাবে অনুসরণের বিষয়। ইসলামের ওই অনায়াস গতিকে রোধ করার জন্যে চৈতন্যদেব বেরিয়ে এলেন প্রকাশ্য রাজপথে, উচ্চকণ্ঠের জয়ধ্বনিতে হিন্দু সমাজের মধ্যে জাগালেন বিস্ময়কর উদ্দীপনা ও সাহসিকতা, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকেই সমদৃষ্টিতে আহ্বান জানালেন নগর-সংকীর্তনে, সুজন-দুর্জন সুশীল-দুঃশীলেরও ভেদ রাখলেন না এবং এই সমতার সূত্রেই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদেরকে, গতর খাটিয়ে খাওয়া মানুষদের মুক্তি দিলেন তাদের আধ্যাত্মিক হীনতার থেকে। অনায়াসে চৈতন্যদেব স্পর্শকাতর বিধানসর্বস্ব বাংলার হিন্দু জনসাধারণের জীবনে মুক্তির

যে-বীজ বপন করলেন মন্থণ ভাবে তার বিকাশ ও বিবৃদ্ধি শুরু হয়ে গেল নিজের অন্তঃশক্তিতেই।

পরবর্তীকালে বৈষ্ণবভক্তরা চৈতন্যদেবকে শুধু দাস্য-মাধুর্য প্রভৃতি কোমল ও বিনম্র ভাবের বিগ্রহ হিসেবেই কল্পনা করেছেন, কিন্তু তিনি যে অনন্য সাধারণ বীরত্ব ও পৌরুষের প্রতীক সেকথা আজ প্রায় বিস্মৃত। সেন রাজাদের আমল থেকে প্রায় পাঁচ শ বছরের ইতিহাসে বাংলার মানুষ ধর্মের নামে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়নি, ধর্মকে কোন মতে রক্ষা করার জন্যে অরণ্যে পর্বতে কন্দরে আত্মগোপন করতে অথবা নীরবে নত মস্তকে নির্যাতন সহ্য করতে ও ধর্ম-ব্যবস্থাকে আরও জটিল করতেই শিখেছে। নবদ্বীপের কাজী যখন কীর্তন নিষিদ্ধ করলেন তখন চৈতন্যদেব তা সহ্য করলেন না, দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন :

ভাঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে।
কীর্তন করিব দেখি কোন কর্ম করে।
তিলাধেকো ভয় কেহ না করিও মনে।

চৈতন্যদেবের সমকালীন বৃন্দাবন দাস গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, কাউকেই ভয় করতেন না, তিনি যেমনটি জেনেছেন 'চৈতন্যভাগবতে' তেমনটিই লিখেছেন,—

ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা।
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বলে বার বার।

কিন্তু চৈতন্যর এই অসামান্য ঋজুতা ও চরিত্রের বলিষ্ঠতাকে চৈতন্যোত্তর কালে দাস্য- মাধুর্য ভাবের ভক্তরা ও জীবনীকাররা উদ্ধত ও হিংসাত্মক আচরণ হিসেবে গণ্য করে বর্জন করেছেন।

চৈতন্যদেবের লক্ষ্য ছিল স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল, ব্রাত্য ইত্যাদি আপামর জনসাধারণের জাগরণ সম্পাদন করা এবং এই উদ্দেশ্যেই নিত্যানন্দকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে পুরী থেকে বাংলা দেশে পাঠিয়েছিলেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী খেতুড়ি মহোৎসব পরিচালনা করতেন এবং ভক্তদের মন্ত্রও দিতেন। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানিও ছিলেন মন্ত্রদাত্রী। বলরাম দাসের পদ থেকে জানা যায় যে কুলবধূরাও সংকীর্তনে যোগ দিতেন। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সাধকরাও মন্ত্রদানের অধিকারী হন এবং তাঁদের কাছ থেকে

বহু ব্রাহ্মণ মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন। রঘুনাথ দাস বর্ণে কায়স্থ ছিলেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান ছয় গোস্বামীর মধ্যে তিনি স্থান লাভ করেন। রঘুনাথের এক জ্ঞাতি সম্পর্কের খুল্লতাত ছিলেন কালিদাস, শূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের উচ্ছিষ্ট তিনি গ্রহণ করতেন। হরিদাস ঠাকুর নামে বিখ্যাত মুসলমানভক্তকে স্বয়ং অদ্বৈত আচার্য শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করেন এবং তিনি কীর্তনের সময় সমস্ত বর্ণের ভক্তদের সঙ্গে একত্রে নাচগান করতেন। এভাবে তৎকালীন বাঙালী হিন্দু সমাজে এক অশ্রুতপূর্ব সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হলো। আত্মরতিবৃত্তির থেকে মুক্তি, বাস্তব-সত্য থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি, পরাভূতের মনোভাবের থেকে মুক্তি, নিষেধাত্মক বা নঙর্থক ব্যবস্থাদির থেকে মুক্তি এবং সেসঙ্গে আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্বমহিমা-বোধের বিস্ময়কর জাগরণের ফলে চৈতনোত্তর বাঙালী হিন্দু সমাজ লাভ করল এক অভিনব জঙ্গমতা, প্রাণের শক্তিতেই সে-সমাজ প্রবাহিত হলো নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যকে গ্রাস করে এবং ইসলামের অনেক আকর্ষণকে আত্মসাৎ করে ক্রমশ আত্মবিস্তার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে।

এতকাল যে-বৌদ্ধরা ও ব্রাত্যরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিষ্পেষণে ইসলামের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করেছে অথবা আত্মরক্ষার কথা ভেবেছে তারা দেখল যে ইসলামের জনপ্রিয়তা রোধ করার জন্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর শিষ্যরা তথাকথিত হিন্দু ধর্মকেই ইসলামের অনুরূপ অথবা তার চাইতেও বেশি উদার ও সম্প্রসারণশীল করে তুলেছেন। অতঃপর ইসলামের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা নিরর্থক, বরং আরব্ধ সমাজ-বিপ্লবকে আরও বেশি সার্থক করে তোলার প্রয়াস পাওয়াই সমীচীন। চৈতন্যদেব কর্তৃক উপস্থাপিত মুক্তির বাণীতেই তারা পেল স্বধর্ম ত্যাগ না করে প্রকাশ্যে নিজেদের প্রত্যয় ও প্রবণতা অনুসারে জীবনযাপনের জন্যে সমর্থন, সাহস ও শক্তি। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদেব বাংলার লোক-সত্যকেই পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এজন্যেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষে কি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার নানা স্থানে সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। সহজিয়াদের দর্শন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান', অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়,' মণীন্দ্রমোহন বসু 'পোস্ট-চৈতন্য সহজিয়া কাল্ট অফ বেঙ্গল' এবং ক্ষিতিমোহন সেন 'বাংলার সাধনা' ও 'বাউল পরিচয়ে' যে-আলোচনা করেছেন তার পরে আমার পক্ষে তাঁদের সাধন মার্গে পদক্ষেপের চেষ্টা ধৃষ্টতা হবে, তদুপরি সহজিয়া দর্শন নয়, আমার আলোচ্য বিষয় হলো ইসলামের আগমনের দরুন বাংলার তথা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া।

ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত নিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহের এবং

বিবাহভঙ্গের সরল প্রথাকে যৌন স্বাধীনতা বলা যায় এবং এই যৌন স্বাধীনতা বরাবরই শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে ইসলামের একটা বড়ো আকর্ষণ বলে পরিগণিত হয়েছে ; পক্ষান্তরে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ বরাবরই মনে করেছে যে এরূপ স্বাধীনতা মহাদোষাবহ। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব ধর্মাচরণ কিন্তু এই যৌন স্বাধীনতাকে নিম্নবর্ণের সমাজ-জীবনে সসম্মান স্বীকৃতি দিল এবং একই সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারকেও স্বীকার করল, উপরন্তু কণ্ঠিবদলের সূত্র ধরে যেমন বিবাহের তেমনই বিবাহবিচ্ছেদের প্রথাকেও সরল করে দিল। এছাড়া পরকীয়া প্রেমও গণ্য হলো ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসেবে এবং পরকীয়া প্রেম তথা পরস্ত্রী-গমনের স্বপক্ষে সমর্থন উপস্থাপন করা হলো অথর্ব-সংহিতা, ছান্দোগ্যোপনিষদ, বৌদ্ধ গ্রন্থ কথাবত্থু প্রভৃতির প্রামাণ্য বিধানে ও দৃষ্টান্তে। কথাবত্থুতে একাধিপ্পয়ো বলে যে-প্রথার উল্লেখ আছে তা অনুসরণে যে কোন নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেই তাদের যৌনসঙ্গমও ন্যায়সঙ্গত।

বলা বাহুল্য, হিন্দু সমাজের মধ্যে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গতর খাটিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে না অর্থাৎ যারা মেহনতী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয় তারা এসব আচারপ্রথাকে কোনকালেই প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখেনি, তারা যখন ঐরূপ কোন কিছু করেছে, ব্যভিচার করার জন্যেই করেছে, ফলে তারা যে-কোনরকম যৌন-স্বাধীনতাকেই অশ্লীল ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারে নি, কিন্তু এসব কারণে আগের মতো আর সহজিয়াদের ধর্মচ্যুত বা সমাজচ্যুত করার কিংবা অন্য কোন ভাবে উৎপীড়নের পথ বন্ধ হয়ে গেল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি থেকে যে সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো তা আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, কর্তাভজা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত এবং তাদের উপাস্য অথবা প্রেমাস্পদেরও বহু নাম, সেসবের মধ্যে আল্লা, খোদাতালা রুসুল, হক প্রভৃতি ইসলাম সংক্রান্ত নামও আছে, কিন্তু যেহেতু এদের মধ্যে বৈষ্ণব ধারণার প্রভাব ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সংগীতই সর্বাধিক তাই এদেরকে অনেক সময় বৈষ্ণব সহজিয়াও বলা হয়। শাস্ত্র-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে ভগবান ও ভক্তের ঐকান্তিক সরাসরি উপলব্ধিই এদের সাধনার মূল কথা এবং এদিক থেকে সুফী সাধনার সঙ্গে এদের সাধনার বিলক্ষণ প্রকট সাদৃশ্য বর্তমান—এতে কোনও সন্দেহ নেই যে বিশেষত উত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় সাধনা যেমন মুসলিম সাধকদের সঙ্গে সংযোগের পরিণাম তেমনই বাংলা দেশের লোক-সাধনাও বিশেষ ভাবে সুফী-পন্থী ইসলামের প্রভাবে সমৃদ্ধ।

কিন্তু একথা মনে করা ভুল হবে যে এই সহজিয়া সম্প্রদায় সম্পূর্ণ অভিনব ও আকস্মিক ভাবে উদ্ভূত, ঐতিহ্য বিরহিত ও অর্বাচীন একটি সম্প্রদায়। প্রকৃতপক্ষে কথাবস্তু অথবা জাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচক সরোরুহপাদ রচিত দোহাকোষ কিংবা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের সারমর্ম অনুধাবন করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে প্রাচীন কালে যা ছিল বৌদ্ধ সহজিয়া তা চৈতন্যোত্তর কালে বহুলাংশে বৈষ্ণব সহজিয়া রূপ পরিগ্রহ করে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতাপের কালে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে' বা লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপনে চলে যায় এবং যখন এদেশে ইসলামের আগমন হলো তখন তার একটা বৃহৎ অংশ ইসলামীয় মরমীবাদের প্রচ্ছদে ব্রাহ্মণ্য শাসনের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে; আর যে-অংশ তা করল না তারা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষণটির প্রতীক্ষায় আত্মগোপনেই থাকল—সেই প্রার্থিত ক্ষণটি অবশেষে উপস্থিত হলো যখন ক্রম-বর্ধমান ইসলামের প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্যে চৈতন্যদেব হিন্দু সমাজের বিন্যাসকেই উদার, গণতান্ত্রিক, গ্রহণশীল, অতিথিপরায়ণ ও বহুমতসহিষ্ণু করে তুললেন—এবং এইভাবে এতদিনে সত্যি সত্যি সহজিয়াদের অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হলো। চৈতন্যদেব যা সম্পন্ন করলেন তাকে এদেশীয় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিপ্লব বলা যায় এবং এই বিপ্লবে ব্রাত্য সহজিয়াদের আত্মপ্রকাশ করার বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হলো—সম্ভবত এই জন্যেই অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছেন যে চৈতন্যদেব হলেন বাউলদের আদিগুরু।

বাউল বলতে এখানে সমস্ত শাখার সহজিয়াদেরকেই সাধারণভাবে বোঝানো হচ্ছে যদিও প্রকৃতপক্ষে বাংলার মরমীতত্ত্বেরই একটি বিশেষ শাখা হলো বাউলিয়া তত্ত্ব। বাউল মানে বায়ুগ্রস্ত বা পাগল, কিন্তু আউল কথাটা আকুল থেকে কি সুফীদের আউলিয়া থেকে এসেছে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল; সাঁই এসেছে স্বামীর বা প্রভুর তত্ত্ব থেকে যেমন কর্তার বা গুরুর ভজনা থেকে এসেছে কর্তাভজা; দরবেশী শুনলেই বোঝা যায় যে এদের মধ্যে মুসলমানী ভাব প্রবল, আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ন্যাড়া সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেও এঁরা দরবেশীদের মতোই নানা বর্ণের বস্ত্রখণ্ডে প্রস্তুত ফকিরী আলখাল্লা ও মাথায় টুপি পরেন। প্রচলিত অর্থে যাকে সমাজ বলা হয় বাউলরা সেই সমাজের আইন-কানুন বারণ শাসন মানেন না, কেননা তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের কোনও সামাজিক অস্তিত্ব নেই, সামাজিক জীবন নেই অর্থাৎ সামাজিক অর্থে তাঁরা মৃত এর থেকেই এসেছে বাউলদের জ্যান্তে মরার গূঢ় তত্ত্ব। মৃত্যু মানে লীন হয়ে

যাওয়া—শূন্যেই হোক, পরাশক্তিতেই হোক, মহানাস্তিতেই হোক, প্রত্যেককেই একদিন চিরতরে লীন হয়ে যেতে হবে। বাউলদের বিশ্বাস, লীন হতে হলে প্রেমে লীন হওয়াই সব চাইতে ভালো, আর প্রেমে মরতে হলে জীবন্তেই মরা ভালো, তাকেই বলে জ্যান্তে মরা। কবীর বলেছেন, 'জীবত মেঁ মরণা ভলা, জো মরি জানৈ কোয়'—মরতে জানলে জীবন্তেই মরো। বাউলদের জ্যান্তে মরা আর সূফীদের ফনা ফিল্লা একই তত্ত্বের দুটি নাম। বাউলদের প্রেম সাধনা কী রকম? 'নিত্য দ্বৈত নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম।' তাই দেহতত্ত্বের গানে শুনি, 'এক আর একে এক হলো, শুভঙ্করের পাঠশালায় আমার অঙ্ক শেখা হলো না।'

বাউলদের বেশ-বাশে হিন্দু ও মুসলমান দু ধারারই ঐক্য সাধনার ইঙ্গিত আছে। সংসার-বিমুখ শাস্ত্রীয় তত্ত্ববাদী হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো তাঁরা নগ্নগাত্রে ভস্ম আচ্ছাদন করে কৌপীন পরেন না, দেহকে কষ্ট দিয়ে দেহাতীত সত্যের সাধনাও করেন না, দেহ আর আত্মাকে পৃথক বলে গণ্য করেন না, আবার দেহ আর আত্মাকে অভেদ বলেও মনে করেন না। 'আছে তোরই ভিতর অতল সাগর তার পাইলি না মরম।' দেহের মধ্যে আত্মার যে সমুদ্র তার মর্ম বোঝা দায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।' বাউলিয়া তত্ত্বে কায়াই হলো সমস্ত সৃষ্টির পীঠ—'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' দেহতত্ত্ব মানলে আর কিছুই মানার দরকার হয় না, বিগ্রহ মানার দরকার হয় না, ব্রতাদি মানার দরকার হয় না, শাস্ত্র মানার দরকার হয় না।

কারে বলব কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।

এই দেহতত্ত্বকে বেদ-পুরাণ, যুক্তি-তর্ক, তথ্য-ভাষ্য দিয়ে বিচার করতে গেলে বাউলরা বলেন,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহুরী,
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি।

সুতরাং বাউলদের প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্ম বা মুসলমান ধর্মের বিচারও হাস্যকর, উভয় ধর্মের অমোঘ অবলম্বন যে মানুষ সেই মানুষই হলো বাউল তত্ত্বের মূলাধার। কায়াযোগে বিশ্বাসী বলেই এঁরা দেহকে যত্নে আবৃত রাখেন এবং সে দেহাবরণ আবার সূফীদের পরিধেয়ের মতোই আলখাল্লা, তাঁরা সর্ব কেশ ও ঝুলি লাঠি-কিশতী রাখেন। বাউলদের মধ্যে নানা শাখা আছে বটে, ভেখে-ভাখে অর্থাৎ বেশে ও ভাষায় এসব শাখার মধ্যে অল্পবিস্তর

তারতম্য থাকলেও এরা সকলেই শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের বিরোধী এবং কোন-না-কোন অনুরাগতত্ত্বই এঁদের কাছে পরম সত্য বা হক্।

দুঃখের বিষয় পুরনো কালের বাউলদের নাম ধাম জানা যায় না, কারণ তাঁরা কেউই নিজের নামের প্রচার চান নি; যেসব বাউলদের নাম-ধাম ইত্যাদি জানা যায় তাঁরা কেউই সপ্তদশ শতাব্দীর আগের নন। সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত বাউল হলেন আদিনাথ, তাঁর শিষ্য মূলনাথ, তাঁর শিষ্য নিত্যনাথ, নিত্যনাথের বন্ধু ও গুরুভাই ছিলেন মনাই ফকির, নিত্যনাথের শিষ্য কালাচাঁদ, তাঁর শিষ্য হারাই, তাঁর শিষ্য দীননাথ, তাঁর শিষ্য ঈশান এবং ঈশানের শিষ্য হলেন একালের অন্যতম প্রধান বাউল মদন। ক্ষিতিমোহন সেনের রচনায় পদে পদে মদন বাউলের গানের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন লালন ফকিরের শিষ্য গগন ডাকহরকরার; লালনের অপর বিখ্যাত শিষ্যের নাম হরিনাথ মজুমদার, তবে তিনি কাঙাল হরিনাথ নামেই বেশি প্রসিদ্ধ, তাঁর শিষ্য ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যদিও তিনি প্রকাশ্যে বাউল জীবন পালন করতেন না। কর্তাভজা শাখার আদিগুরু সত্য মহাপ্রভু আউলেচাঁদ পানের বরোজে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে, তাঁকে মানুষ করেন মহাদেব বারুই, কোনও অজ্ঞাতনামা মুসলমান সহজিয়ার কাছে তিনি দীক্ষা নেন এবং কলন্দরের ফকিরদের মতো তিনি বেশ পরতেন, তাঁর শিষ্যরাও ফকিরের মতো থাকতেন বলে গানে আছে, 'আউলেচাঁদ দোয়া গুরু সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার'। মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয় চাকদার কাছে পরারি গ্রামে।

উল্লিখিত ধারাগুলির মধ্যে প্রথম ধারার প্রথম তিনজন গুরুর নাম আদিনাথ, মূলনাথ ও নিত্যনাথের নাম থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে এঁরা বৌদ্ধ সহজিয়া নাথ-পন্থী ছিলেন, আবার এই ধারার অন্তত দুজন বিখ্যাত সাধক—মনাই ও মদন—যে জন্মত মুসলমান ছিলেন স্পষ্টতই জানা যাচ্ছে। এই ধারাতেই বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামীয় উপকরণের অবিভাজ্য সংমিশ্রণ হয়েছে এবং অন্বেষণে দেখা যাবে যে বাউলদের অন্যান্য ধারাতেও এ রকম সংমিশ্রণ প্রচুর, আর যেখানে এরকম সংমিশ্রণের সূত্র পাওয়া যাবে না সেখানেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম মনে হবে। লালন ফকির কিংবা আলেচাঁদের মধ্যে ইসলামের সূফী সাধনা যে বিশেষ ভাবে সক্রিয় সে-বিষয়ে প্রশ্নই ওঠে না। এসব সাধকদের দীক্ষা দান বা দীক্ষা গ্রহণের প্রথাও খুব সহজ—দীক্ষা বলতে এঁরা কানে দেওয়া বা মুখে মন্ত্র আউড়ানো বোঝেন না—বোঝেন এমন এক আশ্চর্য উদ্ভাসনকে যা চকিতে সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে মানুষকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে দেয়।

উচ্চসমাজে উচ্চশ্রেণীতে দীক্ষা বা গুরু সম্বন্ধে যে-ধারণা প্রচলিত আছে তার সঙ্গে সহজিয়াদের দীক্ষা বা গুরু সম্বন্ধীয় ধারণার কোনও মিল নেই। সহজিয়া গুরু হিন্দু হতে পারেন, মুসলমান হতে পারেন, স্ত্রী হতে পারেন, কন্যা হতে পারেন, সবকিছুই হতে পারেন, তাঁর বাহ্য পরিচয় অবান্তর, রূপসাগরের গভীরে যিনি অরূপরতনের সন্ধান দেন তিনি-ই গুরু।

আদিনাথ মূলনাথ নিত্যনাথের ধারায় বলরাম নামে এক বিখ্যাত বাউল ছিলেন। বলরাম একদিন মেঘনার তীরে দেখলেন যে একটি মেয়ে বিয়ের পরে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে—মায়ের আলিঙ্গন ছেড়ে নৌকোতে ওঠার সময় মেয়ের কান্না শুনে বলরামের এমন ভাবান্তর হলো যে তিনি নিত্যনাথের কাছে হাজির হলেন। নিত্যনাথ কিন্তু বলরামকে দীক্ষা দিলেন না, বললেন যে ওই মাতৃবিচ্ছেদ-ব্যাকুল অপরিচিতা কন্যার কাছে তাঁর দীক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকার বিখ্যাত দাশু বাউলের শিষ্য বলে পরিচিত দুর্লভের আসল গুরু ছিলেন তাঁরই কন্যা—প্রথম জীবনে দুর্লভের মধ্যে কোনও আধ্যাত্মিক প্রবণতা ছিল না, কিন্তু কন্যার অকাল মৃত্যুর পরে অন্তরের অস্থিরতায় দাশুর কাছে গেলে দাশু বললেন, 'তোমার মেয়েই তোমার গুরু। তুমি তো দীক্ষিত। তুমি ধন্য। এখন থেকে আমার কাছে থেকে তুমি-ই আমাকে পথ দেখাবে।' নিতাই বাউল বলেছেন, স্ত্রীর মৃত্যুর বারো-তেরো বছর পরে একদিন হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অনুভব করলেন, অমনই নিমেষে সব দীপ্ত হয়ে গেল। এভাবে গুরুলাভ বাউলদের জীবনে হামেশাই ঘটে থাকে। এজন্যই বাউলরা গায়—

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।
গুরু যে তোর বরণডালা, গুরু যে তোর মরণজ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয়ব্যথা, যে ঝরায় দুনয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[কেরলে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শতকরা হিসাব—রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের স্থান—ভারতীয় বাণিজ্য নামে পরিচিত সামুদ্রিক বাণিজ্য—আরবা পত্তনী—ইহুদী পত্তনী—পোর্তুগিজদের আক্রমণ—খ্রীষ্টান পত্তনী—কেরলে ইসলামের প্রচারে চেরমান পেরুমলের ভূমিকা—কেরলে বর্ণভেদ প্রথা—কেরলে ইসলামের জনপ্রিয়তা—ইসলাম ও শঙ্করাচার্য—মোপলাদের পরিচয়—মালাবার উপকূলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি হিসেবে ইসলাম—ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গে রাজপুতানা বা রাজস্থানের দৃষ্টান্ত।]

মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র দিল্লী থেকে বাংলা বহুদূরে অবস্থিত হলেও এখানে কালক্রমে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয়ে ওঠে; অনুরূপ ভাবে দিল্লীর থেকে বহুদূরে এবং ভারতবর্ষের সুদূরতম দক্ষিণে অবস্থিত হলেও কেরলে জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ১৯৭১-এর লোক গণনার হিসাবে দেখা যায় কেরলের মোট জনসংখ্যা ২১, ৩৪৭, ৩৭৫—এর মধ্যে ১২, ৬৮৩, ২৭৭, জন হিন্দু অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার ৫৯.৪১% জন হিন্দু। এর পরেই আদমসুমারির হিসাবে খ্রীস্টানদের স্থান—তাদের সংখ্যা হলো ২১.০৫% অথবা ৪,৪৯৪,০৮৯ জন। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সেই প্রথম যুগ থেকে কেরালাতে মধ্যে মধ্যেই খ্রীস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে কখনও প্রেম ও সাহসিকতার ধর্ম হিসেবে, কখনও বন্দুক ও তরোয়ালের সন্ত্রাস জাগিয়ে, আবার কখনও চাকরি-বাকরির ও অর্থনৈতিক-বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতির টোপ দিয়ে। কেরালাতে বলপ্রয়োগে বা সাম্রাজ্যিক শক্তির জোরে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কোনও প্রমাণ নেই, তা সত্ত্বেও ওই একই বছরের লোকগণনার হিসাবে কেরালাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা হলো ৪,১৬২,৭১৮ অর্থাৎ ১৯.৫০% জন।

শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কোনও সাম্রাজ্য স্থাপনের আগেই, কোনরূপ সশস্ত্র অভিযান ব্যতীত, সেই রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের যুগেই দক্ষিণ ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা একটা সম্মানের আসন পেয়েছিল। আরব ঐতিহাসিকরা রাষ্ট্রকূট রাজাদের বল্‌হরা নামে উল্লেখ করেছে—বল্‌হরা শব্দটা প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত বল্লভরাজ-এর প্রাকৃত রূপ বল্লহ-রায় শব্দটির বিকৃত রূপ। মাস্‌দী লিখেছেন, "সিন্ধু ও হিন্দের রাজাদের মধ্যে রাজা বল্‌হরা-র মতো

মুসলিমদের কেউই সম্মান করেন না। তাঁর রাজত্বে ইসলামকে শ্রদ্ধা ও রক্ষা করা হয়! পাঁচবার নমাজের জন্যে মসজিদ এবং বড়ো জমায়েতের জন্যে জুম্মা মসজিদ তৈরী করা হয়েছে।" অল ইস্তখ্‌রি আরও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য দিয়েছেন, "শহরগুলোতে মুসলমানরাও আছে এবং বল্‌হরা-র কোন কোন শহর মুসলমানরাই শাসন করে।" মাস্‌দী, অল ইস্তখ্‌রি, ইবন হয়্যুকল প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে হিন্দু রাষ্ট্রকূট রাজাদের উদারতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, কিন্তু এই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয় যে সেই নবম ও দশম শতাব্দীতেই দক্ষিণ ভারতের ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা যেমন সম্মানে তেমনই সংখ্যাতে একটা তাৎপর্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল।

এটা লক্ষণীয় ব্যাপার যে ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক অংশেই সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বের তিনটি প্রধান ধর্মমত এসে পৌঁছোয়। ঐতিহ্য অনুসারে ইহুদীরা তাদের ধর্ম নিয়ে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকেই এখানে আসে, কালিকটে ভাস্কো ডা গামা জাহাজ ভেড়াবার অনেক আগেই আসে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকরা এবং অনুরূপ ভাবে আরব সৈনিকদের সশস্ত্র সিন্ধু অভিযানের অনেক আগেই আরব বণিকেরা আসে। ধর্মমত ছাড়াও এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম একটা প্রবল সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়; তারও আগে জৈন ও বৌদ্ধ, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম এখানে খুব জনপ্রিয় ছিল। এসব কারণে ভারতবর্ষের ধর্মীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্র হিসেবে কেরলের ইতিহাস বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। এখানে সেই ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়।

অশোকের শিলালিপিতে দক্ষিণ ভারতকে চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র ও কেরলপুত্র—এই চারটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। চোল রাজ্য বর্তমান অন্ধ্র-প্রদেশ, পাণ্ড্য হলো তামিলনাড়ু, সতিয়পুত্র মহীশূর আর কেরলপুত্র হলো কেরালা বা কেরল, প্রাচীনকালে এই কেরালা পরিচিত ছিল চেররাজ্য বলে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বাণিজ্যিক ভূগোলে কেরালার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রেয়ন সীজ' গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণিজ্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। বিত্তবান রোমানদের জন্যে ভারতবর্ষ সরবরাহ করত শৌখিন দ্রব্যাদি—এইসব দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল চিনি, মধু, নারকেল, উৎকৃষ্ট চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, নানারকম খাদ্যমশলা, মূল্যবান পাথর, রত্ন ইত্যাদি, চন্দন ও নানারকম উত্তম জাতের কাঠ, রেশম ও সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি এবং বাঁদর, ময়ূর, টিয়া প্রভৃতি জীবজন্তু। এর মধ্যে সব কিছুই যে কেরালাতে বা দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন হতো তা নয়, কোন কোন খাদ্য বা মশলা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে, চীন থেকে চীনাংশুক নামে পরিচিত রেশম, বাংলা থেকে মসলিন নামে পরিচিত অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র নিয়ে এসে জমা করা হতো মালাবারের বন্দরে বাজারে, আবার সেখান থেকে এগুলো রপ্তানী করা হতো ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন বন্দরে বাজারে। এবং এইসব বন্দর থেকে, মুখ্যত জেনোয়া আর ভেনিস থেকে, সেগুলো আবার চালান হতো ইয়োরোপের অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান বাজারে। রোমান সাম্রাজ্য থেকে চীন সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্যের কেন্দ্র বা মধ্যস্থ ভূভাগ ছিল ভারতবর্ষ এবং এজন্যে এই বাণিজ্য অভিহিত হতো ভারতীয় বাণিজ্য বলে। ঐতিহাসিক প্লিনী আক্ষেপ করেছেন যে এই ভারতীয় বাণিজ্য রোমের জাতীয় সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন পণ্য চীন বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাভা সুমাত্রা চম্পা প্রভৃতির বন্দর থেকে নিয়ে আসা হতো বটে, কিন্তু অধিকাংশ পণ্যই আসলে ভারতবর্ষের নিজস্ব পণ্য ছিল এবং এই বাণিজ্য সত্যই ছিল ভারতবর্ষের স্বপক্ষে।

ভারতীয় বাণিজ্য হলেও এই আন্তর্দেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত আরব বণিকরা বা আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, দক্ষিণ আরবের বণিকরা। ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলো ছেড়ে তাদের জাহাজ এসে ভিড়ত ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন বন্দরগুলোতে, এখান থেকে কেউ কেউ সোজা পাড়ি জমাত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দিকে, কেউ কেউ হরকন বা বর্তমান বঙ্গোপসাগরের উত্তরের উপকূলে অবস্থিত বাংলার বন্দরগুলোতে থেমে, কেনাবেচা সেরে, আবার দক্ষিণ পূর্বে পাড়ি জমাত, চলে যেত চীনের খানফু বা বর্তমান ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত। এক কথাতে এটা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য, দুটি প্রান্তবর্তী লক্ষ্যস্থানের মধ্যে যোগসূত্র ছিল ভারতীয় উপকূলের বন্দরমালা এবং এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত আরব দেশীয় বণিকরা। যখন থেকে তারা এই বাণিজ্য করে আসছে তখন পর্যন্ত মহম্মদের আবির্ভাবই হয়নি, সুতরাং উল্লিখিত আরব বণিকদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রশ্নও দেখা দেয়নি। মৌসুমী বায়ুর গতি প্রকৃতি ও সেই অনুসারে জাহাজ চলাচলের রীতিনীতি আরব বণিকরাই প্রথম অনুধাবন করে, 'বাণিজ্যের ঋতু' অর্থে তারা আরবীতে 'মৌজিম' শব্দটা ব্যবহার করত এবং কালক্রমে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় জিহ্বাতে ওই শব্দ রূপান্তরিত হয় 'মৌসুম' ও 'মনসুন' শব্দ দুটোতে। শুধু ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার আগে থেকে নয়, খ্রীস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই আরবরা এই বাণিজ্য চালিয়ে আসছে এবং বাণিজ্যের সুবাদেই তারা সেই আদিকাল থেকেই মালাবার উপকূলে বসবাসও করছে।

আরব পত্তনীর মূল কারণ অবশ্যই বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক কারণ। সম্ভবত তার সঙ্গে যোগ দেয় কেরালার প্রাচীন সমাজব্যবস্থা—কেরালার মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজে সবকিছুতে নারীর অগ্রগামিতা, পারদর্শিতা ও স্বাধীনতা ওই আরব বণিকদের কাছে এদেশে বসবাসের অতিরিক্ত আকর্ষণ বলে প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক। তখন পর্যন্ত আরবরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়নি। মহম্মদের আবির্ভাবের পরে যখন আরবরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে তখন আপনা থেকেই কেরালাতে ইসলাম ধর্ম মসৃণভাবে প্রবেশ করে।

৬৮-৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে আরবদের মতো আর এক সেমেটিক জাতি ভারত-বর্ষে আসতে শুরু করে—এরা হলো স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদী। হড্রিয়ন কর্তৃক বিতাড়নের পর ১৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে তারা বিপুল সংখ্যাতে ভারতবর্ষে আসা শুরু করে এবং কোডুঙ্গল্লুর ছাড়াও পালায়ার-চৌঘাট, পানতালায়নি, এজহিমালা প্রভৃতি জায়গাতে তারা বসবাস শুরু করে। দলে দলে আগত এইসব ইহুদীদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দলটি দশম শতাব্দীতে জোসেফ রব্বনের নেতৃত্বে আসে এবং তখনকার চের রাজা তাদের বসবাসের জন্যে পর্যাপ্ত জমি দান করেন। জোসেফ রব্বনের অনুগতরা সাধারণত ত্রিবাঙ্কুরের ইহুদী বলে পরিচিত, এদের একটা গোষ্ঠী দৃঢ়ভাবে ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে জীবনযাপন করে, আর একটি গোষ্ঠী স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়েও তাদের ইহুদী পরিচয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়নি। পরে ভারতে ইহুদীদের বাসস্থান হিসেবে কোচিন সবচাইতে বেশি বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং বর্তমানে কোচিনের সিনাগগ-ই ভারত-বর্ষে ইহুদীদের বৃহত্তম ধর্ম মন্দির। ষোড়শ শতাব্দী থেকে কোচিনে ইহুদীদের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। স্পেন ও পর্তুগালে অখ্রীস্টান বিতাড়নের পর্বে ইহুদীদের একটা বড়ো দল কোচিনে এসে আশ্রয় নেয় এবং রাতারাতি কোচিন পরিণত হয় ভারত-ভূখণ্ডে ইহুদীদের বৃহত্তম বাসস্থানে। পোর্তুগিজ-দের মালাবার উপকূলে পদার্পণের পরে এই ইহুদীদের অস্তিত্ব সাময়িক ভাবে বিপন্ন হয়, কিন্তু অচিরে পোর্তুগিজ শক্তির কেন্দ্র কোচিন থেকে স্থানান্তরিত হয় গোয়াতে এবং তখন থেকে কোচিনের রাজা আবার ইহুদী ও মুসলমান উভয়ের প্রতিই স্বভাবজ উদার ব্যবহারে সমর্থ হন।

ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে পোর্তুগিজ বাহিনী ভারতবর্ষে অশান্তির হাওয়া বয়ে আনে। পোর্তুগিজরা ক্যাথলিক খ্রীস্টান। কিন্তু এই সশস্ত্র সহিংস খ্রীস্টীয় বাহিনীর এদেশে আসার অনেক আগেই প্রেম ও সাহসিকতার ধর্ম হিসেবে এদেশে খ্রীস্টধর্মকে নিয়ে আসেন সন্ত টোমাস। কোডুঙ্গল্লুর অভিমুখী

এক বাণিজ্য জাহাজে চড়ে তিনি মালায়নকারতে এসে পৌছন ৫১ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ইহুদীদের আসার আগেই। আর তখন পর্যন্ত তো মহম্মদের জন্মই হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যে কেরালার দক্ষিণ অঞ্চলে তিনি জনসাধারণের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করেন এবং বিভিন্ন স্থানে একাধিক গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ব্রতই ছিল ধর্ম প্রচার করা এবং ভারতবর্ষে খ্রীস্টান ধর্মের প্রথম প্রচারক হিসেবে তাঁর নাম অমর হয়ে গেছে। ৫৯ খ্রীস্টাব্দে মায়লাপুরে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়— সম্ভবত স্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দু অধিবাসীরাই তাঁকে ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে হত্যা করে। তারপর বহুকাল ভারতবর্ষে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায় না। আবার ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে গোলমরিচ ব্যবসায়ের আকর্ষণে ভাস্কো ডা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে কোঝিকোড বা খাজিকোড বা বর্তমান কালিকটে পৌছন। কালিকটের রাজাকে বলা হতো জামোরিন। গোল-মরিচের ক্রেতা হিসেবে জামোরিন পোর্তুগিজদের প্রথমে স্বাগতই জানান।

কিন্তু পোর্তুগিজদের প্রতি জামোরিনের সদয় ব্যবহারে যারা শঙ্কিত হলো তারা মুসলিম ব্যবসায়ী। শঙ্কার কারণ এই নয় যে পোর্তুগিজরা ভারতবর্ষে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করলে ইসলাম ধর্ম কোণঠাসা হয়ে যাবে। এই মুসলিম তথা আরব বণিকরা জামোরিনকে যা-যা বলেছিল তার সোজা কথাটা পরবর্তী-কালে ভয়ঙ্কর সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এই আরব বণিকরা বলেছিল যে, ইয়োরোপীয়দের মতো সমৃদ্ধ জাতির এই সুদূর প্রাচ্যে আসার মূল কারণ শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য হতে পারে না, এখন এরা দেখেশুনে যাচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে এদেশ লুট করতে ও অস্ত্রের জোরে জয় করতে পারে। আরব বণিকদের কথা জামোরিন শেষে বিশ্বাস করেছিলেন এবং এমন হুকুমও দিয়েছিলেন যে 'পোর্তু-গিজদের আটক করে রাখা হোক। এই অবস্থাতে প্রধান ব্রাহ্মণ (এখানে 'ব্রাহ্মণ' বলতে সম্ভবত 'পুরোহিত' বোঝানো হয়েছে) হস্তক্ষেপ ও কণ্ঠক্ষেপ করেন, তার ফলে এদেশ সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে ১৪৯৮-এর ২৯শে আগস্ট ভাস্কো ডা গামা স্বদেশ অভিমুখে রওনা হতে পারলেন। এর পরবর্তী পোর্তুগিজ অভিযানের নেতা পেড্রো আলভারেজ কাব্রাল ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর কালিকটে পৌছন এবং কালিকটে প্রথম ইয়োরোপীয় কুঠি স্থাপন করেন। কুঠি স্থাপনের পরে স্বভাবতই কাব্রালের স্পর্ধা ও শক্তি বেড়ে গেল। আরব বণিকদের একটি জাহাজ বন্দরে বোঝাই হচ্ছে দেখে কাব্রাল সেটি দখল করেন। প্রত্যুত্তরে আরব বণিকরা কালিকটে সদ্যনির্মিত পোর্তুগিজ কুঠিটি আক্রমণ করল এবং কুঠির অধ্যক্ষ আয়রেস কোরীয়াকে হত্যা করল।

এই ঘটনাতে কাব্রাল ক্ষিপ্ত হয়ে জাহাজ থেকে দুদিন ধরে কালিকটের উপর গোলাবর্ষণ করে কোচিনে চলে এলেন। কোচিন-রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁকে কালিকটেরও রাজা বানিয়ে দেবেন। পাছে আরবরা এখানেও পোর্তুগিজদের উপর আক্রমণ করে তাই কোচিনের রাজা পোর্তুগিজ কুঠি রক্ষার জন্য উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থাও করলেন। ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর ভিত্তিতে কাব্রাল এক বিশদ পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন পোর্তুগিজ রাজার কাছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে—শুধু ভারতীয় বাণিজ্যকে নিজেদের হাতের মুঠোতে আনার জন্যে নয়, ভারতবর্ষে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যেও—ভাস্কো ডা গামা ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে আবার ভারতবর্ষে এলেন। পথে গোয়ার দক্ষিণে ভাস্কো ডা গামার নৌবহর কী করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ একজন ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকের রচনা থেকেই উদ্ধার করা উচিত: "A rich Muslim pilgrim vessel on its way to India from the Red Sea was intercepted by da Gama's fleet, plundered and sunk ; there were many women and children on board ; but to these no mercy was shown ; and we actually read that da Gama watched the horrors of the scene through a porthole, merciless and unmoved." কালিকটে পৌঁছে ভাস্কো ডা গামা রাজ্যের সমস্ত মুসলিমের বহিষ্কার দাবি করলেন। স্বভাবতই এরকম অদ্ভুত দাবির কাছে জামোরিন নতি স্বীকার করেননি, ফলে ভাস্কো ডা গামার হিংস্র আক্রোশ এসে পড়ল কালিকটের উপর, জাহাজ থেকে তিনি সারাদিন গোলা বর্ষণ করে শহরের যতখানি ক্ষতি করা সম্ভব করে চলে গেলেন।

যাওয়ার পথে তিনি দেখলেন আরব বণিকদের দুটি বাণিজ্য জাহাজ। প্রথমে ভাস্কো ডা গামা জাহাজ দুটো লুট করলেন, তারপর "ordered his men to cut off the hands and ears and noses of all the crews. This done, their feet were tied together, and in order to prevent them from untying the cords with their teeth, he ordered his men to strike them on their mouths with staves and knock their teeth down their throats. They were then put on board, to the number of about 800, heaped one on the top of the other, and covered with mats and dry leaves ; the sails were then set for the shore and the vessel set on

fire." পোর্তুগিজদের এরকম আচরণে স্বভাবতই জামোরিন সন্ত্রস্ত হলেন এবং ব্রাহ্মণকে (পুরোহিতকে ?) পাঠালেন পোর্তুগিজদের শান্ত করার জন্যে, কেননা ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো ডা গামার প্রতি প্রীতি ও পক্ষপাত এই ব্রাহ্মণই প্রদর্শন করেছিলেন আর তার ফলেই পোর্তুগিজরা নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিল। এবার সেই ব্রাহ্মণের হাত ও কান কেটে সুন্দর মোড়কে পাঠানো হলো জামোরিনকে, সঙ্গের চিঠিতে ভাস্কো ডা গামা ছিন্ন অঙ্গগুলো রান্না করে জামোরিনকে খাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে এবার ভাস্কো ডা গামা শুধু বাণিজ্যে নয়, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে-ও এসেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সন্ত্রাসই হলো এদেশে খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারের শ্রেষ্ঠ উপায়।

শুধু অস্ত্রের শক্তি নয়, পোর্তুগিজরা বুদ্ধির শক্তিও প্রয়োগ করল। কোচিনের রাজাকে কালিকটেরও রাজা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কাব্রাল কী ভাবে কোচিনের রাজাকে বশ করেছিলেন সেকথা একটু আগেই বলেছি। শুধু কোচিনের রাজাকে নয়, কাব্রাল কান্নানোর আর কুইলনের রাজাদেরও মস্ত বড়ো বড়ো রাজা করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে হাত করেছিলেন। উত্তরে চিরাক্কল রাজা আর দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর রাজার সঙ্গে এইসব বন্দোবস্তের ফল হলো মালাবার উপকূলের রাজারা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে লাগল। নিজেরা হলো নিজেদের শত্রু আর পোর্তুগিজরা হলো সকলেরই মিত্র। এই রাজারা যখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে করে শক্তিক্ষয় করছে তখন সেই সুযোগে পোর্তুগিজরা আস্তে আস্তে এদেশে রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে থাকে এবং ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম ইয়োরোপীয় ঘাঁটি হিসেবে কোচিনে একটি দুর্গ ও একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করে। তাদের প্রথম ভাইসরয় হলেন ফ্রানচিসকো দ' অলমেইডা। ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অ্যাফোনসো দ' অলবুক্যুরক এবং তাঁকে প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হলো কালিকট ধ্বংস করার। কোচিনের রাজার গুপ্তচররা পাকা খবর নিয়ে এল কখন জামোরিন রাজধানীর বাইরে থাকবেন। সেই অনুসারে কালিকট ধ্বংস করতে পোর্তুগিজরা কালিকটে পৌঁছল ১৫১০-এর ৩রা জানুয়ারী। প্রথমে লুটপাট শুরু হলো। তার পরে শহরবাসীরা রুখে দাঁড়াল এবং প্রধানত আরব বণিক ও মোপলাদের বীরত্বের ফলেই পোর্তুগিজদের পালিয়ে আসতে হলো।

পোর্তুগিজরা ইতিমধ্যে অনুধাবন করে ফেলে যে মালাবার উপকূল থেকে আরব বণিকদের হটাতে না পারলে এদেশে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার করা খুবই

কঠিন; কালিকট রক্ষার ঘটনা থেকে এটাও পরিষ্কার হলো, এই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের মস্ত বড়ো বল-ভরসা এবং তাদের আগে জব্দ করতে পারলে এদেশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হবে। কালিকট থেকে বিতাড়িত হয়ে পোর্তুগিজরা ৪ঠা মার্চ অতর্কিতে আক্রমণ করল বিজাপুর সুলতানের রাজত্বের একটা শহর, সেই শহরটার নাম গোয়া। এক বছরের মধ্যে দুর্গ-গির্জা বানিয়ে অলবুকুয়েরক গোয়াকে বানিয়ে ফেললেন ভারতবর্ষে পোর্তুগিজ শক্তির প্রধান কেন্দ্র—গোয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে আরব বণিকদের প্রতি বাড়ালেন বন্ধুত্বের হাত আর রাজনৈতিক নিশ্চয়তার জন্যে হিন্দুদের নিয়োগ করলেন বড়ো বড়ো সব সরকারী পদে, তদুপরি পোর্তুগিজদের সঙ্গে ব্যাপক হারে হিন্দুদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন এবং এইভাবে স্থানীয় জনসাধারণ থেকে একটা বড়ো অংশকে পোর্তুগিজ পক্ষভুক্ত করে ফেললেন। কিন্তু পোর্তুগিজ ভারতবর্ষ বলে যদি কোনও রাজনৈতিক অভিব্যক্তির কল্পনা করা যায় তাহলে তার রাজধানী ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোচিনেই ছিল—কোচিন থেকে ওই রাজধানী স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে অলবুকুয়েরক তাঁর অধস্তন পোর্তুগিজ কর্মীদের কাছ থেকেই বাধা পেয়েছিলেন। এই কোচিনেই ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে ভাস্কো ডা গামার মৃত্যু হয়।

তবে মালাবার উপকূলে পাশ্চাত্য শক্তি প্রতিষ্ঠার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এখানে কী ভাবে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করা হয়েছিল এবং কেনই বা এখানে খ্রীস্টানদের সংখ্যা অদ্যাবধি মুসলমানদের চাইতে বেশি।

পোর্তুগিজদের দেখাদেখি ওলন্দাজ ইংরেজ ও ফরাসীরাও মালাবার উপকূলে এসে জুটল এবং এদের বাণিজ্যনীতির অন্যতম অঙ্গ ছিল প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে সম্ভবপর সমস্ত পথে—কোথাও ধর্মীয় বিভেদের পথে, কোথাও অর্থনৈতিক, কোথাও রাজনৈতিক প্রলোভনের পথে, কোথাও আরব মিশরী ভারতীয় প্রভৃতি জাতিগত বিভেদের পথে—বিরোধ ঘটানো, অনৈক্য ঘটানো ও পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উত্তেজিত করা। সুতরাং মালাবার উপকূলবর্তী আরব সাগরে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ও এশীয় রাজাদের মধ্যে সারাক্ষণ যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত।

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শক্তির প্রথম প্রবেশ ঘটে আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে। তবে তিনি কোনও বিশেষ ধর্মমত নিয়ে আসেননি বা এদেশে কোনও ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেননি। তাঁর পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাশ্চাত্য শক্তির প্রকাশ ঘটে ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে এবং এই প্রকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটাও

স্পষ্ট বোঝা যায় যে পাশ্চাত্য শক্তি ও খ্রীস্টান ধর্ম কী ভাবে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হয়েছিল। পরে অবশ্য ইংরেজরা খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পোর্তুগিজ কৌশল পরিত্যাগ করে এবং অনগ্রসর সমাজের উন্নতি ও সেবাতে খ্রীস্টধর্মের প্রচারকরা আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তবুও তুলনামূলক ভাবে বিচার করা যেতে পারে যে খ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম দুটোই যেখানে বিদেশোদ্ভূত ধর্ম সেখানে কোন্ ধর্ম কোন্ উপায়ে কেরলে প্রচার করা হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে মালাবার উপকূলে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির আগে থেকেই আরব বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা তারা বিশেষ জরুরি মনে করত এবং দেশের শাসক-দের এব্যাপারে সাহায্য করত। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আরব বণিকদের অসদ্ভাবের কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না—এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে নিতান্ত বাস্তব কারণেই উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল। পরে এই আরবরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন থেকে তারা পরিচিত হয় মুসলমান বলে। বণিকদের আগ্রহের বস্তু ছিল বাণিজ্য এবং তারা ধর্ম নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাত না। তবু কী করে শ্রমজীবী স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম সাদরে গৃহীত হয় সেকথা একটু পরে বলব। তার আগে সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির চিত্র সম্বন্ধে একটু ধারণা নেওয়া যাক।

দক্ষিণ-ভারত মূলত দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দেশ। কিন্তু আর্য বা সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে এই দ্রাবিড় দেশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। তার আগে এখানে যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মই জনপ্রিয় ছিল সেকথা আগেই বলেছি। ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা-সংস্কৃতির বিজয়া-ভিযানের মুখে জৈন ও বৌদ্ধরা পিছু হটতে শুরু করে—মাদুরাই, কাঞ্চী প্রভৃতি অল্প কিছু বড়ো জায়গার কাছাকাছি জৈন মঠ থাকলেও অধিকাংশ জৈনরা পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে গুহার ভিতরে আত্মগোপন করে—এই গুহাগুলোর মধ্যে বোধকরি পুডুককোট্টাই-এর সিত্তননবসল গুহাটি সবচাইতে বিখ্যাত। বৌদ্ধরা আশ্রয় নিল কৃষ্ণা ও গোদাবরীর উপত্যকাতে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বোধকরি কোনও সময়েই দ্রাবিড়ীয় জনসাধারণের প্রাণের ধর্ম বা আত্মার বস্তু হয়নি, তা উচ্চবর্ণের ও উচ্চ শ্রেণীর আত্মাভিমান ও উচ্চমন্যতার দ্যোতক হয়েই থেকেছে। তাই জনসাধারণের আত্মার বস্তু হিসেবে দক্ষিণ ভারতেই ভক্তিবাদের জন্ম হয় এবং এককালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম জনসাধারণের জীবনে যে স্থান নিয়েছিল পরে ভক্তিবাদ সেই স্থান-ই নেয়।

কিন্তু দক্ষিণ ভারত এক বিরাট ভূভাগ। সমগ্র দক্ষিণ ভারত থেকে দৃষ্টিকে সংকুচিত করে মালাবার উপকূলের উপর স্থাপন করলে কী দেখতে পাব?

বহু শতাব্দী ধরে এ কাহিনী চলে আসছে যে মালাবার রাজাদের মধ্যে চেরমান পেরুমলই প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কেরলের পেরুমল বংশের শেষ রাজা। তাঁর অনুরোধে আরব থেকে মালিক ইবন দিনর কুড়ি জন সহচর নিয়ে কেরলে আসেন ইসলাম সম্বন্ধে রাজাকে জ্ঞান দিতে। এতে বোঝা যায়, ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়ার মতো জ্ঞানী আরব বণিকদের মধ্যে ছিল না অথবা আরব বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের বাইরে অন্য কোনও ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। শুধু নিজে ধর্মান্তরিত হয়েই চেরমান পেরুমল ক্ষান্ত হননি, প্রজাদের মধ্যেও ইসলাম প্রচারে তিনি সচেষ্ট হন। মৃত্যুর আগে তিনি নাকি মক্কাতে চলে যান সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের বাসনায়। তাঁর রাজত্ব পরিত্যাগের পরে কেরল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং রাজ্যগুলির মধ্যে কালিকটই ছিল প্রধান. কালিকটের পরে ছিল কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, কুইলন প্রভৃতির স্থান। কালিকটের রাজারা পরিচিত হন জামোরিন নামে। জামোরিনদের উৎস সম্বন্ধে কথিত আছে যে এই বংশের ধারা নেমে এসেছে চেরমান পেরুমলের ছেলে মনবিক্রমন ও নেদিয়ুইরূপ্পু অঞ্চলের ইরাডিস নামে বিখ্যাত নায়ার পরিবারের কন্যা থেকে। নায়ারদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বিধি অনুসারে চেরমান পেরুমলের পুত্র পিতার সিংহাসনে বসতে পারেনি, আবার এ-ও হতে পারে যে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে নায়ার সমাজ তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসতে দেয়নি। যাহোক, পুত্রের প্রতি বিশেষ স্নেহের নিদর্শন হিসেবে চেরমান পেরুমল মক্কা যাওয়ার আগে নাকি মনবিক্রমনকে একটা তরবারী ও এক খণ্ড জমি উপহার দেন এবং পরে সেই জমিতেই কালিকট বন্দর গড়ে ওঠে।

কেরলের নিজস্ব সাল গণনার প্রথা মালয়ালাম বা কোল্লাম অব্দের সূচনা নাকি চেরমান পেরুমলের ৮২৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে মক্কা যাত্রার দিনটি থেকে চলে আসছে। অবশ্য কারও কারও মতে কোল্লাম আসলে কুইলন প্রতিষ্ঠার দিন থেকে প্রচলিত, কিন্তু সেকালে কুইলনের মতো একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ শহর প্রতিষ্ঠা থেকে কেন মালয়ালাম অব্দ গণনা করা হবে তা বোঝা মুশকিল। চেরমান পেরুমলের মক্কা যাত্রার দিন থেকেই কোল্লাম অব্দের গণনা অধিক যুক্তি সঙ্গত। তবে তাঁর পরে যে কেরালা খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় সেটা ঠিক। যতদিন বেঁচে ছিলেন বিদেশ থেকে কেরালার

বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের ও শাসকদের কাছে মুসলিম সাধুদের প্রতি নানারকম সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিতেন।

চেরমান পেরুমলের রাজত্ব ত্যাগ করে মক্কা যাওয়ার ঘটনাটি আরও এক কারণে যথার্থ বলে মনে হয়। এই কারণটি হলো কালিকটের জামোরিন এবং ত্রিবাঙ্কুরের রাজার অভিষেক প্রথা। জামোরিনকে আরব মুসলমানদের ঢঙে দাড়ি কামিয়ে, মুসলমানা পোশাক পরিয়ে একজন মোইপিলাহ বা মোপলা মুকুট পরাত এবং আসল রাজা বিদেশ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করার শর্তে জামোরিন সিংহাসনে বসত। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা অভিষেকের সময় ঘোষণা করত, "যিনি মক্কা গেছেন তিনি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমি এই তরবারীর মর্যাদা রক্ষা করব।" হয়তো মনবিক্রমনের মতো আর কাউকে আর একটা তরবারী দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই ব্যক্তির থেকেই নেমে এসেছিল ত্রিবাঙ্কুর রাজাদের বংশ; আবার এ-ও হতে পারে যে মনবিক্রমনের সন্তান কালিকটের সিংহাসনে বসতে পারেনি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আইনের জন্যে এবং সেই সন্তানকে তিনি চেরমান পেরুমলের কাছ থেকে পাওয়া তরবারী ও এক খণ্ড জমি উপহার দিয়েছিলেন, পরে যে জমি ত্রিবাঙ্কুর হিসেবে পরিচিত হয়। তবে যেদিক থেকেই দেখা হোক-না কেন, একজন দক্ষিণ ভারতীয় রাজা অন্তরের আকর্ষণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন এবং তার প্রচারের জন্যে বিদেশে গিয়ে চেষ্টা করছেন, এই ব্যাপারটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বহু পুরুষ বাহিত ধর্ম ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় উদ্দীপ্ত চিত্তে শাসকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন এ রকম নজির ভারতবর্ষের অন্যত্র বিরল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশই তুঘলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু সমগ্র পশ্চিম ঘাট অঞ্চল এই সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে যায়। অঞ্চলটি তখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত এবং অধিকাংশ রাজ্যই হিন্দু রাজাদের শাসনাধীন ছিল। বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালাবার অঞ্চলে বারোটি রাজ্যের কথা বলেছেন, কোন কোন রাজা ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিকারী, তবু তারা শান্তিতে বসবাস করত। রাজারা যে সাধারণত নায়ার বংশের সেটা ইবন বতুতার একটা মন্তব্য থেকে বোঝা যায়—তিনি লিখেছেন যে এই রাজারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে বাদ দিয়ে রাজত্ব দিয়ে যায় ভগ্নীর সন্তান-সন্ততিকে। আর একটা উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ এই যে রাজারা হিন্দু হলেও প্রত্যেক রাজত্বেই মুসলিম সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, তারা স্থানীয় রাজার কাছ থেকে সর্বদাই

-ন্যায় বিচার ও আপন ইষ্টের প্রার্থনাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেত। ফাকনর বলে দক্ষিণ কানাড়ার একটা রাজত্বে রাজার ত্রিশটি যুদ্ধ জাহাজের নেতা ছিলেন একজন মুসলমান নৌসেনাপতি। কুইলনের হিন্দু রাজার অধীনে তিনি মুসলমানদের খুব শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন বসতি দেখেছিলেন—তাদের নিজেদের সেনাপতি ও বিচারপতি ছিল। কুইলনের রাজা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করতেন সেকথাও তিনি জানিয়েছেন।

ইবন বতুতা মোট ছ'বার কালিকটে এসেছিলেন এবং প্রথমবার প্রায় তিন মাস এখানে ছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানতে পাই যে কালিকট সেকালের প্রধান বন্দরগুলোর অন্যতম এবং সেখানে চীন-সুমাত্রা-সিংহল-মালয়দ্বীপপুঞ্জ-ইয়েমেন-ফারস প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরাও বাস করত। কালিকটের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধির কারণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য—তবে এই ব্যবসা পরিচালিত হতো ইসলাম ধর্মাবলম্বী বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা এবং তাদের অধিকাংশই ছিল আরব দেশীয়। কালিকটে বণিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন ইব্রাহিম নামে বহরেন থেকে আগত একজন ব্যবসায়ী, তাঁকে বলা হতো 'শাহ্ বন্দর'—সম্ভবত তিনি বন্দরের কর বিভাগের অধ্যক্ষ বা মুখ্য কর্মকর্তা ছিলেন। কালিকটের প্রধান বিচারপতিও একজন মুসলমান ছিলেন। মিসকাল নামে আর একজন মুসলমানের কথা ইবন বতুতা লিখেছেন—চীন থেকে ভারতবর্ষ ঘুরে ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলোতে বাণিজ্য করার জন্যে তাঁর প্রচুর জাহাজ ছিল এবং তিনি ছিলেন বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক। কালিকটের রাজত্বে শুধু ব্যবসাবাণিজ্য নয়, সেখানকার রাজনীতি ও সামরিক শক্তি বহুলাংশে মুসলমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মুসলমানদের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা দিলেও জামোরিন গো-হত্যা ও গো-মাংস ভক্ষণ রাজত্বের মধ্যে নিষিদ্ধ করেছিলেন। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং উচ্চাঙ্গের প্রশাসন কালিকটকে পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরগুলোর অন্যতমতে পরিণত করেছিল।

কিন্তু এ তো গেল কেরলের একটি দিকের চিত্র। কেরলের আর একটা দিকের চিত্র আবার অত্যন্ত মর্মন্তুদ। এই বিপরীত চিত্রটিতে দেখি ব্রাহ্মণ্য উচ্চমন্যতা কেরলে একটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। কেরলে ব্রাহ্মণদের উচ্চমন্যতা কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল তা সাধারণ বাঙালীর পক্ষে কেন, স্বামী বিবেকানন্দের মতো অসাধারণ বাঙালীর পক্ষেও অকল্পনীয়। জাতি অনুসারে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও তজ্জনিত ঘৃণার বিষে জর্জরিত কেরলকে বিবেকানন্দ তুলনা করেছেন পাগলা গারদের সঙ্গে।

কেরালা হিষ্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক পি. এস. বেলায়ুধন 'Cultural Renaissance in Modern Kerala' প্রবন্ধে ওই রেনেশাঁসের ঠিক আগের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "The upper castes were exempt from the payment of land tax, while all kinds of oppressive taxes were levied from the lower castes. The members of the low castes had to pay a prescribed fee for the conduct of their marriages and house tax for their huts. Taxes had also to be paid for maintaining looms, oilmills, boats, nets etc.······To secure immediate recognition of such classes they were required to be uncovered above the waist ; shoes, umbrellas, fine clothes, and costly ornaments were interdicted to them. The holding of umbrellas was prohibited to all castes except Brahmins on public occasions, though the rains were pouring upon them. The proper salutation from a female to persons of rank was to uncover the bosom." কোন কোন মুসলিম শাসক অন্য ধর্মাবলম্বী প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার বিনিময়ে জিম্মি কর আদায় করত, কিন্তু কারও কোনও রক্ষণাবেক্ষণ না করে শুধু উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণের সুযোগ নিয়ে মানুষকে দোহন ও শোষণের এমন দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলেই কম বেশী পাওয়া যায়। জন্মের উপর মানুষের হাত নেই, কিন্তু উচ্চবর্ণে জন্ম নিলেই ভারতবর্ষের মানুষ সমস্ত রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার অধিকারী হয়ে থাকে এবং এই ব্যাপারটা কেরালায় চরমে পৌছয়।

আরব বণিকরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং সেই ইসলামকে কেরালায় নিয়ে আসে, কেরালাস্থিত তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে ইসলাম প্রচার করে তখন এই বণিকদের স্থানীয় কর্মচারীরাও, যাদের একটা বড়ো অংশ বণিকদের জন্যে কায়িক শ্রম করত, ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও বক্তব্য সম্বন্ধে জানতে পায়। তারা জানতে পায় এমন এক শাস্ত্রের কথা যাতে বলা হয়েছে, মানুষকে আলাদা আলাদা জাতিতে জন্ম দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু জন্ম দিয়ে নয়, মানুষের বিচার হয় তার স্বভাব-চরিত্র দিয়ে (৪৯, ১৩-১৫)। বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত কেরালার জনসাধারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে মানুষ হিসেবে বাঁচার ডাক শুনতে পেল। এই ডাক তাদের কাছে একেবারে অচেনা নয়, বৌদ্ধ ধর্ম যখন কেরালায় সুপ্রতিষ্ঠ ছিল তখন তারা এই ডাক শুনেছিল, তখন তারা

মানুষের মতো বাঁচত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন সূচিত হয় এবং পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ বৌদ্ধধর্মকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মই সর্ব শক্তিমান হয়ে ওঠে ও সমাজের সর্বস্তরে তার কঠোর বিধান-শাসনকে অমোঘ রূপে প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে অপমান, ঘৃণা, পীড়ন ও শোষণ করার সামাজিক সমর্থন—প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগামিতা ও উদারতা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিচিত্রতর প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সঙ্কীর্ণতা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্নিহিত বিরোধ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যবহারিক দিকগুলোর চাপে কেরালার জনসাধারণ যখন মানুষ হিসেবে নিজেদের পরিচয় ভুলতে বসেছে তখন ইসলাম ধর্মের আগমন ও আহ্বান। এই আহ্বানে তারা প্রচণ্ড উৎসাহে সাড়া দিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। 'তুহফৎ-উল-মুজাহিদ্দীন'-এর লেখক জৈনুদ্দিন লিখেছেন, 'যদি কোনও হিন্দু মুসলমান হতো তাহলে অন্যেরা তাকে এই (নিম্নবর্ণে জন্মের) কারণে ঘৃণা করত না, অন্য মুসলিমদের সঙ্গে যে রকম বন্ধুত্ব নিয়ে মিশত, তার সঙ্গেও সেভাবেই মিশত।' মানুষের মূল্য পাবে, সমাজে মানুষের মতো ব্যবহার পাবে—এটা ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রধান কারণ।

ইসলাম গ্রহণের জন্যে জন সাধারণের মধ্যে যে বিপুল উন্মাদনা জাগল তাকে বাগ মানাবার বা নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা সাধারণ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের ছিল না। পরবর্তীকালে অনুরূপ পরিস্থিতি বাংলাতেও দেখা দেয় এবং তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হয়—তিনি দেশজ ধর্মকে এতটা বিস্তৃত করেন যে ইসলাম গ্রহণের অনেক প্রয়োজনীয়তাই তাতে মিটে যায়, ফলে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের জন্যে প্রবল উন্মাদনায় অন্তত তিন শতাব্দীর জন্যে ভাঁটা পড়ে। কেরালায় যখন জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের আকর্ষণ প্রচণ্ড রূপ নেয় তখন সেই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যেই বোধ করি শ্রীশঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সমাজে যেমন ইসলাম ধর্মাবলম্বী সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় তেমনই শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদেও ইসলাম ধর্মের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়—এটা হলো অদ্বিতীয় ও এক ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ইসলাম ধর্ম কেরালায় বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল এবং তাঁর মতো তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে ইসলামের মর্মকথা না জানাটাই ছিল অস্বাভাবিক। অর্থাৎ মেনে নেওয়াই ভালো যে শঙ্করাচার্য

ইসলাম ধর্মের ভিত্তি ও বিস্তারিত বক্তব্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। আরবদের মধ্যে পূর্ব প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর থেকে মহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের মৌল বিচ্ছেদ ঘটে একেশ্বরবাদ নিয়ে। জন্মস্থানের ভৌগোলিক অভিব্যক্তিতে ইসলামের প্রথম অভিনবত্বই হলো তার একেশ্বরবাদ। সনাতন ভারতীয় দর্শনে একেশ্বরবাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব তত্ত্ব নয়, কিন্তু আচার-আশ্রিত এবং ঐতিহ্য-বাহিত ভারতীয় ধর্মমতগুলোতে ওই একেশ্বরবাদের স্থান শঙ্করাচার্যের আগে খুবই সংকীর্ণ ছিল। বহু দেবদেবীর পূজা মিথ্যা এবং ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় একথাটা সমগ্র ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শঙ্করাচার্য যেমন অমোঘ রূপে ঘোষণা করেন তেমনটি তাঁর আগে বা পরে আর কেউ করেন নি। তাঁর ওই আপোসহীন একেশ্বরবাদ ইসলাম ধর্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় একথা আরও বহু ধর্মে বলা হয়ে থাকলেও সেসব ধর্মের ঘোষণা নিয়ে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে, কিন্তু ইসলামের একেশ্বরবাদ আর শঙ্করাচার্যের একেশ্বরবাদ এমন একাগ্র ও স্পষ্ট যে তাকে ব্যাখ্যার নামে বাক্যজালে আবৃত বা জটিল করার কোনও সুযোগই নেই। শঙ্করাচার্য ওই সুনিশ্চিত একেশ্বরবাদ পেলেন কোথা থেকে? সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় যে এই সরল ও সুদৃঢ় একেশ্বরবাদ শঙ্করাচার্য ইসলাম ধর্ম থেকেই পেয়েছিলেন। একথা সত্য যে, শঙ্করাচার্য অদ্বিতীয় অর্থবোধক ভাষাতেই বলেছেন, পরমার্থিক-দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবনের সাধনা করলে সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপী পরমব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়, তাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, আর এই নির্গুণ ব্রহ্মের কোনও কল্পনা বা অনুব্যবসায় ইসলাম ধর্ম বা দর্শনের কোনখানেই নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না শঙ্করাচার্য একই সঙ্গে ব্যবহারিক-দৃষ্টির কথাও বলেছেন এবং ব্যবহারিক-দৃষ্টিতে ঈশ্বর আসলে নানারূপ গুণসম্পন্ন আত্মা বা সত্তা অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম এবং তিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। শঙ্করাচার্য কথিত ঈশ্বরের সঙ্গে ইসলামে বর্ণিত আল্লাহ্‌র ভেদ নেই, অন্তর্নিহিত সত্যে উভয়ই এক। এইসব কারণেই 'ইনফ্লুয়েন্স অফ ইসলাম অন ইণ্ডিয়ন কালচার' গ্রন্থে ডাঃ তারাচাঁদ পরিষ্কার করে লিখেছেন, 'It may, therefore be premised without overstraining facts that, if in the development of Hindu religions in the South, any foreign elements are found which make their appearance after the 7th century and which cannot accounted for the natural development of Hinduism itself, they may with much probability be ascribed

to the influence of Islam.' এ নিয়ে গভীরভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধানের পর্যাপ্ত অবকাশ আছে, তবে ঐতিহাসিক সমীক্ষা ওই জাতীয় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিষয়ে কূট আলোচনার ক্ষেত্র নয়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই পরম সত্যের অভিব্যক্তি—শঙ্করাচার্যের এই অদ্বৈতবাদের একটি আনুষঙ্গিক তাৎপর্য হলো যে জাতি বর্ণ দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদ একটা অধ্যাস এবং এভাবে তাঁর অদ্বৈতবাদ সামাজিক স্তরে নিষ্ফল হলেও তাত্ত্বিক স্তরে উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের ভিত্তিকে তখনকার মতো শিথিল করে দেয়। কিন্তু তাঁর অদ্বৈতবাদ ও একেশ্বরবাদ দুটোই উচ্চতর মননের বিষয়, পরিণামে শঙ্করাচার্যের দর্শন বৃহত্তর জনসাধারণের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। সাময়িক ভাবে তিনি ইসলামের প্রসার শুধু কেরালায় নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেই প্রতিহত করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত তিনি আবার সেই সুবিধা-সন্ধানী চতুর উচ্চবর্ণের তত্ত্বব্যাখ্যাতাদেরই কুক্ষিগত হয়ে যান। এদিকে দেশের অপমানিত লাঞ্ছিত মানবতা আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় খোঁজে ইসলাম ধর্মের ছায়ায়। কিন্তু এইভাবে বৃহত্তর জনসাধারণের যে-অংশ ইসলাম ধর্ম নিল তারা সর্বান্তঃকরণে এই সদ্য-গৃহীত ধর্মের আদর্শ এবং আচার গ্রহণ করতে পারল না, তারা বহুক্ষেত্রেই নিজেদের পুরোনো ধর্ম ও সমাজের আচার-প্রথা, প্রত্যয়-সংস্কার এমন কি কুসংস্কারও সঙ্গে করে নিয়ে এল এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। যেমন বাংলার মুসলিমদের মধ্যে তেমনই কেরালার মুসলিমদের মধ্যেও বিবাহের বহু রকম আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্রে বিশ্বাস প্রভৃতি আছে যেগুলো কেরালার মুসলিমদের একেবারে নিজস্ব জিনিস এবং এগুলো প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মান্তরিত কেরালার আদি অধিবাসীদের অবদান। সুতরাং কেরালার সবটাই ইসলামের বিজয়াভিযানের কাহিনী নয়, এর অনেকখানি আবার নবীনের উপর প্রাচীনের প্রভাব বিস্তারের কাহিনীও বটে। পক্ষান্তরে ইসলামও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার আচার-প্রথা পরিবর্তনের সূচনা করে এবং এই পরিবর্তনের একটা বড়ো দিক হলো নিম্নবর্ণের নারীদের ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণের প্রথা। আগেই বলা হয়েছে যে নিম্নবর্ণের লোকদের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখতে হতো। এককালে কেরালাতে অমুকের স্ত্রী বা মেয়ে ইসলাম নিয়েছে বলার দরকারই হতো না, তার বদলে শুধু 'কুপ্‌পায়ামিডুক' শব্দটি ব্যবহার করা হতো— 'কুপ্‌পায়ামিডুক' শব্দটার অর্থ হলো 'গায়ে জামা চড়িয়েছে'। অপমান-সূচক বা হীনতা-দ্যোতক এরকম বহু আচার-প্রথা ইসলামের প্রভাবে কেরালার সমাজ থেকে দূরীভূত হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ফলে দাস প্রথাও

বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়—১৮৫৬-র লোকগণনায় মালাবারে পারিয়াদের সংখ্যা ছিল ১,৮৭,১৫৮ এবং ১৮৮১-র লোকগণনায় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৬৪, ২৫ অর্থাৎ পারিয়াদের সংখ্যা শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ হ্রাস পায়। মালাবারের স্পেশাল কমিশনার মিস্টার গ্র্যামে (Graeme) সংখ্যা হ্রাসের কারণ দেখতে পেয়েছেন পারিয়াদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে। এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে ওই ধর্মান্তরিত ব্যক্তি 'is no longer the degraded Pariah whose approach disgusted, and whose touch polluted the Hindu of caste, but belonging to a different scale of being, contact with him does not require the same ablutions to purify it.'

কেরলের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা বরাবরই ছিল। এই ভূমিকার মূলে অবশ্য ছিল অর্থনীতির সংগ্রাম বা বাজার নিয়ে লড়াই। প্রথম থেকেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্য আরব বণিকরা নিয়ন্ত্রণ করত। ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে আরব সাগরের বাণিজ্য-মঞ্চে পোর্তুগিজদের উদয় থেকেই ওই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিয়ে আরবদের সঙ্গে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর সংগ্রাম শুরু হয়। অবশেষে অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তিকে হটিয়ে বা হারিয়ে ইংরেজরা আরবদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আরবদের সঙ্গে জামোরিন ও স্থানীয় বণিকদের প্রাণপণ প্রতিরোধের ফলে ইয়োরোপীয় শক্তিগুলো আরব সাগরে সহজে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং এজন্যে ইয়োরোপীয়রা ইসলাম ধর্মাবলম্বী এইসব বণিকদের কোনদিন ক্ষমা করতে পারেনি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্যে ইউরোপীয় প্রভুত্বের প্রধান বাধাদানকারী-দেরকে ইয়োরোপীয়রা প্রথম থেকেই ধর্মান্ধতায় অভিযুক্ত করেছে। অর্থনৈতিক স্বার্থেই আরব বণিক আর খাজিকোডের জামোরিন রাজবংশ মোইপিলাহ্‌দের সাহায্যে ইউরোপীয়দের বাধা দেয়। কিন্তু বিরোধটা মূলত অর্থনীতি সংক্রান্ত ছিল একথা বললে ভারতীয় ও আরবদের সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধের কারণ আর খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী ইয়োরোপীয়দের যুদ্ধের কারণ একই কারণ হয়ে যায়, অর্থ-নৈতিক কারণে যুদ্ধ যদি অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে ইউরোপীয়রাও অন্যায়কারী বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। তাই নিজেদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখার জন্যে ভারতীয় ও আরবদের ওই সম্মিলনকে ধর্মান্ধতার ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে এবং যে অভিযোগের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো নিজেদের ইয়োরোপীয় সাধুতা প্রমাণ করা।

সাধারণভাবে যাদের আরব বণিক বলেছি তারা সকলেই যে আরব

বংশোদ্ভূত ছিল একথা ভাবা ভুল হবে। আরব বণিক গোষ্ঠী বলতে স্থানীয় জনসাধারণের যে অংশ আরবদের বাণিজ্যিক বিষয়ে জড়িত ছিল তাদের সবাইকেই বোঝানো উচিত। আরব বাণিজ্যে লিপ্ত স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল : আবার এদের সঙ্গে আরব শোণিতের সংমিশ্রণ-ও ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে আরব বণিকরা স্বদেশ থেকে দুর্ধর্ষ দুঃসাহসী বেপরোয়া সব তরুণদের নিয়ে আসত—তারা কখনও মাঝিমাল্লার কাজ করত, কখনও যণ্ডাযোদ্ধার কাজও করত—এবং তারা ক্রমে ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মিশে যায়। প্রথম থেকেই খাজিকোড বা বর্তমান কালিকটের রাজবংশ জামোরিনের সঙ্গে আরব বণিকদের সম্পর্ক মধুর ছিল এবং আরব বণিকদের সাহায্যেই জামোরিন মালাবারের সব চাইতে পরাক্রান্ত শক্তিতে পরিণত হয়। স্বভাবতই যে-মুসলমানরা জামোরিনের শক্তির উৎস ছিল তাদের খুব খাতির করা হতো ; শুধু জামোরিন নয়, মালাবারের অন্যান্য রাজারাও সামরিক শক্তি হিসেবে এই মুসলিম সৈনিকদের গুরুত্ব অনুভব করত। বাংলার বড়ো বড়ো ভূস্বামীরা যেমন এককালে পোর্তুগিজ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় বংশোদ্ভূত সেনাপতি ও সৈন্য পুষত তেমনই মালাবারের রাজারাও ইসলাম ধর্মাবলম্বী দুর্দান্ত জওয়ানদের পুষত এবং আপন আপন রাজ্যে তাদের বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দিত। বড়ো ছেলের মতো এদেরকে খাতির করা হতো বলে এদেরকে মইপিলাহ্ বা মহাপিলাহ্ বলা হতো, পরবর্তীকালে বড়ো ছেলে অর্থবোধক মইপিলাহ্ শব্দটা রূপান্তরিত হয় মোপলাতে। প্রকাশ থাকে যে ছেলে অর্থে পিলা শব্দের ব্যবহার বাংলাতেও সুপ্রচলিত। বরাবরই মোপলারা একটি ফৌজী সমাজ রূপে থেকেছে এবং কোনও বিদেশী আক্রমণকেই, বিশেষ করে যে-আক্রমণের কোনরকম অর্থনৈতিক তাৎপর্য থেকেছে সেরকম কোন আক্রমণকেই, মোপলারা বিনা বাধায় সফল হতে দেয়নি। মোপলারা প্রথম থেকেই মালাবার অঞ্চলে মানবিকতা ও স্বাধীনতার প্রহরী হিসেবেও থেকেছে এবং এতে সবচাইতে বেশি ক্ষুণ্ণ হয়েছে ইয়োরোপীয়দের অর্থনৈতিক স্বার্থ, তাই ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ও তাদের অনুসরণকারীরা বরাবরই মোপলাদের সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই সাম্প্রদায়িকতার বীজ সুপরিকল্পিতভাবে মোপলাদের মধ্যে বপন করা হয় ১৯২১-২২ খ্রীস্টাব্দে মোপলা বিদ্রোহের পরে। কিন্তু সে-ইতিহাস বর্ণনার স্থান এটা নয়। এখানে শুধু একথা বলাই যথেষ্ট যে রাজ্য জয়ের স্পৃহাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কোনও সশস্ত্র ও হিংস্র আক্রমণ ব্যতীতই

ভারতবর্ষের এই সুদূরতম অঞ্চলে ইসলাম একটা বিশেষ পরাক্রান্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। কেরালার প্রথম ঐতিহাসিক সাহিত্য 'তুহফৎউল-মুজাহিদ্দীন' পোর্তুগীজ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই রচিত হয়েছিল এবং এর থেকে কেরালার ইতিহাসে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সামগ্রিক ভূমিকা অনুধাবন করা সোজা হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কেরালাতে ইসলাম ধর্ম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি একটি মাত্র সরল রেখা অনুসরণ করে চলেনি। আরব বণিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগে থেকেই এখানে বসবাস করছিল এবং এরাই পরে কেরালাতে ইসলাম ধর্ম নিয়ে আসে। মুসলিম বণিক গোষ্ঠী দেশের অর্থনীতিতে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং এই বণিকরা দেশের উচ্চশ্রেণীর শামিল থেকেছে। এখানকার কোন কোন রাজবংশ ইসলাম ধর্মের আদর্শে প্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং ইসলামের প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে—এই বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের অন্য কোনখানের ইতিহাসে দেখা যায় না। বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত নিম্নবর্ণের লোকেরা মানুষের মর্যাদা পাওয়ার জন্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কোন কোন রাজা নিজেদের সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলিম ফৌজ পোষণ করেছে এবং এই মুসলিমদের বিদেশী শোণিত আস্তে আস্তে দেশের স্থানীয় অধিবাসীদের ধমনীতে মিশে গেছে। এইভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মালাবার উপকূলের জনসাধারণের মধ্যে শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নয়, একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবেও জাগ্রত হয়েছে এবং তদনুযায়ী ভূমিকা পালন করেছে। আরও একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষের অন্য বহু অঞ্চলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিদেশীরা যে-ধরনের যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত হয়েছে সে ধরনের যুদ্ধাভিযানের সঙ্গে মালাবার উপকূলের অধিবাসীরা পরিচিত নয়। অস্ত্রের সাহায্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়নি, অথচ কেরালার ৪,১৬২,৭১৮ জন মুসলমানের অধিকাংশই বহু পুরুষের মুসলমান।

এবার আমাদের সমীক্ষার ক্ষেত্রকে ভারতবর্ষের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে একেবারে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া যাক। বিশাল ভারতবর্ষের কেন্দ্র হিসেবে যে-অঞ্চল গণ্য হতে পারে এবং বিদেশীরা ভারত দর্শনের জন্যে যে-অঞ্চল কর্তৃক সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট হয় সেই রাজস্থানকে এই সমীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করাই উচিত।

কেরালাতে যে প্রক্রিয়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয় সে প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ভারতবর্ষের অন্যত্র হওয়া সম্ভব ছিল না, এবং ওই প্রক্রিয়ার মূলে ছিল কেরালার

বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থান। কোনও বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান তার ধর্মীয় ইতিহাসকে বহুল পরিমাণে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন কেরালা। আবার ভৌগোলিক অবস্থান হেতুই রাজপুতনার উপর দিয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অজস্র যুদ্ধাভিযান ঘটে গেছে। সম্ভবত এইসব যুদ্ধাভিযানের জন্যেই রাজপুতনার অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে একটা প্রতিরোধমূলক মনোভাব কাজ করেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কোন সময়েই রাজপুতনার ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বা সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়নি। বর্ণভেদ প্রথা কেরালার চাইতে রাজপুতনায় কম তীব্র নয়, তবু কোনও সময়েই এখানকার নিম্নবর্ণীয়রা ইসলামের মধ্যে মুক্তির আশ্বাস পায়নি এবং উচ্চবর্ণের আচরণের প্রতিক্রিয়াতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়নি। যাদের নিয়ে রাজপুতনার মুসলিম সমাজ গঠিত তারা যে শুধু সংখ্যাতেই নগণ্য তা-ই নয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যেও তারা নগণ্য। এই মুসলিম সমাজে মোটামুটি মাত্র তিনটি উপকরণ দেখা যায়—ভূস্বামী, কারিগর ও লোকসংগীতের শিল্পী। এখানে ইসলাম ধর্ম প্রসারের প্রক্রিয়াটিও বাংলা বা কেরালার চাইতে অনেক বেশি সরল—সামারিক শক্তি দিয়ে এখানেও ধর্ম প্রচার করা যায়নি, বরং চিশতী সম্প্রদায়ের সাধকরা জনসাধারণের মনে ইসলাম সম্বন্ধে যে-কৌতূহল-ও-শ্রদ্ধা জাগিয়েছিলেন তা সামরিক অভিযান-গুলোর ফলে বহুলাংশেই বিনষ্ট হয়। মুঘল আমলে আকবরের নীতির ফলে পুনরায় ওই কৌতূহল ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় মুখ্যত অভিজাত ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যে। যখন এই অভিজাত ভূস্বামীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করল তখন তাদের অনুগৃহীত ও পরিপোষিত কারিগর ও লোক সংগীত শিল্পীরাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

উদাহরণ হিসেবে লাঙ্গা মুসলিমদের কথা বলে চলে। রাজস্থানী লোক-সংগীতের প্রধান শিল্পীরা লাঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। এবং এরা রাজপুতনা বা রাজস্থানের পশ্চিমভাগে মরুভূমি অঞ্চলের অধিবাসী। লাঙ্গা মুসলিমদের পেশাই হলো সিন্ধী সিপাহীদের মনোরঞ্জন করা। তাছাড়া সিন্ধী সিপাহীদের পরিবারে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু ঘিরে যে সব অনুষ্ঠান হয় সেগুলো এই লাঙ্গাদের উপস্থিতি ছাড়া সম্পূর্ণ হতেই পারে না। অবস্থাপন্ন সিন্ধী সিপাহীদের পরিবারে দরিদ্র লাঙ্গা সংগীতশিল্পীরা সম্মানিত অতিথি এবং তাদের জন্যে সিন্ধী সিপাহীরা সবচাইতে ভালো খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা করে থাকে। বিবাহের সময় বরপক্ষ ও কনেপক্ষ উভয় পক্ষই লাঙ্গাদের আহ্বান জানায় এবং অনেক সময়

দু পক্ষের শিল্পীদের মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক প্রতিযোগিতা হয়। এই শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই—লাঙ্গাদের কাছে সংগীত হলো জীবিকা আর এই সংগীতের প্রধান গুণগ্রাহী হলো সিন্ধী সিপাহীরা।

সিন্ধী সিপাহীরা অবস্থাপন্ন হলেও রাজস্থানী সমাজের বিন্যাসে তাদের স্থান নিচের দিকে ছিল অর্থাৎ যখন তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে পরিচিত হতো তখন তাদের বর্ণ ছিল নিম্ন। তারা দলবদ্ধভাবে মরুভূমির মধ্যে ছোট ছোট বসতি গড়ে বাস করত এবং এই বসতিগুলোকে বলত ধাণী—সাধারণত এক-একটা ধাণীতে একটিমাত্র বর্ণ বা সম্প্রদায়ের লোক বাস করত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক কারণেই হোক কি ভৌগোলিক কারণেই হোক কি সামাজিক কারণেই হোক, এই সিন্ধী সিপাহীরা স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করত। এদের পেশা বা জীবিকা হলো পশুপালন। ধাণীর চারপাশের জমি এদের হেফাজতে থাকত আর তাই খুব ভালো বর্ষা হলে অর্থাৎ বছরে দু-তিন ইঞ্চি বৃষ্টি হলে এরা চাষবাষও করত। সিন্ধী সিপাহীরা কেন ও কী অবস্থায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তা সঠিকভাবে বলা যায় না, তবে এটুকু বলা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তারা হিন্দু ধর্মের আওতার থেকে বেরিয়ে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

গুণগ্রাহী ইসলাম গ্রহণের পরে গুণগৃহীতও ইসলাম গ্রহণ করে। বিখ্যাত লোক সংগীত শিল্পী নূরমহম্মদের বংশলতিকা থেকে বোঝা যায়, এই বংশ মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারা মাত্র ছ'পুরুষের মুসলমান। এই বংশের ঊর্ধ্বতন ষোড়শ পুরুষ দেবীদাস শুধু বিখ্যাত শিল্পীই ছিলেন না, অসামান্য যোদ্ধাও ছিলেন; কিংবদন্তী অনুসারে দেবীদাস কবন্ধ অবস্থাতেও সৈন্য নিধন করেছিলেন এবং কবন্ধ দেবীদাসকে নিরস্ত করা সকলের পক্ষেই একটা মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; তারপর থেকেই তারা যুদ্ধ করা একেবারে ছেড়ে দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ কল্যাণের পরে এই বংশ ইসলাম গ্রহণ করে, কেননা বংশলতিকায় দেখা যাচ্ছে যে কল্যাণের ছেলের নাম উম্মেদ, উম্মেদের ছেলের নাম আলী হয়ে গেছে। ইসলাম গ্রহণের পরে লাঙ্গারা সমস্ত মুসলমানী আদব কায়দা গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পূর্বতন অভ্যাস-প্রথাও কিছু কিছু থেকে যায়। উত্তর ভারতীয় মুসলিমরা সাধারণত ধুতি পরে না, তারা সেলাই-করা কাপড় পরে, কিন্তু লাঙ্গা মুসলমানেরা পুরোনো কেতাতে এখনও ধুতিই পরে—এটাকে হিন্দু কেতার অনুস্মৃতি বলা চলে। মেয়েরা সধবার লক্ষণ হিসেবে কব্জি থেকে কনুই এবং

কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত চূড়া বা বালা পরে, স্বামীর মৃত্যুর পরে চূড়া খুলে ফেলে—এটা বিশেষভাবে এই অঞ্চলের হিন্দু সধবাদের লক্ষণ। ইসলাম অনুমোদিত না হওয়া সত্বেও বাংলার গ্রামাঞ্চলে যেমন সিঁথিতে সিঁদুর পরিহিত মুসলিম সধবাদের দেখা যায় তেমনই লাঙ্গা সধবারা চূড়া পরে ; তবে সিঁদুর পরিহিত বাঙালী মুসলিম মহিলাদের চাইতে লাঙ্গা মুসলিম মহিলারা চূড়াকে একটা কঠোর দেশজ অনুশাসন হিসেবে মেনে চলে। নিম্নবর্ণের রাজস্থানী হিন্দুদের মধ্যে এমনিতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং এই দুটো প্রথা মেনে লাঙ্গারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করতে পারে না। রাজস্থানী হিন্দু সমাজে অনুমোদিত না হওয়া সত্বেও একই পরিবারের মধ্যে বিবাহ ইসলাম যতটা অনুমোদন করে ততটাই লাঙ্গারা পালন করে, তার বেশি কিছু করে না। এভাবে দেখা যায় লাঙ্গাদের মধ্যে একটা বিচিত্র সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ হয়েছে। এবং যেটা সবচাইতে বড়ো কথা, আজকের রাজস্থানী লোক সংস্কৃতির একটা প্রধান স্তম্ভই হলো এই ইসলাম ধর্মাবলম্বী লাঙ্গা সংগীতশিল্পীরা।

নবম পরিচ্ছেদ

[বাংলার জনসাধারণ—পলাশীর বিপর্যয় ও ইংরেজদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা—ইংরেজের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রথম অভ্যুত্থান—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নতুন জমিদার শ্রেণী—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচক রামমোহন—ওয়াহাবী ও ফরাজী আন্দোলনের শ্রেণিগত রূপ।]

আমরা যারা বড়ো বড়ো জনপদে বাস করি, বুদ্ধিকে জীবিকার উপায় হিসেবে ব্যবহার করি, আমরা যারা ভদ্রসন্তান অথবা ভদ্রসমাজের পরিধিতেই চলাফেরা ও কাজকর্ম করি, সেই আমরা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার কতটুকু অংশ? আমরা দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার—নিদেন শতকরা আশি ভাগ মানুষেরও—আধ্যাত্মিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার সন্ধান রাখি না, পরিচয় জানি না, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার, মনোভাব ও সাধনার স্বরূপ বুঝতে পারি না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজনে এই সাধনার বিষয়ে আমরা কেউ কেউ গবেষণা করে থাকি বটে কিন্তু তার মর্মে প্রবেশে আমরা অক্ষম। 'নিঠুর-গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?' ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' নামে যে হিবর্ট বক্তৃতা দেন তাতে এদেশের অপুথ্যা বা অপুঁথিয়া সহজিয়া তত্ত্বকেই বিশ্ববাসীর সকাশে প্রকাশ করেন; এই বক্তৃতার বীজ নিহিত ছিল ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'ফিলজফি অব আওয়ার পীপল' নামক বক্তৃতায়। স্পষ্টতই আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা জনসাধারণের দর্শন বা মানুষের ধর্ম বলতে সেই সাধনাকেই বুঝিয়েছেন যাতে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মগুলির অন্তর্গূঢ় সত্যগুলি একাধারে বিধৃত হয়েছে, যার পরিসরে অচিহ্নিত ব্রাত্য সত্যগুলি সর্বজনীন স্তরে সরলীকৃত ও সমীকৃত হয়েছে অর্থাৎ ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতালোভীরা যা-ই বলুন-না কেন, উক্ত সরলীকরণ ও সমীকরণের দিকেই জনসাধারণের এবং দেশের উৎকৃষ্ট আত্মাগুলির নিশ্চিত গতি ও প্রবণতা।

সহজিয়া সাধনার ধারা যখন বাংলায় সবচাইতে ব্যাপক রূপ নিতে শুরু করে তখনই ঘটনাক্রমে এদেশে ব্রিটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠার যুগও শুরু হয়। এর অনিবার্য পরিণাম হলো প্রথমে বাংলায় ও পরে আস্তে আস্তে গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন অর্থাৎ পাশ্চাত্য উপকরণের সংমিশ্রণ জনিত প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত। এই নতুন উপকরণের যদিও একটা স্বতন্ত্র ধর্মবোধ ছিল তবু তাকে

কোনমতেই বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য বা ইসলামের অনুরূপ নতুন একটি ধর্মীয় উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, বরং তা বিশেষ রূপেই ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ অথবা ধর্মাতীত এবং এটাকে একান্তরূপেই অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক উপকরণ বলাই সমীচীন। লক্ষণীয় যে এদেশে পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্যশক্তি-গুলি যেভাবে খ্রীস্টধর্মের প্রচারকদের নানাবিধ সুযোগসুবিধা ও স্বাধীনতা দিয়েছিল তার তুলনায় ব্রিটিশ শক্তি কিছুই দেয়নি, উপরন্তু অর্ধশতাব্দীরও বেশি খ্রীস্টধর্মের প্রচারকদের কর্মধারার উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করে ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসকে যথাসাধ্য অনাহত রাখার নীতি অনুসরণ করার দিকেই সে-শক্তি অধিকতর যত্নপরায়ণ ছিল। আসলে ইংরেজদের প্রধান আগ্রহ ছিল ভারত-বাসীদের মধ্যে খ্রীস্টধর্মের প্রচারের চাইতে নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সফল করার দিকেই বেশি। অবশ্য এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্রিটিশদের অমানুষিক লুন্ঠন ও শোষণের বিবরণ দেওয়ার অবকাশ বা প্রয়োজন এখানে নেই, তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে তিরিশ বছরেরও বেশি এদেশের মানুষ যে-বিভীষিকার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে তার কোনও নজির অন্তত পূর্ববর্তী পাঁচ-শ বছরের ইতিহাসে নেই।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রিটিশ শক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার মাটিতে এবং স্বভাবতই ওই পাশ্চাত্য উপকরণের অনুপ্রবেশের দরুন ভারতীয় জন-সাধারণের প্রথম প্রতিক্রিয়া বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ-উদ-দৌল্লার সৈন্যবাহিনীকে রবার্ট ক্লাইভ খুব সহজেই পরাস্ত করেছিলেন। ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে নবাবের বিপুল বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করার সুলভ তাৎপর্য এই যে ব্রিটিশরা অসীম বীরত্ব ও মহিমার অধিকারী, পক্ষান্তরে দেশীয়রা কাপুরুষ ও দুর্বল। এই তাৎপর্য যথার্থ না হতে পারে, কিন্তু পল্লগ্রাহী বিচারে এরূপ তাৎপর্য নিষ্কাষণের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে পলাশীর সাফল্য ব্রিটিশদের জাতীয় গৌরব বর্ধনে সাহায্যই করেছে এবং এই কারণেই সম্ভবত ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের অথবা ব্রিটিশদের গুণগ্রাহী ভারতীয় ঐতিহাসিকদের রচনায় দেশীয় বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী সবিস্তর বর্ণিত হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌল্লার সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করার পরে ব্রিটিশদের আরও একটা বড়ো যুদ্ধ করতে হয়—মীরকাশিমের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বকসার প্রান্তরে। বকসারের যুদ্ধে ব্রিটিশরা প্রকৃতই বীরত্বের পরিচয় দেয়, কিন্তু একথা ভাবা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে বকসারের সাফল্যের পরে বাংলা

সুবায় ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তার খুব অনায়াসে হয়েছিল। ব্রিটিশদের প্রকৃত শক্তি পরীক্ষা তখনও বাকি ছিল এবং তাদেরকে সেই শক্তি পরীক্ষা করতে হয়েছিল বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী বহু অর্থক্ষয়ী, বহু লোকক্ষয়ী সংগ্রামে। অবশ্য ব্রিটিশদের এই প্রকৃত শক্তি পরীক্ষার সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস বহুল পরিমাণে অজ্ঞাতই শুধু নয়, তার যতটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছে তার অনেকখানিই বিকৃত।

বাংলা সুবার জনসাধারণের সঙ্গে ব্রিটিশদের এই সংগ্রামের কাহিনীকে সন্ন্যাসীফকির বিদ্রোহ নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। 'আনন্দমঠে'র তৃতীয় মুদ্রণের সময় ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র জানান যে দেশীয় শক্তির অভ্যুত্থানে "ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল" এবং ওই জাগরণের পটভূমিতে 'আনন্দমঠ' রচিত হয়ে থাকলেও "উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে"। এর পরে আবার 'দেবী চৌধুরাণী'-তে তিনি লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইস অব হেষ্টিংসকে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই।" উদ্ধৃত বাক্যাংশগুলির মধ্যে প্রথমটি ও শেষেরটি থেকে বোঝা যায় যে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ওই অভ্যুত্থানকে দমন করার জন্যে ব্রিটিশরা এমন সমরায়োজন করার প্রয়োজন অনুভব করেছিল যেমনটি তারা সিরাজ-উদ্-দৌল্লা, মীরকাশিম অথবা টিপু সুলতানের বাহিনীর বিরুদ্ধেও করেনি। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উৎখাত করার জন্যে সন্ন্যাসীদের জাগরণের যে-কাহিনী উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক সত্য নয়। তাহলে ঐতিহাসিক সত্য কী? এ প্রশ্নের উত্তর 'আনন্দমঠে' মিলবে না, সেজন্যে 'দেবী চৌধুরাণী'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। দেবী চৌধুরাণীর গুরু ভবানী পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সুস্পষ্টরূপেই ব্রিটিশদের বিরোধী শক্তির নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু বস্তুগত কারণে ভবানী পাঠককে "ডাকাইত" বলেও উল্লেখ করেছেন, অথচ এই ডাকাত সর্দারের প্রতি আন্তরিক পক্ষপাত ও শ্রদ্ধাকেও পুরোপুরি গোপন করেননি। একটু তলিয়ে দেখলেই 'আনন্দমঠে'র সন্তানদের সঙ্গে 'দেবী চৌধুরাণী'র ডাকাতদের শনাক্ত করা যায় এবং এভাবে শনাক্ত করলে বোঝা যাবে যে দুটি উপন্যাসেরই ঐতিহাসিক সত্য হলো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীদের অভ্যুত্থান।

পলাশীর বিপর্যয়ের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলা সুবার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের তৎপরতা শুরু হয় এবং ছিয়াত্তরের

মন্বন্তরের পরে এই তৎপরতা কেন্দ্রীভূত হয় উত্তর বাংলার রংপুর অঞ্চলে। কোম্পানীর নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর পূর্ণিয়া, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল বটে, কিন্তু এসব অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রংপুরে তার প্রকোপ পড়ে নি বললেই চলে, এবং স্বাভাবিক কারণেই উপক্রুত এলাকার গ্রামবাসীরা দলে দলে রংপুরে এসে সমবেত হয়। এদের মধ্যে যেমন সর্বত্যাগী যথার্থ সন্ন্যাসী ফকিররা ছিল তেমনই মন্বন্তরে সর্বরিক্ত গৃহস্থরাও ছিল; যেহেতু ভেখ নিলে ভিখ মেলে সহজে তাই এই গৃহস্থদের অনেকেই যে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে ভিক্ষাকে জীবিকা করে সন্ন্যাসী বা ফকিরের ভেখ গ্রহণ করেছিল এ অনুমান সঙ্গত কারণেই করা যায়।

ফলে উত্তর বাংলায় অল্পকালের মধ্যেই এক বিরাট সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সম্প্রদায় গড়ে উঠে প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং অতঃপর মন্বন্তরে ছিন্নমূল বিশাল উদ্বাস্তু সমাজ সন্ন্যাসীফকির নামে চিহ্নিত হতে শুরু করে। মনে রাখা ভালো যে চলতি বাংলায় সন্ন্যাসী বা ফকির বলতে শুধু ভেখধারীকেই বোঝায় না, গৃহহীন নিঃসম্বল ব্যক্তিকেও বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে যে জনসাধারণ মন্বন্তরের কালে উত্তর বাংলায় এসে সমবেত হয় তারা সকলেই চলতি বাংলা অর্থে সন্ন্যাসীফকির নামে পরিচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

এই সন্ন্যাসীফকিররা যখন হাজারে হাজারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত তখন সে-তথ্যকে পাঁচ হাজার বা সাত-আট হাজার সন্ন্যাসী বা ফকিরের স্থানবদল রূপে ব্রিটিশ শাসকরা নথিভুক্ত করত; মন্বন্তরে বাংলার গ্রামকে-গ্রাম উজাড় হলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা কিন্তু খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোন রকম শিথিলতা দেখায় নি, বরং খাজনা আদায়ের জন্যে নিযুক্ত ইংরেজ সুপারভাইজাররা ওই দুর্দিনেও পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় বেশি খাজনা আদায়ের কেরামতি দেখিয়েছে এবং কী ধরনের বর্বর পদ্ধতিতে তারা বেশি পরিমাণে খাজনা আদায়ে সমর্থ হয়েছিল তা অনুমান করাও সহজ। খাজনা আদায়কারীদের নির্যাতনের ভয়েও হাজার হাজার গ্রামবাসী ভিটেমাটি ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে উত্তর বাংলার তথাকথিত সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল, কেননা ও ছাড়া তাদের সামনে প্রাণরক্ষার আর কোনও পথ খোলা ছিল না।

এইবার শুরু হলো সর্বরিক্ত জনসাধারণের বাঁচার লড়াই। নিজ নিজ

পূর্বপুরুষের অনুসৃত ধর্মমত অনুযায়ী এই সংগ্রামী জনসাধারণের একটা অংশ পরিচিত হলো সন্ন্যাসী নামে আর একটা অংশ হলো ফকির নামে। এদের এই সংগ্রামকেই বলা হয়েছে সন্ন্যাসীফকির বিদ্রোহ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হলো ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় গণশক্তির প্রথম গৌরবময় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ভবানী পাঠক, চেরাগ শাহ প্রভৃতি অনেক আঞ্চলিক নেতাই ছিলেন, কিন্তু সমগ্র অভ্যুত্থানের মূল নেতা ছিলেন মজনু শাহ নামে একজন মুসলমান ফকির। মজনু শাহ সত্যিই ফকির ছিলেন, না ওই ছদ্মনামে আসলে কোনও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রতিপত্তিশালী, জনৈক জনপ্রিয় মুসলমান ব্যক্তিই এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

মজনু শব্দটির অর্থ পাগল আর শাহ শব্দটির অর্থ রাজা, তাহলে মজনু শব্দ দুটির একত্রে অর্থ দাঁড়ায় পাগল রাজা। আসলে এটি একটি ছদ্মনাম। মজনু শাহ যে বহুকাল পর্যন্ত তাঁর প্রকৃত নাম ও পরিচয় গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন এটা তাঁর ব্যক্তিগত ও বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী গণশক্তির সাংগঠনিক সাফল্যের এবং ব্রিটিশ শাসকদের ও ব্রিটিশ শক্তির প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ, তাই পরবর্তীকালে মজনু শাহের প্রকৃত নাম ও পরিচয় জানার পরেও তা গোপন রেখে ইংরেজরা আসলে সেই প্রমাণকেই গোপন করেছে। খানচৌধুরী আমানতউল্লা আহমদের 'কোচবিহারের ইতিহাসে' এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষে' বাকের মহম্মদ বা বাকের আলি নামে উল্লিখিত রংপুরের জনৈক ভূস্বামীই মজনু শাহ ছদ্মনামে ব্রিটিশ বিরোধী গণশক্তিকে চালনা করতেন অথচ প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেন ব্রিটিশদের চোখের সামনেই। বাকের ছিলেন মুঘল বংশোদ্ভূত এবং তাঁর এক কন্যার সঙ্গে দিল্লীর দ্বিতীয় আকবর বাদশাহের বিবাহ হয়। সেকালে মুঘল পরিচয় ছিল উত্তর ভারতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং মজনুর মুঘল পরিচয় প্রচারিত হলে বাংলার জনযুদ্ধ সমগ্র উত্তর ভারতেই বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কার থেকেও ইংরেজরা মজনু শাহের প্রকৃত পরিচয় গোপনে যত্নপর হয়েছিল বলে মনে হয়।

মজনু শাহের অনুচরদের মধ্যে মুসা শাহ, চেরাগ শাহ প্রভৃতি ছিলেন প্রধান, আর রাজা শিবচন্দ্র রায়, মহারাজ হনুমান গিরি, ভবানী পাঠক প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য সহযোগী ছিলেন। এঁরা সকলেই আপন আপন এলাকায় ব্রিটিশ বিরোধী গণশক্তিকে খণ্ডে খণ্ডে চালনা করতেন, কিন্তু এই সমস্ত খণ্ড শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত করেছিলেন মজনু শাহ এবং এজন্যেই সন্ন্যাসীফকির

বিদ্রোহের প্রধান নেতা হিসেবে একা মজনু শাহের নামই সরকারী নথিপত্রে পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হয়েছে।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের সূচনাতেই ইংরেজদের বর্বর হত্যালীলার প্রসঙ্গে মজনু শাহ নাটোরের রানী ভবানীকে এক চিঠিতে লেখেন, 'The merit which is derived and the reputation which is procured from the murder of the helpless and indignant need not be declared. Formerly the Fakirs begged in separate and detached parties but now we all collected and beg together. Displeased at this method they [the English] obstruct us in visiting the shrines and other places —this is unreasonable. You are the ruler of the country. We are Fakirs who pray always for your welfare. We are full of hopes.' মজনু শাহ নিশ্চয়ই ইংরেজীতে চিঠিটি লেখেননি, এবং চিঠির অনুবাদক কোনও ইংরেজ কর্মচারী কি রায়সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন আর অনুবাদটি কতখানি যথাযথ সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে রায়সাহেব যামিনীমোহন ঘোষের 'সন্ন্যাসী অ্যাণ্ড ফকির রেডর্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে উদ্ধৃত মজনুর চিঠির থেকে বোঝা যায় যে, ফকিররা অর্থাৎ বাংলায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে রানী ভবানীর আশ্রয় ও আশীর্বাদ তারা একান্তরূপে কামনা করেছিল। এই যোগাযোগের ফলে স্বভাবতই ব্রিটিশরা নাটোরের জমিদার বাড়িকে তাদের পয়লা নম্বরের শত্রু হিসেবে গণ্য করে, রানী ভবানীর জীবদ্দশাতেই তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে এবং ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনার হ্যারিংটন-নাটোরের রাজাকে গৃহবন্দী করেন।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের গায়ে একেবারেই আঁচড় পড়েনি, কিন্তু সন্ন্যাসী-ফকিরদের সঙ্গে যুদ্ধে কম করে ছ জন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত সেনাপতি নিহত হয়েছিল আর ব্রিটিশদের সিপাহীরা নিহত হয়েছিল কয়েক হাজার। মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ সিপাহীর সাহায্যে রবার্ট ক্লাইভ নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লার বিপুল সৈন্য বাহিনীকে পরাস্ত করে ব্রিটিশদের জাতীয় গৌরব বর্ধন করেছিলেন, কিন্তু পাঁচ-শ' সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চার ব্যাটেলিয়ন ব্রিটিশ সিপাহী নিয়োগের নিদর্শন নিশ্চয়ই সেই গৌরবের খর্বকারক। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীফকিরদের বিরুদ্ধে

ব্রিটিশ শক্তি যে পরিমাণ সমরায়োজন করেছিল তার থেকে বোঝা যায় যে এই জনযুদ্ধতে কোম্পানী সরকার সত্যিই কতটা বিপন্ন হয়েছিল। সন্ন্যাসীফকিরদের বিরুদ্ধে অভিযানের আগে প্রত্যেক ব্রিটিশ সেনাপতিকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করে দেওয়া হতো এবং কোন রকম ঝুঁকি নিতে বারণ করা হতো। শুধু বাংলা সুবার সিপাহী বাহিনী উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত নয় বুঝে ওয়ারেন হেস্টিংস মাদ্রাজ থেকেও ব্রিটিশ সেনাপতি ও সিপাহী বাহিনী তলব করে আনান এবং সিপাহীরা যাতে কোনও ভাবে জনসাধারণের সংযোগে না আসে সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্যে হুকুম জারী করেন। একই সংঙ্গে বাংলায় ও মহীশূরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ও আত্মঘাতী ব্যাপার বুঝতে পেরে টিপু সুলতানের সঙ্গে ম্যাঙ্গালোর চুক্তি সম্পাদন করে সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হেস্টিংস বাধ্য হন।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন ব্রিটিশ সেনাপতি ও কর্মচারীদের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে ওই বছরেরই কোনও এক সময়ে মজনু শাহ গুরুতর রূপে আহত হন, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে এবং কোথায় তাঁর মৃত্যু হয় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মজনু শাহের মৃত্যুর পরেও সন্ন্যাসীফকিররা আরও বেশ কয়েক বছর তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যান, কিন্তু আগের সঙ্ঘবদ্ধতা ও সুপরিকল্পনা আর সে-সংগ্রামের পেছনে ছিল না, তার তীব্রতাও উল্লেখযোগ্য রূপে হ্রাস পেয়েছিল।

সন্ন্যাসীফকির বিদ্রোহ তথা বাংলার গণ-শক্তির প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান থেকে ব্রিটিশ শাসকরা দেশীয় জনসাধারণের সামগ্রিক জীবনের প্রকৃত বা বস্তুগত স্বরূপ নির্ধারণে শৈথিল্য বা বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেয়নি; তারা বুঝেছিল যে দেশীয় জীবনের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সাযুজ্যই এদেশে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের প্রধান বাধা এবং তারা আরও বুঝেছিল যে এই বাধা অপসারণের জন্যে জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশের কাছে নিজেদেরকে হিতৈষী প্রতিপন্ন করতে হবে।

দেশীয় জীবনের ঐক্য ও সাযুজ্যের দুটি স্তর ছিল—একটি ধর্মগত ও অন্যটি শ্রেণিগত এবং এজন্যেই হিন্দু ও মুসলমান, কৃষক ও জমিদার সম্মিলিত ভাবে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র উত্থানে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, যদি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অথবা কৃষক ও জমিদারের মধ্যে সুস্পষ্ট ও সক্রিয় বিভেদ-বিরোধের সম্পর্ক থাকত তাহলে পলাশীর যুদ্ধের মতো অনায়াসেই ইংরেজরা তুড়ি মেরে রাতারাতি সন্ন্যাসীফকিরদের দমনে সমর্থ হতো।

যাতে জনসাধারণের উপরে প্রভাবশালী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীকে সুহৃদ ও সমর্থক হিসেবে লাভ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। (পুরোনো জমিদার শ্রেণীকে সম্পূর্ণ রূপে চূর্ণ করে এই বন্দোবস্তের সাহায্যে গড়ে তোলা হলো এক নতুন জমিদার শ্রেণী এবং ব্রিটিশদের দাক্ষিণ্যে যারা নতুন জমিদার হলো তারা স্বভাবতই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হলো।) (তাই দেখা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পরে এদেশে যে সব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত গণ-বিক্ষোভ হয় তাতে জমিদাররা অংশ নেয়নি, উপরন্তু সে সব বিক্ষোভ দমনে তারা ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে পর্যন্ত জমিতে কৃষকের যে-স্বত্ব ছিল তার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হলো আর তা অর্পণ করা হলো নতুন জমিদারদের, ফলে বিদ্রোহী প্রজাকে শাসন করা জমিদারের পক্ষে যেমন সহজ হলো তেমনই আপনা থেকে কৃষক ও জমিদারের পুরোনো সম্পর্ক শুধু বিকৃতই হলো না, উভয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অথচ অনিবার্য বিরোধের সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হলো।

আবার এরই সমান্তরালে কৃষক তথা শ্রমজীবী সমীকৃত হলো ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে এবং জমিদার তথা পরশ্রমভোজী সমীকৃত হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে, কেননা প্রজাদের মধ্যে যেমন মুসলমানরা তেমনই নতুন জমিদারদের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—তুর্ক বিজয়ের পরে হিন্দুদের একটা ক্ষুদ্র অংশ শাসক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে যেমন ইসলাম গ্রহণ করেছিল তেমনই আবার পলাশীর বিপর্যয়ের পরে হিন্দুদের আর একটা ক্ষুদ্র অংশ শাসক সাহচর্যে নিজেদের বৈষয়িক সৌভাগ্য গড়ে নিতেও সচেষ্ট হয়েছিল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদেরকে সে-সৌভাগ্য গড়ে তোলার পথই প্রশস্ত করে দেয়।

অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ সুস্পষ্টভাবে দেশীয় স্বার্থ ও সত্তাকে দুটি শ্রেণীতে ও সেই সঙ্গেই দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ করার মূল নীতি ও ভিত্তি নির্ধারণ করে দেয়, যদিও সেই মুহূর্তেই ওই দুটি পক্ষের বিরোধ বা সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়নি, কিন্তু ওই বিভাগের ফলে চরিত্রে রায়তরা ব্রিটিশের বিপক্ষে ও জমিদাররা ব্রিটিশের স্বপক্ষে তখন থেকেই অবস্থান শুরু করে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রায়তদের প্রতি সুবিচারের দাবি রামমোহন ছাড়া আর কোনও আলোকপ্রাপ্ত ভূস্বামীর কণ্ঠে শোনা গেল না এবং রামমোহনই বাঙালী মনীষীদের মধ্যে ১৭৯৩-র জমিদারী ব্যবস্থার প্রথম সত্যিকার সমালোচক। (কিন্তু ব্যাপারটা মোটের উপর এরকমই দাঁড়ায় যে জমিদার মানে হিন্দু আর হিন্দু জমিদার

ব্রিটিশদের পক্ষ এবং রায়ত মানে মুসলমান আর মুসলমান রায়ত মানে ব্রিটিশ-দের বিপক্ষ।)

পাশ্চাত্য তথা আধুনিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনেক আগেই দেশীয় অচলায়তনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা রামমোহন লাভ করেছিলেন পাটনার ছাত্রজীবনে মরমী সূফী ও গ্রীক দর্শন প্রভাবিত যুক্তিবাদী মুতাজিলা চিন্তাধারার সংযোগে। বে-শরা ইসলামের এই সংযোগের ফলেই পূর্বপুরুষদের অনুসৃত হিন্দু সংস্কারগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে আর সে সব প্রশ্ন উত্থাপনের অপরাধেই পিতা কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে তিনি দেশ পর্যটনে বের হন। রামমোহনের আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রথম থেকেই কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল তা বোঝা যায় ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে পার্সীতে রচিত 'তুহফৎ-উল মুওয়াহিদ্দিন' অর্থাৎ 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার' নামক পুস্তিকা থেকে, যার নাম থেকেই স্পষ্ট যে একেশ্বরবাদিতাই এ-পুস্তিকার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। রামমোহনের আধ্যাত্মিক চিন্তার মূল কথা হলো "একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা বর্জন" এবং এ-সত্য যে তিনি ইসলামের থেকেই পেয়েছিলেন তা শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে জানা যায়। ছাত্রোত্তর জীবনে রামমোহন আবিষ্কার করেন যে একদা যে-বৈদান্তিক ধর্ম এদেশে প্রচলিত ছিল তারও মূল কথা একই, কিন্তু পরে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রভাবে শুধু বৈদান্তিক ধর্মচর্চাই অচল হয়ে যায় না, ভারতবাসীর মন ও বুদ্ধিও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। উক্ত পুস্তিকায় রামমোহন লক্ষ্য করেছেন, 'ঘটনা এই যে নিজের চোখ ও কান থাকা সত্ত্বেও অভ্যাস ও শিক্ষা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে।' এখানে দেশবাসীর প্রতি বুদ্ধিকে মুক্ত করার জন্যে রামমোহনের আহ্বান কুঞ্চিকা রূপে বিদ্যমান এবং ইসলামের যুক্তিবাদী মুতাজিলা দর্শনের থেকেই উক্ত কুঞ্চিকা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়। উল্লিখিত পুস্তিকা ছাড়া 'মনজারাৎ-উল আদিয়ান' নামে আর একটি পুস্তিকা তিনি পার্সীতে রচনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচার ছিল এটির আলোচ্য বিষয়, কিন্তু শাস্ত্রানুগ ইসলাম ধর্মের কিছু কিছু সমালোচনা করেছিলেন বলে এই পুস্তিকা রক্ষণশীল মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ জাগায় এবং হয়তো সেজন্যেই এটির আর পুনর্মুদ্রণ করেননি, তবে কারও কারও মতে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মহম্মদের একান্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। যাহোক, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিপিনচন্দ্র পালের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, রামমোহনের জীবনচর্যার ভিত্তিতে ছিল সূফী ও মুতাজিলা চিন্তাধারার আশ্চর্য সংমিশ্রণ এবং বে-শরা বা শাস্ত্র-বহির্ভূত

ইসলামের অভিঘাতেই তাঁর মননের অর্গল প্রথম উন্মুক্ত হয়েছিল, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে জাগরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ইসলামীয় যুক্তি-বুদ্ধির সংস্পর্শে, যদিও সামগ্রিক তাৎপর্যে সে-জাগরণ পাশ্চাত্য অভিঘাতেরই প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু ধর্ম-সংস্কারক রূপে রামমোহনের যে-পরিচয় বহুল প্রচারিত তা তাঁর অদ্বিতীয় পরিচয় তো নয়ই, এমনকি তাঁর প্রধান ও যথার্থ পরিচয়ও নয়। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন প্রকৃষ্ট রূপে এক নতুন বৈপ্লবিক মূল্যবোধের প্রবর্তক এবং এই মূল্যবোধটি হলো একান্তই মানবিক ও ইহলৌকিক, আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, অর্থনীতি-ও-রাজনীতি সংক্রান্ত। রামমোহনের কর্মজীবন ও রচনাবলী এবং ভারতবর্ষের আধুনিকীকণের প্রক্রিয়া ও ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে সংস্কারক রামমোহনের অপেক্ষা প্রবর্তক রামমোহনের পরিচয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ; এবং এক্ষেত্রে দেশের ইতিহাসে পাশ্চাত্য উপকরণের অনুপ্রবেশ অজ্ঞাতপূর্ব নতুন প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

পত্রাকারে লিখিত আত্মজীবনীতে রামমোহন লিখেছেন যে প্রথম যৌবনে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল আত্যন্তিক ঘৃণাপূর্ণ এবং সেসময় তিনি পদব্রজে স্বদেশ পরিক্রমার কালে উত্তরের হিমালয় পর্যন্ত গেছলেন। কিন্তু উত্তর বাংলাকে এড়িয়ে তাঁর পক্ষে তিব্বত বা ভুটানে পৌছনো সম্ভব ছিল না আর উত্তর বাংলা যেহেতু তখন গণজাগরণের দরুন সন্ন্যাসীফকিরদের কর্ম-তৎপরতায় সর্বদাই চঞ্চল থাকত তাই তাদের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে তাঁর পক্ষে উত্তর বাংলা অতিক্রম করাও অসম্ভব ছিল এবং সম্ভবত তাদের সংস্পর্শে এসেই তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তীব্র বিমুখতায় আক্রান্ত হন। পরে ব্রিটিশদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগের ফলে তাদের গুণাবলীরও পরিচয় পান ও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, কোম্পানীর অধীনে চাকরিও করেন, কিন্তু রংপুরে কালেক্টরের দেওয়ান হিসেবে চাকরি করার সময় নতুন করে তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন ব্রিটিশ বিরোধীদের কোনরকম যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবে তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে বছর পঞ্চাশেক পরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করা উচিত। রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেন যে ব্রিটিশদের আগমনের ফলে এদেশে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের চাইতে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রসঙ্গ অগ্রাধিকার লাভ করতে চলেছে এবং সেজন্যে তিনি-ই প্রথম দেশবাসীর চিত্তে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় উন্মেষ ঘটান। কিন্তু অর্থনৈতিক

বা রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাত যে ধর্মীয় বিরোধের সঙ্গে মিশে পরিস্থিতিকে জটিলতর করতে পারে এমন কোনও আশঙ্কার ছায়াপাত তাঁর রচনায় দেখা যায় না, যদিও হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় বিভেদ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন।

কিন্তু ধর্মীয় বিভেদ এক ব্যাপার আর বিরোধ অন্য ব্যাপার এবং এই বিরোধেরই নিরীহ সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীতেই এবং প্রথমে তা আত্মপ্রকাশ করে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রচ্ছদে অথচ শুরুতে এই আন্দোলন ছিল মুখ্যত অর্থনৈতিক এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আরব্ধ। রামমোহন যখন ভারতবর্ষকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিক করে তোলার সাধনা শুরু করে দিয়েছেন পুরোদমে সে সময়েই রায় বেরিলীর সৈয়াদ আহমদ শাহ হজ করার জন্যে মক্কায় গিয়ে আরবের আবদুল ওয়াহাবের অনুগামীদের সংযোগে আসনে, ওয়াহাবপন্থীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল অবিশ্বাসীদের অপসারণের জন্যে জিহাদের আদর্শে। আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের থেকে ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের মৌল পার্থক্য অধ্যাপক এম. হুসেন নির্ধারণ করেছেন ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রী কংগ্রেসে পঠিত 'ওরিজিন্স অব ইণ্ডিয়ান ওয়াহাবিজম' নামক মূল্যবান প্রবন্ধে। দুটি আন্দোলনের মধ্যে নামের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃত মন্ত্রদাতা আরবের আবদুল ওয়াহাব নন, দিল্লীর মৌলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ। মৌলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহর ভাবধারায় সৈয়ীদ আহম্মদ শাহ হজ যাত্রার আগেই প্রভাবিত হন, কিন্তু পরে বহির্ভারতীয় জগতের সঙ্গে অর্থাৎ আরব দুনিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর ভাবধারাকে আরবের আন্দোলনের শামিল করে তোলেন ও ওয়াহাবী নামটি ব্যবহার করতে থাকেন। ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের গুরু ওয়ালিউল্লাহ্ আসলে ছিলেন মানুষের মধ্যে আদি সাম্যের প্রচারক এবং তাঁর মতামতের ও চিন্তাধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাববাদী সাম্যতন্ত্রের বহু বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাজে অর্থাৎ যে-সমাজব্যবস্থায় জনসাধারণকে এক টুকরো রুটির জন্যে গাধা ও বলদের মতো মেহনত করতে হয়, অথচ কিছু লোক না খেটেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তা উচ্ছেদ করার জন্যে ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। এহেন ব্যক্তির উত্তরসূরী রূপে সৈয়ীদ আহমদ শাহ যখন নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলেন তখন মুখ্যত নির্ভর করলেন বছর চল্লিশেক আগে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক শোচনীয় ভাবে নির্যাতিত রোহিলাদের উপরে, যাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ ছিল

সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত তীব্র। অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই রোহিলাখণ্ড থেকে পাটনা পর্যন্ত সৈয়দ আহমদের অসামান্য জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তারই ভিত্তিতে তিনি প্রায় একই সঙ্গে একদিকে শিখদের বিরুদ্ধে ও অন্যদিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। তাঁর প্রাথমিক সাফল্যগুলি দারুণ উন্মাদনা জোগাল বাংলার কৃষক সমাজে-ও—এই সমাজ একই সঙ্গে জমিদারদের ও নীলের কুঠিয়ালদের হাতে অবর্ণনীয় রূপে নিগৃহীত ও শোষিত হতো।

বারাসত অঞ্চলের অধিবাসী তিতু মিঞার নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ কৃষক সমাজ ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী শাসনের প্রতিভূ জমিদার ও নীলের কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষেই কৃষকেরা এই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অগ্রসর হয় এবং সম্প্রদায় বিচার না করে জমিদারদের বাড়ি আক্রমণ ও লুট শুরু করে—এ-ব্যাপারে হিন্দু জমিদারদের প্রতি তাদের যে-মনোভাব ছিল মুসলমান জমিদারের প্রতিও সেই একই মনোভাব ছিল। তিতু মিঞার অনুচরদের হাতে হিন্দু জমিদার বা জমিদারের সমগোত্র ব্যক্তি যে-রকম ব্যবহার পেয়েছে মুসলমান জমিদার বা জমিদারের সমগোত্র ব্যক্তি একই রকম ব্যবহার পেয়েছে এ-কথাটা মনে রাখা উচিত।

বিদ্রোহের নেতা তিতু মিঞার দাড়ি ছিল এই সূত্রে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে দাড়ির উপরে কর বসিয়ে পূর্ণার জমিদার কৃষ্ণ রায় ব্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলে দিলেন, কেননা অধিকাংশ মুসলমান কৃষকেরই দাড়ি ছিল, পক্ষান্তরে অধিকাংশ হিন্দু প্রজারই দাড়ি ছিল না। ফলে অধিকাংশ মুসলমান কৃষকই এই শাস্তিমূলক করের আওতায় এসে পড়ল অথচ অধিকাংশ হিন্দু কৃষকই বিদ্রোহে অংশ নেওয়া সত্ত্বেও ওই করের আওতার বাইরে পড়ে গেল।

অতঃপর বারাসতের বিদ্রোহ অচিরেই ছড়িয়ে পড়ল নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান কৃষকদের মধ্যে—এই কৃষকরা দাড়ি রাখার জন্যে কর দেওয়ার আওতায় পড়ে গিয়েছিল। মুসলমান কৃষকদের বিক্ষোভের জন্যে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হলো মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে এবং মুসলমান কৃষকরা তার জবাবে মন্দিরে ঢুকে গো-হত্যা করল। যা শুরুতে ছিল কৃষক ও জমিদারের বিরোধ তা পরিণত হলো হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধে এবং তার ফলে বিদ্রোহের নিজস্ব শক্তি নিঃশেষ হতে থাকে।

এরপর যখন কলকাতা থেকে বিদ্রোহ দমনের জন্যে বহুগুণে পরাক্রান্ত কোম্পানীর সৈন্য বাহিনী এল তখন তিতু মিঞা নারিকেল বেড়িয়া নামক

স্থানে একটি বাঁশের কেল্লা তৈরি করে তার ভিতরে আশ্রয় নিলেন। কোম্পানীর বাহিনী অতি সহজেই সে-কেল্লা জয় করে সাড়ে তিন শ বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু তিতু মিঞাকে জীবন্ত ধরতে পারেনি, যুদ্ধেই তিনি নিহত হন।

মজনু শাহের সঙ্গে তিতু মিঞার তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে একজনের শক্তি ছিল ঐক্যে এবং অপরজনের দুর্বলতা ছিল ঐক্যের ভাঙনে এবং সমগ্র দেশের বা সমগ্র কৃষক সমাজের থেকে ধর্মীয় সূত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার জন্যেই তিতু মিঞার উত্থানকে অত অনায়াসে দমন করা কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। বাঁশের কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ সমগ্র কৃষক সমাজের থেকে তিতু মিঞার বিচ্ছিন্নতারই প্রতীক।

বাংলায় তিতু মিঞার নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহের মধ্যপথেই ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনের মূল নেতা সৈয়দ আহমদ শাহের মৃত্যু হয় শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে। তিনি একই সঙ্গে ব্রিটিশদের এবং শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন— শিখরা যদিও স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী বলে দাবি করে তবু তাদের স্বাভাবিক স্থান হিন্দু সমাজেরই উদার পরিসরে এবং হিন্দুধর্মের অঙ্গ-স্বরূপ হয়েও শিখ সম্প্রদায়ের অন্তঃস্থলে সংগ্রামী মনোভাবের প্রকটতা লক্ষণীয়; আর এই মনোভাবের দরুনই সংগ্রামী মুসলিমদের সঙ্গে শিখদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল সংগুপ্ত অর্থাৎ এখানেই ওয়াহাবীরা পেয়েছে নির্বিরোধ তথা নিরস্ত্র হিন্দুদের বাদ দিয়ে সশস্ত্র শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার যৌক্তিকতা। সে-যুদ্ধ সৈয়দ আহমদের মৃত্যুতেই অবসিত হয় নি, আহমদের পরে পাটনার খলিফা-দ্বয় বলে পরিচিত ওয়ালিয়াৎ আলি ও ইনায়াৎ আলির নেতৃত্বে ওয়াহাবীরা একযোগে ব্রিটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং সিত্তানাতে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়।

পাঞ্জাব বিজয়ের সময় ব্রিটিশরা শুধু শিখদের কাছ থেকে নয়, ওয়াহাবীদের কাছ থেকেও প্রচণ্ড বাধা পায় এবং ব্রিটিশদের একযোগে শিখ ও ওয়াহাবীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বলেই পাঞ্জাবের যুদ্ধে তাদের অত বিপুল আয়োজন করতে হয়েছিল। অবশ্য ওয়াহাবী তৎপরতার মূল কেন্দ্র ছিল পাটনা আর এখান থেকেই ওয়াহাবীদের প্রচার-সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ত সারা উত্তর ভারতে এবং একটা পর্যায়ে পাটনার ওয়াহাবী সংগঠন সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল কলকাতার ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে। ওয়াহাবী তৎপরতার প্রেরণাতেই বিহারে অল-ই-হাদিস এবং বাংলায় ফরাজী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং যেটা লক্ষ্যণীয় সেইটে এই যে দুটির কোনটি-ই দৃঢ় অর্থে হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন ছিল না, দুটি-ই

ছিল মুসলিম নেতৃত্বে চালিত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন। সত্যি বলতে, বাংলার ওয়াহাবী বিদ্রোহে শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক আচরণ পরিস্ফুট হলেও সংঘাতটা ছিল ধর্মঘটিত নয়, বৈষয়িক স্বার্থঘটিত। অর্থাৎ দেশীয় তথা কৃষক সমাজের স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ তথা শাসক ও জমিদার গোষ্ঠীর স্বার্থের সংঘাত এবং এজন্যেই স্বয়ং হাণ্টার সাহেব বলেছেন যে তিতু মিঞার উত্থানটি ছিল প্রকৃতপক্ষে "an infuriated peasant rising." বাংলায় ওয়াহাবী উত্থান দমন করার পরে যে-ফরাজী উত্থান হয় সেটাও একই প্রকৃতির কৃষক অভ্যুত্থান।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বাংলার কৃষক সমাজের বৃহত্তর অংশই ধর্মত মুসলমান এবং স্বভাবতই কৃষক বিদ্রোহ মানে প্রধানত মুসলমানদের বিদ্রোহ, কিন্তু উচ্চ সমাজের মুসলমান ও কৃষক সমাজের মুসলমান চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর, উপরন্তু বৈষয়িক স্বার্থে হিন্দু কৃষক ও মুসলমান কৃষক পরস্পরের সুহৃদ ও সহায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে শ্রমভোজী শ্রেণী এবং পরশ্রমভোজী শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে : উর্দুভাষী পশ্চিমবঙ্গবাসী বিত্তবান মুসলমানকে যে-মর্যাদা সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু দিয়ে থাকে একজন বাংলাভাষী পূর্ববঙ্গবাসী দরিদ্র মুসলমানকে কখনই তা দেয় না এবং আজকের দিনে এই বৈষম্যমূলক আচরণের পেছনে যতই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিশ্লেষণ করা হোক-না কেন, এর পেছনে আসলে শ্রেণী-সত্তাই সবচাইতে বেশি সক্রিয়।

এই শ্রেণিগত বিভেদের জন্যেই তিতু মিঞার বিদ্রোহে হিন্দু কৃষকরাও প্রথম দিকে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল এবং বিদ্রোহের কোপ থেকে মুসলমান জমিদারও অব্যাহতি পায় নি, আবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ফরাজী উত্থানে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ফরাজী উত্থান ছিল ব্যাপকতর এবং তার জের চলেছে আরও বেশি দিন ধরে এবং তা আরও অনেক বেশি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র কৃষক সমাজেরই স্বার্থকে প্রতিফলিত করেছে।

ফরাজী আন্দোলনের সূত্রপাত হাজী শরিয়ৎ-উল্লার জনপ্রিয়তায়, যাঁর সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী—তিতু মিঞার ১৮৩১-এ প্রথম উত্থানেরও তিন-চার বছর আগে—পূর্ববঙ্গের, বিশেষত ঢাকার, সমগ্র কৃষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফরাজী শব্দটি হয় ফরাজ মানে ঊর্ধ্বতন অথবা ফরাইজ মানে দিব্য আজ্ঞা থেকে এসেছে এবং শাস্ত্রানুবর্তী বা রক্ষণশীল মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফরাজী দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা বোঝাবার জন্যে ফরাজীরা অনেক সময় নিজেদেরকে নয়া মুসলিম বলেও অভিহিত করত। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের

সারে অঞ্চলে জেরর্ড উইনস্ট্যানলির নেতৃত্বে উদ্ভূত ডিগর্স বা সংকর্ষক আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার ফরাজী আন্দোলনের নৈতিক সাদৃশ্য বর্তমান; ফরাজীরা বিশ্বাস করত যে জমি হলো দিব্য উপহার, তাই প্রকৃত ধার্মিক অপরের ব্যক্তিগত সেবায় আত্মনিয়োগ না করে শুধু জমি কর্ষণ করে জীবন নির্বাহ করবে এবং উভয় আন্দোলন-ই অংশত ধর্মীয় ও অংশত অর্থ নৈতিক।

শরিয়ৎ-উল্লার মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দুদু মিঞার উপরে নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়ে। দুদু মিঞার মতে মানুষ মাত্রেই সমান, কেননা ঈশ্বরের সৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই এবং একারণেই কৃষক ও জমিদারের সম্পর্কটাও কৃত্রিম বা স্বার্থপ্রসূত অর্থাৎ কৃষকের উপরে কর বসাবার কোনও ন্যায়সঙ্গত অধিকার জমিদারের নেই। মনে রাখা ভালো যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জোরে কৃষকের উপরে জমিদাররা অজস্র রকমের কর হামেশাই বসাত এবং জমিদারের বাড়িতে কোনও উৎসব হলে, বিবাহ বা অন্নপ্রাশন হলে, এমনকি জামাই এলেও প্রজাদের উপর কর বসিয়ে খরচ তোলা হতো আর বিশেষত হিন্দু জমিদারদের ক্ষেত্রে বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই থাকত, ফলে এ জাতীয় কর হিন্দু জমিদাররাই বেশি বসাত—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের জমিদারী নীতিতে মর্মাহত হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে খরচ তোলা বন্ধ করেছিলেন। মোটের উপর ফরাজীদের বক্তব্যে প্রাকৃত যৌক্তিকতা ছিল, ফলে তাদের আন্দোলনও সামগ্রিকভাবে কৃষক সমাজে উৎসাহ জাগিয়েছিল; কিন্তু যেহেতু কৃষকদের মধ্যে মুসলমানরাই আর জমিদারদের মধ্যে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাই এই অর্থ নৈতিক বিরোধের মধ্যে ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবকাশ ছিল প্রশস্ত, তবুও ফরাজী আন্দোলনের চরিত্র যে সাধারণত অর্থ নৈতিক-ই ছিল এটা বিস্ময়কর বৈকি। দুদু মিঞার নেতৃত্বে ঢাকা ও ফরিদপুরে কৃষক বিদ্রোহ এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে কোম্পানী সরকার বুঝতে পারে, শুধু সামরিক বাহিনীর দমনমূলক তৎপরতায় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তার জন্যে কৃষক অসন্তোষের মূল কারণগুলি নির্ণয় করা এবং যথাসাধ্য নির্ণীত কারণগুলি দূর করা উচিত।

কৃষক অসন্তোষের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে সরকার কতৃক সমিতি গঠিত হয়। হান্টার সাহেবের রচনা থেকে জানা যায় যে, যেসব ব্যক্তি বা পরিবার "possessed of property or vested rights", তারা সকলেই বিদ্রোহী কৃষকদের শত্রু বলে গণ্য হয়েছিল এবং বিদ্রোহীরা "broke into the houses of Musalman and Hindu landholders with perfect impartia-

lity." ইংলণ্ডের ডিগর্সের মতোই ওয়াহাবী ও ফরাজীরা ধর্মের নামে কৃষকদের উত্থানে ও অস্ত্র-ধারণে প্ররোচিত করে, কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজে প্রায় সমস্ত উত্তমেরই প্রেরণা যে ধর্ম থেকেই আসবে এটা নিতান্তই স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণে ও তার অন্তঃস্থিত সুযোগের নির্ধারণে ব্রিটিশ সরকার যে ভুল করেনি সেজন্যে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের প্রশংসা প্রাপ্য। তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড এলেনবারা ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে লিখে পাঠান, "I cannot close my eyes to the belief that, that race (Mahommedans) is fundamentally hostile to us and our true policy is to reconciliate the Hindus." হাওয়ার গতি যে বিরোধ ঘটিয়ে শাসন করার দিকেই বইতে শুরু করেছিল তা অনুমান করা খুবই সহজ।

দশম পরিচ্ছেদ

[ইংরেজের পক্ষ ও ইংরেজের বিপক্ষ—১৮৫৭তে ইংরেজের বিপক্ষীয় জনসাধারণের অভ্যুত্থান—ইংরেজের বিপক্ষীয় জনসাধারণের ধর্ম ও ১৮৫৭র অভ্যুত্থানের ধর্মীয় রূপ]

লর্ড এলেনবারার পরামর্শের মধ্যে পর্যাপ্ত সত্য নিহিত ছিল। ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই কারা অক্ষরে অক্ষরে শাস্ত্র মানে আর কারা মানে না তা নিয়ে একটা সূক্ষ্ম বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল এবং যেমন বাংলাতে কৃষক হিন্দুদের মধ্যে অপুথ্যা হিন্দু ধর্মের প্রভাব বেশি তেমনই কৃষক মুসলমানদের মধ্যেও বে-শরা ইসলামেরই প্রভাব ছিল বেশি ; পক্ষান্তরে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন জমিদার ও অপেক্ষাকৃত বিত্তবান সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উচ্চতর সমাজের সামান্য লক্ষণ ছিল শাস্ত্রানুবর্তিতা। আবার এই উচ্চতর সমাজেরই একটা অংশ প্রথমে জীবিকার সূত্রে ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসে, পরে সেই সুবাদেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয় ও স্বরূপ আবিষ্কার করে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার চর্চাতে অগ্রসর দেশীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে এই হিন্দুদের অধিকাংশই প্রাত্যহিক আচরণে ছিলেন আগের মতোই রক্ষণশীল অর্থাৎ উল্লিখিত জাগ্রত হিন্দু সম্প্রদায় মূলত গার্হস্থ্য জীবনে সনাতনপন্থী-ই রইল, তবে জীবিকার ক্ষেত্রে চালিত হলেন বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা। আর যাঁরা ঘরে-বাইরের জীবনে আপোষ করতে রাজি হলেন না, যাঁরা অন্তর্দ্বন্দ্ব এড়িয়ে সর্বাংশে বন্ধনমুক্ত হতে চাইলেন তাঁরা সমাজে নিন্দিত তো হলেনই, উপরন্তু তাঁরা অনেকেই প্লাবিত হলেন পাশ্চাত্য আতিশয্যে—সাধারণ ভাবে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও এই আতিশয্যের ভিতর দিয়েই উচ্চতর বা বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় যাত্রা করল আধুনিকতার পথে।

সাধারণ ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত নিম্নতর সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্য ছিল এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ওই সমাজ বা কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণী ছিল ব্রিটিশ বিরোধী, কিন্তু উচ্চতর সমাজে সে-ঐক্যের অভাব দেখা যায় এবং ওই সমাজের হিন্দুরা যেখানে প্রবল রূপে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সত্তার পরিপোষক হয়ে পড়ে সেখানে ওই উচ্চ শ্রেণিভুক্ত মুসলমানরা বিভক্ত হৃদয়ে বৈষয়িক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা

করলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে করল প্রায় পরিপূর্ণ অসহযোগিতা। যাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই শ্রমজীবী সমাজের ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে উচ্চতর মুসলমান সমাজের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিরোধী মনোভাব যখন যুক্ত হলো তখন স্বভাবতই ব্যাখ্যা করা সোজা হলো যে সাধারণত মুসলমানমাত্রেই ব্রিটিশ বিরোধী, অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় যে ব্রিটিশ বিরোধী সম্প্রদায় বলে একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় আছে এবং সেই সম্প্রদায়ের যারা সদস্য তারা হলো ধর্মত মুসলমান। এভাবে ব্রিটিশের সহযোগী ও ব্রিটিশের বিরোধী রূপে সম্প্রদায় ভাগ করার ভিতরে থাকল পরবর্তীকালের শোচনীয় পরিণামের বীজ।

সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিস্তারের প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল, সুতরাং খুব সতর্কতার সঙ্গে তার প্রকৃতি এবং চরিত্র অনুসন্ধান করা দরকার। যতদিন হিন্দু ও মুসলমান দুটি মাত্র পক্ষ ছিল ততদিন দুটি পক্ষ সরাসরি ভাবে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়েছে এবং অসমতা থাকলেও তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ব্রিটিশদের আসার পরে বহুবিধ কারণ জড়িয়ে হিন্দু-মুসলমানের বৈচিত্র্যমূলক সম্পর্ক দ্রুত বিরোধমূলক সমস্যার রূপ নেয়। এর পেছনে ব্রিটিশদের উপস্থিতি কোনও নতুন ও মারাত্মক কারণ হিসেবে কাজ করেছে কিনা সেইটেই এখানে অন্বেষণের বিষয়।

বাংলাতে বাণিজ্যের সূত্রে ক্ষমতার বিস্তারে ব্রিটিশদের প্রথম ও প্রধান সহায় ছিল কারা?

নিঃসন্দেহে হিন্দু সমাজেরই সেই অংশ তুর্কী-আফগানদের ক্ষমতার বিস্তারেও যে-অংশ ছিল প্রধান সহায়। এই অংশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—পাইক ও করণ। বাংলার সুলতানদের আমলে মুখ্যত পাইকদের নিয়েই সেনাবাহিনী গঠিত হতো এবং সাধারণত এদের সঙ্গে যোগসাজসেই একজন সুলতানকে সরিয়ে আর একজন মসনদে বসতেন, সুতরাং একথা স্বতঃব্যক্ত যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তরে পাইকরা বরাবরই বাংলার ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। যখন বাংলাসুবার নানাস্থানে ব্রিটিশরা একে একে কুঠি পত্তন করে তখনও এই পাইকদের নিয়েই প্রথমে কুঠিয়ালদের বাহিনী গঠিত হয়। আবার ওই মধ্যযুগে সুলতান-নবাবদের কাছারী-দপ্তরে যারা লেখালেখির কাজ করত তারা পরিচিত ছিল 'করণ' বলে, তাদের অনেকেই সংস্কৃতের চাইতে ফার্সী ভালো রপ্ত করেছিল এবং ওই জীবিকার সূত্রেই যারা লেখালেখির কাজ করে তাদের আজকাল করণিক বা কেরানী বলা হয়। আদতে করণ একটা জাতি

বিশেষ, যে-জাতিকে চলতি বাংলায় কায়স্থ বলে, তবে সম্ভবত কায়স্থ বর্ণেরই মসীজীবী অংশকে করণ বলা হতো। সুলতান-নবাবদের আমলের মতোই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম পর্যায়ে খাতাপত্র লেখালেখির কাজ প্রধানত করণরাই করেছে আর তাইতেই ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার ফলে ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষপুটের আশ্রয়ে দেশীয় মুনশী বেনিয়ান মুৎসুদ্দি দালাল প্রভৃতিদের একটা রীতিমতো অবস্থাপন্ন গোষ্ঠীর জন্ম ও বৃদ্ধি। অচিরেই করণদের সৌভাগ্য দর্শনে বর্ণহিন্দুর অপরাপর জাতিগুলিও সাহেবদের বোলবুলি রপ্ত করে এবং স্থূল বৈষয়িক স্বার্থে পরিণত হয় ব্রিটিশের নির্লজ্জ চাটুকারে। অতঃপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ব্রিটিশের সমর্থক হিসেবে গড়ে ওঠে এক নতুন জমিদার শ্রেণী এবং সবার শেষে গড়ে ওঠে সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায় যারা এদেশে ব্রিটিশের দীর্ঘকালীন উপস্থিতি কামনা করল এদেশে আধুনিকী-করণের একটি আবশ্যিক শর্ত রূপে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশদের সৌভাগ্য গড়ে তোলার কাজে তিন প্রকারের দেশীয় মানুষ সামর্থ্য ও সাহায্য জুগিয়েছে: পাইক সম্প্রদায়—এরা ব্রিটিশদের বাহুবল জুগিয়েছে; করণ সম্প্রদায় ও তৃতীয়ত এক ধরনের বিত্তবান সম্প্রদায়—এরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশীয় বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে যোগসূত্র বা দালাল হিসেবে কাজ করেছে। লক্ষণীয় যে ধর্মের বিচারে ব্রিটিশদের সামর্থ্য ও সাহায্য জোগানদার এই তিন সম্প্রদায়-ই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

আর বাংলাতে ব্রিটিশদের বিপক্ষতা বা তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করল কারা? নিঃসন্দেহে তারাই যারা জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ কৃষক ও কারিগর শ্রেণী এবং প্রাক-ব্রিটিশ যুগে যে সব ফার্সী-উর্দু-ভাষীরা রাজ্যশাসনের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্মচারী হতো। এদেশে ব্রিটিশের বিনাশশীল ভূমিকার চাপ যাদের উপরে সবচাইতে বেশি পড়ল সেই কৃষক ও কারিগররা কেন ব্রিটিশদের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হয় সেকথা বোঝা খুবই সোজা আর বাংলায় এই শ্রেণীর মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাতে যারা নবাবী আমলে সাধারণত উচ্চতর পদ লাভ করত তাদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা—ব্রিটিশ আমলে উচ্চতর পদগুলিতে ইয়োরোপীয়রাই অধিকারী হওয়ার ফলে প্রাক-ব্রিটিশ যুগের উচ্চতর আমলা সম্প্রদায় স্বভাবতই ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে উঠল এবং তারা ইংরেজী শিক্ষারও বিরোধী হলো।

এদেশে ব্রিটিশদের যেমন বিনাশশীল একটা ভূমিকা ছিল তেমনই একটা সৃজনশীল ভূমিকাও ছিল এবং এই সৃজনশীল ভূমিকা তারা সম্পন্ন করে ভারতবর্ষে

আধুনিকতার দূত বা বাহক হিসেবে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে যারা প্রথম উদ্যোগী হয় তারা অধিকাংশই এদেশীয় এবং এই সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষ হলেন রামমোহন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য তথা আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মানসিক উৎকর্ষসাধন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আগেই একটি দল হয়ে ওঠে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষক। কাদের নিয়ে এই দল গঠিত হয়? প্রধানত তারাই এই দলে যোগ দেয় যারা ব্রিটিশ স্বার্থের সমর্থন করে বা ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বৈষয়িক ক্ষেত্রে লাভবান হয়। অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বা তার ইংরেজ কর্মচারীদের বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, গোমস্তা ইত্যাদি হিসেবে কাজ করে অথবা কোম্পানী কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে নতুন জমিদার শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যারা এক অভিনব মধ্যবিত্ত শ্রেণী রূপে দেশীয় সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। সোজা কথায়, বেনিয়ান মুৎসুদ্দি আর নতুন জমিদার শ্রেণী আর পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের মাধ্যমে এদেশে ব্রিটিশের সৃজনশীল ভূমিকা পরিস্ফুট হলো এবং এই তিন স্তরের দেশীয়রাই নিল এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থকে সংরক্ষণের দায়িত্ব—এদেশে এরাই নিল ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগীর ভূমিকা। এবং এই সূত্রেই এদেশে হলো আধুনিকতার সূত্রপাত।

কিন্তু মনে রাখা ভালো যে শুরু থেকেই এই আধুনিকতার মর্মমূলে রইল পরস্পর বিরোধী শক্তির—বিনাশশীলতার ও সৃজনশীলতার—অমোঘ সম্ভাবনা। যতদিন দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হয়নি ততদিন এই বিরোধের রূপটা অস্পষ্ট ছিল এবং অর্থনীতির বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকশিত হওয়ার মতো বাস্তব অবস্থা যতদিন গড়ে ওঠেনি ততদিন এদেশীয়র পক্ষে আধুনিকতার পথে যাত্রার চেষ্টাও বিফল হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত হওয়ার অনেক আগেই, ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে, মির্জা ইংতেসাম অল-দিন নামে একজন বাঙালী ইংলণ্ডে গেছলেন মুঘল বাদশাহ শাহ আলমের প্রতিনিধি রূপে এবং আড়াই বছরেরও বেশি সেখানে কাটিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 'শিগ্‌রফ্‌নামা-ই-ওয়াইলায়ৎ' নামে ফার্সীতে লেখা গ্রন্থে তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালীন অভিজ্ঞতাবলীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে ব্রিটিশদের সমাজ ও সংস্কৃতির বিশদ পরিচয়ও পাওয়া যায়—১৩৪৪ বঙ্গাব্দে কলকাতার মুহম্মদী প্রেস থেকে মুজিবর রহমান খান-কৃত এ-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহ্‌তেসাম পশ্চিমে গিয়ে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও মানমন্দির স্বচক্ষে দেখে বিজ্ঞানে ও কারিগরীতে পাশ্চাত্য অগ্র-

স্থিতির বিষয়ে নিশ্চিত হন এবং পাশ্চাত্য পরিশ্রম ও বাস্তববুদ্ধির আদর্শ ও যাথার্থ্য অনুধাবনের জন্যে স্বদেশবাসীদের মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস পান। একই যুগে রঘুনাথ হরি নেভলকার স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন যে ভারতীয় রাজনীতিতে যেভাবে ইংরেজরা দ্রুত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হচ্ছে তার মূলে শুধু তাদের কূট বুদ্ধি-ই নেই, তার সঙ্গে আছে বিজ্ঞানে, কারিগরীতে ও শিক্ষায় তাদের শ্রেষ্ঠতা ; তিনি আরও বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় কর্তৃত্ব অর্জন করতে না পারলে ভারতবাসীর পক্ষে একালে টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। এই নেভলকার ছিলেন ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৬ পর্যন্ত ঝাঁসীর শাসক ও জন্মত মহারাষ্ট্রীয়।

মির্জা ইহ্‌তেসাম অল্‌-দিন ও রঘুনাথ হরি নেভলকার যখন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন তখনও এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি, ফলে তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর আবির্ভূত হলেন রামমোহন—উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সংগ্রাম শুরু করে তিনি ভারতবর্ষের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে শুরু করলেন।

এই আধুনিকতার লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য কী ? অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে চেতনার জাগরণ। এ-যাবৎ শাসনকর্মের সঙ্গে মুষ্টিমেয় যে-ক'জন জড়িত থাকত তাদের মধ্যেই এই দুটি বিষয়ে আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু মুষ্টিমেয়র সেই ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত অর্থাৎ ইহলৌকিক জীবনের সমগ্র স্তরে প্রতি স্ব-এর বা প্রাতিস্বিকের অধিকার তথা মূল্যের বিষয়ে চেতনার জাগরণেই আধুনিকতার জন্ম। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের দেশপ্রেম ছিল ধর্মভিত্তিক, কেননা দেশের সীমারেখা সম্বন্ধে দেশবাসীর তখনও কোনও স্পষ্ট ধারণাই ছিল না এবং এ-কারণে ভূগোলভিত্তিক দেশপ্রেমের চাইতে ধর্মভিত্তিক দেশপ্রেমই ছিল অধিকতর সত্য।

সেকালে দেশপ্রেম যদিও ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক তবু তখন ইহলৌকিক প্রসঙ্গে আগ্রহের বিলক্ষণ অনটন ছিল আর তাই ইহলৌকিক জীবনযাত্রাতে ধর্মের অর্থাৎ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মীয় প্রসঙ্গেরও গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল নগণ্য, ফলে ইহলৌকিক জীবনযাত্রায় ধর্মকে কেন্দ্র করে বিরোধের অবকাশও ছিল বিশেষভাবে সংকীর্ণ। কিন্তু বস্তুগত পরিস্থিতির পরিবর্তনে, আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বৈগুণ্যে প্রাক্তন ধর্মীয় বৈষম্য শুধু প্রকটই

হলো না, নবতর অর্থ-রাষ্ট্র-নৈতিক ও সে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার চাপে সে-বৈষম্য ক্রমশ পরিস্ফীত ও বিরোধমূলক হয়ে উঠল।

উক্ত বিভেদ-বৈষম্য যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কী রকমটি ছিল তা সহজেই বোঝা যায় এই পর্যায়ে সংঘটিত কৃষক উত্থানগুলির ধর্মীয় উপকরণের সমীক্ষায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে আঠারো শ সাতান্নের জনোত্থান পর্যন্ত যেসব কৃষক আন্দোলন হয়েছে সেগুলোর মধ্যে চোয়ার বিদ্রোহ, পাগলা-পন্থীদের বিদ্রোহ, তিতু মিঞার নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, ফরাজীদের বিদ্রোহ আর সাঁওতালদের বিদ্রোহই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

চোয়াররা ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে একবার ও ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে আর-একবার কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে উত্থিত হয় এবং প্রথমবারের নেতা ছিলেন বাঁকুড়ার রায়পুরস্থ প্রাক্তন জমিদার দুর্জন সিং ও দ্বিতীয়বারের নেতা ছিলেন মানভূমের প্রাক্তন জমিদার গঙ্গানারায়ণ—এটা লক্ষণীয় যে দুটি উত্থানের দুজন নেতাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্ব-স্ব জমিদারী অধিকার থেকে বঞ্চিত। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করলে গোড্ডা, পাকুড়, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের নতুন জমিদাররা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায় এবং ভাগলপুর-মুঙ্গের থেকে মুর্শিদাবাদ-বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয় কঠোর সামরিক আইন। চোয়ার ও সাঁওতাল—এই দুটি বিদ্রোহই ঘটে পশ্চিম বাংলাতে এবং স্পষ্টতই পশ্চিম বাংলা বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সংঘটিত উত্থানগুলি ছিল ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষক শক্তির বিরুদ্ধে। যেহেতু পশ্চিম বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু তাই এখানের কৃষক বিক্ষোভে মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনও পৃথক বা বিশেষ ভূমিকা ছিল না।

এবার পূর্ব বাংলার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি। পূর্ব বাংলার ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল-গুলিতে সংঘটিত পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ, তিতু মিঞার বিদ্রোহ ও ফরাজীদের বিদ্রোহ যাদের সহযোগিতাতে ঘটেছিল তাদের মধ্যে মুসলমানরাই ছিল নেতৃত্বে ও সংখ্যাতে প্রধান, কিন্তু এই কারণে এই কৃষক সংগ্রামগুলিকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যায় না। জেনে রাখা ভালো যে পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহে মৈমনসিংহের গারো, হাজং প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতি-গুলিও উল্লেখ্য অংশ নিয়েছিল এবং ওই উপজাতিদের ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমতলবাসী কৃষকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ও সাম্যের আদর্শ জাগিয়ে তুলেছিলেন দরবেশ করম শাহ ও তাঁর পুত্র পাগলা টিপু।

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম প্রান্তিক জনোত্থানগুলি ব্যতীত অন্যান্য

সমস্ত উত্থানের ধর্মীয় উপকরণে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য চোখে পড়লেও প্রকৃতপক্ষে এসবগুলোই মৌল প্রকৃতিতে ছিল নিতান্তই ব্রিটিশ বিরোধী নির্যাতিত ও প্রবঞ্চিত জনসাধারণের বা দৃঢ়ার্থে কৃষক সমাজেরই সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং ধর্মীয় বিভেদ সত্ত্বেও সেকালে কৃষক সমাজের মধ্যে যে অকপট ও আন্তরিক সামান্য সামাজিক বন্ধন ছিল তারই অকাট্য প্রমাণ।

একটি কথা মনে রাখা উচিত যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডেরই মধ্য-যুগীয় সমাজ ছিল বিশেষ ভাবে ধর্ম-প্রভাবিত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপের অন্তরঙ্গ ইতিহাস পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে সেখানে সংঘটিত অধিকাংশ সামাজিক আন্দোলনগুলির ধর্মীয় উপকরণ বিশেষ ভাবেই প্রবল ছিল এবং সমাজ জীবনে যন্ত্রের ভূমিকা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীর বাজারে যন্ত্রের ভূমিকা ও প্রভাব হয় অন্যরকম, তা বাঁকা ভাবে আসে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিযুক্ত পুঁজির স্বার্থে এবং তখন উক্ত সমাজে ধর্মের গুরুত্ব উত্তরোত্তর, বৃদ্ধি পায়—আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সোপান হিসেবে নয়—অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের লক্ষণ হিসেবে। আর তারই ফলে জনসাধারণের ধর্মাশ্রিত মনোভাবকে শোষণের গূঢ়তর স্বরূপ থেকে বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত করে সাম্রাজ্যবাদীর বৈষয়িক স্বার্থে চালনা করা সোজা হয়। এই সোজা কাজটাকেই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সম্পন্ন করেছে ব্রিটিশ শাসকেরা।

শাসক সম্প্রদায়ের চিরাচরিত সহায় পাইক ও করণদের নিয়ে এদেশে ব্রিটিশরা গড়ে তোলে প্রতিপত্তির ভিত্তি, তারপর অন্যান্য বর্ণহিন্দুদের ও মুষ্টিমেয় মুসলমানদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে নতুন ভূ-স্বামীদের শ্রেণী এবং অবস্থাগতিকে ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক হিসেবে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকশিত হয়ে ওঠে। দেশীয়দের নিয়ে এই যে ব্রিটিশের একটি পক্ষ গঠিত হলো তার বিপরীতে ব্রিটিশের বিপক্ষ রূপে রইল বাংলার কৃষক ও কারিগর সমাজ অর্থাৎ যারা কায়িম শ্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে তাদের প্রায় সকলেই আর পুরোনো বা চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ববর্তী জমিদারদের গোষ্ঠী এবং বাংলার বাইরে যেখানে পাশ্চাত্য তথা আধুনিক শিক্ষার আলো পৌঁছয়নি অথচ কোম্পানীর প্রবেশ ও, রাষ্ট্রনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে সেখানকার জনসাধারণের সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নির্বিশেষে প্রায় সমগ্র অংশ। এদেশে ব্রিটিশের সৃজন-শীল ভূমিকার বিষয়ে ব্রিটিশদের বিরোধী পক্ষ অবহিত ছিল না একথা সত্যি এবং এই বিপক্ষ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল শুধু স্বার্থান্বেষী ব্রিটিশের ঘোর

বিনাশশীল দিকটার নির্মম নিষ্পেষণ, সুতরাং তারা বিটিশকে সর্বৈব অমঙ্গলকর সত্তা হিসেবেই দেখেছিল এবং একাগ্র প্রতিজ্ঞায় অগ্রসর হয়েছিল এদেশ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের মূল উৎসাদন করার জন্যে।

ব্রিটিশের বিরোধী পক্ষের উনিশ শতকীয় সর্ববৃহৎ আন্দোলনটি সাধারণত সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই কি শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ ছিল? প্রথমে বিচার করা দরকার যে আদতে ঘটনাটি বিদ্রোহ ছিল কিনা। তখন পর্যন্ত মুঘল বাদশাহ-ই ছিলেন দেশের আইন-ও-ন্যায়-সঙ্গত শাসক, কিন্তু তাঁকে শিখণ্ডী খাড়া করে ক্ষমতার অপব্যবহার করছিল ব্রিটিশ শাসকরা। যে প্রকৃত শাসক নয়, শুধুই ক্ষমতা দখলদারী শাসক সেই কার্যত-শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রকৃত-শাসকের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামকে বিদ্রোহ বলা ভুল, কেননা যদি সেটা প্রকৃত-শাসকের বিরুদ্ধে উত্থান হয়ে থাকত তাহলেই শুধু ঘটনাটিকে বিদ্রোহ বলা চলত।

অতঃপর বিচার্য হচ্ছে যে এই উত্থান সিপাহীদের ছিল কি জনসাধারণের ছিল? ইংলণ্ডের তৎকালীন টোরী দলের নেতা বেঞ্জামিন ডিজরেলি ওই উত্থান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "The decline and fall of empires are not affairs of greased cartridges. Such results are occasioned by adequate causes, and by the accumulation of adequate causes." স্পষ্টতই কার্তুজের চর্বি বিষয়ে সিপাহীদের মনে সন্দেহ থেকে বিক্ষোভের জন্ম হয়েছিল এ-ব্যাখ্যা অলীক ও অবাস্তব। ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী 'সিভিল রিবেলিয়ন ইন দি ইণ্ডিয়ন মিউটিনিজ' আর 'থিয়োরিজ অব দি ইণ্ডিয়ন মিউটিনি' নামক গ্রন্থ দুটিতে কালানুক্রমে সংঘটিত ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে লখনৌ, মথুরা, এলাহাবাদ, মুজাফরনগর, সাহারানপুর, বান্দা, ঝাঁসী, ফরাক্কাবাদ, মোরাদাবাদ, বেরেলি, এটোয়া, সাহাবাদ, হামিপুর, সগর, জব্বলপুর বুদৌন, নর্মদার উত্তর ভাগ অঞ্চল এবং আরও অনেক অনেক স্থানে সিপাহীদের অস্ত্র তুলে নেওয়ার আগেই জনসাধারণ অস্ত্র তুলে নেয়; তারা প্রথমে ব্রিটিশ পক্ষের বেনিয়ান, মহাজন, নিলামদার ইত্যাদির উপরে আক্রমণ শুরু করে এবং অচিরেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে তহশিল, কুঠি, কাছারী, থানা প্রভৃতি ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের বুনিয়াদী কেন্দ্রগুলি। মীরাটে যেমন সিপাহীরাই আগে অস্ত্র ধারণ করে তেমনই পাঞ্জাবের কর্ণলে সিপাহীরা সংগ্রামে কোনও অংশ তো নেয়-ই নি

না, বরং সম্ভবত তারা বিরোধিতাই করে এবং সিপাহীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেখানকার জনসাধারণ উত্থিত হয়। সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের উত্থান থেকেই সিপাহীরা উত্থানের প্রেরণা পায় ও জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দেয়। জনসাধারণ ও সিপাহীদের সম্মিলিত উদ্যম হিসেবে আঠারশ সাতান্নের সংগ্রাম বিস্ফোরিত হয় বলেই তা অমন গভীর ও ব্যাপক রূপ লাভ করে। সুতরাং এই আন্দোলনকে সিপাহীদের বিদ্রোহ বলা দূরে থাক, শুধুমাত্র সিপাহীদের সংগ্রাম বলাও সত্যের অপলাপ এবং এটাকে একান্ত ভাবেই জনোত্থান বলাই সমীচীন।

ইয়োরোপেই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে; একই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় সুতরাং ভারতবর্ষের জনসাধারণ ১৮৫৭-তে যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয় তাতে কোন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব।

যাঁরা ওই সংগ্রামে জনসাধারণকে প্রথম প্ররোচনা জোগান ও পরেও জনসাধারণের মনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকে জিইয়ে রাখেন তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন মধ্যম বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূস্বামী অথবা জনসাধারণের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি, যেমন বেরিলির খান বাহাদুর খান, রংপুরের জালিয়ার খান, আজমগড় ঘোষণাকার রাজা', গোরখপুরের মৌলবী সরফরাজ আলী, ফৈজাবাদের আহমদ-উলনা, শাহজাহানপুরের শীতল সিং ও ঘনশ্যাম সিং প্রভৃতি—এঁদের প্রচেষ্টাতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নানা অঞ্চলে জনসাধারণ যখন সংগ্রাম শুরু করে তখন তারই প্রক্রিয়াতে বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব ঝাঁসীর রানি, কুঁয়র সিং প্রভৃতি নেতা রূপে উদ্ভূত হন; অর্থাৎ প্রধান নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক ষড়যন্ত্রের ফলে ১৮৫৭-র অভ্যুত্থান তো হয়ইনি, বরং সংগ্রামী পরিস্থিতির তথা জনসাধারণের জাগরণের চাপেই আবির্ভাব হয় প্রধান নেতাদের এবং তাঁরা একতাবদ্ধ হন।

আবার ওইসব প্রধান নেতাদের মধ্যে যাঁর নামের মাহাত্ম্যে বিভিন্ন অঞ্চলের ইতস্তত সংগ্রাম সবচাইতে বেশি সমন্বিত হয় তিনি হলেন মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ, অথচ তিনিই একদা সাহসান-উলনা খানের মাধ্যমে ব্রিটিশদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতামূলক বোঝাপড়ার জন্যে যোগাযোগ করেছিলেন, যদিও তিনিই আবার ঘোষণা করেন, 'এই পবিত্র সংগ্রাম হলো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।' প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর শাহ ছিলেন শান্তিপ্রিয়, নির্বিরোধ, অব্যবস্থিত চিত্তের ও

চরিত্রের সরল মানুষ এবং এতো বড়ো একটা সংগ্রাম শুরু করার সাহস ও সংগঠনী ক্ষমতা কোনটাই তাঁর ছিল না।

ঘটনাবলীর আবর্তন সম্ভবত খানিকটা তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই কিংবা তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁকে তুলে ধরে নাটকের নায়করূপে এবং তখনও দ্বিধান্বিত চিত্তেই তিনি নায়কের ভূমিকা পালন করেন।

বাহাদুর শাহ যেমন মুঘল শক্তির প্রতিভূ ছিলেন তেমনই মারাঠা শক্তির প্রতিভূ ছিলেন নানা সাহেব। ঔরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন যে-শক্তির উদ্ভব হয় ও মুঘলদের পতনের পরবর্তী একশ বছর ভারতবর্ষের ইতিহাস যে-শক্তির অবিসংবাদিত প্রাধান্যে বিশিষ্ট তা হলো ওই মারাঠা শক্তি। একশ বছর ধরে যে ঢুটি শক্তি সবচাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিযোগী ছিল সে ঢুটি শক্তি আঠারোশ সাতান্নর জনোত্থানের দাবিতেই পরিণত হলো পরস্পরের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সহযোগীতে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে জনসাধারণের জীবনে ধর্মীয় উপকরণ বিরোধের কারণ ঘটায়নি বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রধানদের জীবনে তা বহুলাংশে বিরোধের ইন্ধন জুগিয়েছে এবং এদিক থেকে মারাঠা শক্তির ছিল একটা সুস্পষ্ট ভূমিকা।

একটা পর্যায়ে মারাঠা শক্তি ও মুঘল শক্তির সংঘর্ষ ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় শক্তির সংঘর্ষ, তথাপি এই ঢুটি শক্তি যে নানা সাহেব ও বাহাতুর শাহের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সমন্বিত হলো এই সরল সত্যটির গুরুত্ব অপরিসীম। এর থেকে এইটেই অমোঘ রূপে প্রমাণিত হয় যে ক্ষুদ্রতর পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় শক্তির মধ্যে ধর্মীয় উপকরণের মূল্য থাকলেও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তা মূল্যহীন এবং সেখানে যা মূল্যবান হয়ে ওঠে তা হলো জনসাধারণের অভিপ্রায় ও অভিলাষ।

আঠারোশ সাতান্নর উত্থানটা যখন প্রধানত সিপাহীদের নয়, বাহাদুর শাহ বা নানা সাহেবের মতো বৃহৎ ভূস্বামীদেরও নয়, উত্থানটা যখন প্রধানত জনসাধারণেরই তখন তাদের মনোভাব তাদেরই নিকটতর নেতাদের ঘোষণা-গুলিতেই প্রতিফলিত হবে। জনসাধারণের সেইসব নিকটতম নেতাদের ধর্মীয় উপকরণ সম্বন্ধে মনোভাব কী ছিল?

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আজমগড় ঘোষণার উল্লেখ করা কর্তব্য যা ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৭-তে দিল্লীর গেজেটে প্রকাশিত হয়; কিন্তু এই ঘোষণা ওই বছর বসন্ত ঋতুর শেষেই চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। 'অবিশ্বাসী ও প্রতারক ইংরেজদের স্বেচ্ছাচারিতায় ও অত্যাচারে যে এযুগে হিন্দুস্তানের জনসাধারণের,

হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই, সর্বনাশ সাধিত হয়েছে একথা সর্বজনবিদিত।' 'রাজা'র নামে প্রচারিত এই ঘোষণায় বলা হয়, ঘুরতে ঘুরতে আমি এখানে এসেছি দেশের এই পূর্ব অঞ্চল থেকে অবিশ্বাসীদের বিতাড়ণের জন্যে, লৌহ শাসনের অধীনে যেসব দরিদ্র অসহায় জনসাধারণ কাতরাচ্ছে তাদেরকে মুক্ত ও রক্ষা করতে।' পুনঃপুনঃ জনসাধারণের পরিচয় বোঝাতে একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের উল্লেখ আজমগড় ঘোষণার বৈশিষ্ট্য। 'একথা সকলের জানা থাকুক যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই প্রাচীন কীর্তি', এই ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'এবং জ্যোতির্বিদের, পণ্ডিতদের গণনা সমস্তই নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করছে যে ভারতবর্ষে ইংরেজদের আর পা রাখার জায়গা থাকবে না। সুতরাং ইংরেজদের আধিপত্য বজায় থাকবে এমন দুরাশা সকলেরই ত্যাগ করা উচিত।

এই ঘোষণার পাশাপাশি বেরিলির নবাব খান বাহাদুর খানের ভাষণটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ওদের পদ্ধতি হলো চালাকি আর লোকঠকানো ধাপ্পাবাজি। আমাদের রাজাদের দেশ আর রাজ্য কি ওরা একে একে গ্রাস করেনি! নাগপুর রাজ্য কারা কেড়ে নিল? লখনৌ রাজ্য কারা কেড়ে নিল? হিন্দু আর মুসলমান দুজনাকেই পায়ের নিচে ফেলে পিষছে কারা? তোমাদের রক্তের স্রোতে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজের নাম ধুয়ে দাও।'

১৮৫৭ র জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজ শহরের বুকে যে প্রাচীর-পত্র সেঁটে দেওয়া হয় তা ফৈজাবাদের মৌলবী আহমদ উল্লার রচনা বলে অনুমান করা হয়। তাতে লেখা ছিল, 'দেশবাসীরা, এবং নিজের নিজের ধর্মের প্রকৃত বিশ্বাসীরা, ফিরিঙ্গি কাফেরদের তাড়াবার জন্যে জাগো, এক হয়ে সবাই জাগো। ওরা সুবিচারকে পায়ের নীচে ফেলেছে, আমাদের স্বরাজ চুরি করেছে।' এরপরে সরাসরি উসকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুপণ লড়াইয়ের পথে। 'এখন কাফের ফিরিঙ্গিদের দুঃসহ স্বেচ্ছাচারিতার থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচাবার একটাই পথ আছে এবং সেই পথ হলো রক্তাক্ত সংগ্রাম সুরু করা। এ হলো স্বাধীনতার জন্যে জেহাদ। এ হলো সুবিচারের জন্যে একটা ধর্মীয় সংগ্রাম।'

আর গোরখপুরের মৌলবী সরফরাজ আলী শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেন, 'ঠিক একশ বছর আগে অবিশ্বাসীদের শাসন সুরু হয় এবং আমি তোমাদের জানাচ্ছি যে এবারে সেই শাসন শেষ হবেই।'

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে আঠারোশ সাতান্নর যে সংগ্রাম তার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দখলদারী ইংরেজ শক্তিকে ভারতবর্ষের মাটি থেকে উৎখাত

করা। তখন ভারতবর্ষ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ কিরীটের অধীনস্থ হয়নি, সুতরাং স্বাধীনই ছিল অর্থাৎ ওই সংগ্রাম ছিল দৃঢ়ার্থে মুক্তির সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার ফলেই ভারতবর্ষ পরাধীন হলো। 'অধিকাংশ অঞ্চলেই পৃথক পৃথক নেতার পরিচালনায় সিপাহীদের ব্যাপক উত্থানের আগেই জনসাধারণের অসন্তোষ সশস্ত্র প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের রূপ নেয় এবং তার পরে সিপাহীরা তাতে অংশ নেয়। এই সিপাহীরাও সমাজ ও সংস্কৃতির সূত্রে ছিল দেশীয় জনসাধারণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, শুধুমাত্র জীবিকার সূত্রে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যা তারা প্রথম সুযোগেই ছিঁড়ে ফেলে জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের একাত্মকরণ সম্পন্ন করেছিল।

এই সংগ্রামের কোন কোন নেতা আঞ্চলিক ভিত্তিতে তৎপর ছিলেন বটে, কিন্তু ফৈজাবাদের মৌলবী, তাঁতিয়া টোপী, রাও সাহেব, কুঁয়র সিং, ফিরোজ শাহ, ঝাঁসীর রানি প্রভৃতি যে আপন আপন অঞ্চলের বাইরে গিয়ে অন্যান্য নেতার অধীনস্থ অঞ্চলেও যুদ্ধের প্ররোচনা জোগান ও উত্তেজিত জনসাধারণকে সংগঠিত করেন একথা সর্বজনস্বীকৃত; মৈনপুরীর রাজা তেজ সিং পার্শ্ববর্তী ফররুক্কাবাদের নবাবের সঙ্গে আঁতাত করেন; আবার ভোগিনপুরের মাধো সিং, নসরৎপুরের বেণী বাহাদুর সিং, গোলাপ সিং প্রভৃতি দলপতিদের নিয়ে নবাব-গঞ্জের নায়েব চাকলাদার রাহুলামিন যে মহাজোট গড়ে তোলেন তাতে সুগ্রাম সিং, ফকির বক্শ, বুন্দির ঠাকুরানি, শ্যামপুরের রানি প্রভৃতি নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করে দিতেন এবং নায়েব-চাকলাদারকে সর্বতোরূপে সাহায্য করার জন্যে লখনৌ থেকে প্রচারিত এক ইশতাহারে তালুকদার ও জমিদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়; অনুরূপ ভাবে সুলতানপুর ও ফৈজাবাদের সমস্ত তালুকদারই সক্রিয় সমর্থন জানান সুলতানপুরের নাজিম মেহেদি হাসানকে এবং ওই সমর্থনের জোরেই লখনৌয়ের পথে জেনারেল ফ্রাঙ্কের বিপুল শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে মেহেদি হাসান দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আঠারো শ সাতান্নের সংগ্রামে এ জাতীয় নজির অসংখ্য।

জনসাধারণের নিকটতর নেতারা যেমন আপন আপন অঞ্চল বহির্ভূত অঞ্চলেও সক্রিয় ছিলেন তেমনই উচ্চতর স্তরের নেতারাও এই সংগ্রামকে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দেশ হিন্দুস্থানের থেকে অদ্বিতীয় ও সামান্য শত্রু ইংরেজ বিতাড়নের সংগ্রাম রূপেই অনুধাবন করেছিলেন এবং এই সংগ্রামের সামগ্রিক প্রতিমানে গুজর, রংঘর ও রোহিলাদের বিশৃঙ্খল আচরণ নিতান্তই ব্যতিক্রান্ত ও বিভ্রান্ত ঘটনা। মারাঠাদের নেতা স্বয়ং নানা সাহেব তাঁর বিখ্যাত ঘোষণাতে

স্পষ্টই বলেছেন যে কাফরদের ধ্বংস করার জন্যে এবং হিন্দু-মুসলমানের পুরানো রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যেই তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন। লক্ষণীয় যে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে 'ইংরেজ' বোঝাতে 'কাফর'শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ঘোষণাতে এই সংগ্রামের যে রাজনৈতিক আদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে তা এই যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে পুরনো নবাবরা ও নৃপতিরা, মুঘল সম্রাট ও মারাঠা পেশোয়া অর্থাৎ দেশের ঐতিহ্যসম্মত শাসকরা আপন আপন কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ফিরে পাবেন।

দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী যে দেশপ্রেমের কথা আধুনিক মানুষের পরিজ্ঞাত তার অভাবেই দেশের অথবা ধর্মীয় চেতনা ও গরিমার ভিত্তিতে সেকালের দেশপ্রেম ছিল সামন্ত-কেন্দ্রিক এবং সেইজন্য জনসাধারণের মধ্যে যে দুটি ধর্মমতের প্রভাব প্রবলতর ও প্রশস্ততর ছিল সে দুটির অনুসারীদের অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের নাম জনসাধারণের সংজ্ঞারূপে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু সে উল্লেখ তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিরোধী অস্তিত্বের প্রমাণ নয়, বরং বৃত্তি অনুসারে বহু বর্ণ বিশিষ্ট হিন্দু সমাজের সহাবস্থানের নীতিসম্মত একটা আদর্শ-ব্যবস্থার অনুরূপ অন্তিম সত্যের বা পরম দিব্যশক্তির কল্পনা অনুসারে বহু ধর্ম বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজের বিন্যাসগত একটা বাস্তব ব্যবস্থারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।

প্রায় এক শ বছর আগে সন্ন্যাসীফকির আন্দোলন নামে বাংলা যে জনোত্থান হয়েছিল তার কেন্দ্র ছিল রংপুর এবং আঠারো শ সাতান্নতেও সেই রংপুরের অধিবাসীরা ব্যাপক হারে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশ নেয়— এর উল্লেখ পাওয়া যায় ৩০শে অক্টোবর ১৮৫৭-তে নিউইয়র্ক ট্রিব্যুন পত্রিকায় প্রকাশিত কার্ল মার্কসের প্রবন্ধে, তদুপরি 'উদ-ই-হিন্দে'ও রংপুরস্থ তনকোর নবাব তালিয়ার খানের দু ছেলের দিল্লিতে ব্রিটিশদের গুলিতে মৃত্যুর কথা বলেছেন গালিব। সেইবারে ব্রিটিশের স্বার্থ সংরক্ষণে দেশীয় পক্ষের কলেবর ও অভিপ্রায় ছিল অস্পষ্ট; কিন্তু এবারে, প্রায় একশ বছরের মধ্যে, ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষকরূপে দেশীয় পক্ষ ব্যবসায়ী, জমিদার ও পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের নিয়ে একটা সুস্পষ্ট ও প্রভাবশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হয় যাদেরকে অভিহিত করা হতো বাবু সম্প্রদায় বলে। স্বাভাবিক কারণেই বাঙালী বাবুরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানানো দূরের কথা সহ্যও করতে পারেনি, তাই ওই সংগ্রামের প্রতি অভিযোগে বাবু সম্প্রদায়ের পাঁচ মুখ গজিয়েছিল বলা যায়—আর রংপুরের রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত জাগের

গানে জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বাবুদের মনোভাবকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে,

রাজবংশী মুসলমান গেলা ইংরাজ মারিবার
বাবুগণ আসিল তার মজা দেখিবার।

সন্ন্যাসীফকির আন্দোলন হয়েছিল মুখ্যত উত্তর বাংলায় এবং আঠারো শ সাতান্নের আন্দোলন হয় মুখ্যত উত্তর ভারতে, কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীতে যা ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে তারই পুনরাবৃত্তি হলো বৃহত্তর ও জটিলতর আকারে। ১৮৪৭ নাগাদ বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বহুতর কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃততর হয়, কিন্তু দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনে সেসব কারণ ছিল অনুপস্থিত, ফলে জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক ছিল ঐক্যমূলক।

এজন্যে সীমানাশ্রয়ী দেশপ্রেমের অভাবে সেই ধর্মাশ্রয়ী দেশপ্রেমের যুগে আজমগড় ঘোষণার মতো দিল্লীর ঘোষণাতেও বলা হয়েছে, 'দিল্লী ও মীরাটে উপস্থিত সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মচারীরা সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান হিন্দুস্তানের নাগরিক ও সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পাঠাচ্ছে : একথা ভালো ভাবেই জানা আছে যে ইদানীং ইংরেজরা ঘোর অশুভ পরিকল্পনা নিয়েছে—প্রথমত, হিন্দুস্তানী বাহিনীর ধর্মনাশ করা, আর তারপরে জনসাধারণকে খ্রীস্টান হতে বাধ্য করা।' খ্রীস্টান ধর্মকে সেকালে দেখা হতো ইয়োরোপীয় বা ইংরেজদের ধর্ম হিসেবে, পক্ষান্তরে জনসাধারণের বা হিন্দুস্তানীদের ধর্ম বলতে হিন্দু ও ইসলাম দুটি ধর্মকেই যে বোঝানো হতো সে কথা এই ঘোষণাতেও পরিষ্কার এবং তখনকার কালে 'ভারতীয়' শব্দের বদলে 'হিন্দুস্তানী' শব্দটিই ব্যবহার করা হতো; আরও প্রকাশ থাকে যে সেকালে খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা ছিল ইংরেজ জাতিবাচক আর হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছিল হিন্দুস্তানী তথা ভারতীয় জাতিবাচক অর্থাৎ ধর্মের হিসেবেও জাতি বলতে ইংরেজ ও হিন্দুস্তানী এই দুইমাত্র জাতিকেই বোঝানো হতো। একারণে উল্লিখিত ঘোষণাতে পরিষ্কারভাবে নিধারণ করা হয়, 'এটা আরও প্রয়োজনীয় যে এই সংগ্রামে হিন্দু ও মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, এবং মাননীয় ব্যক্তিদের নির্দেশে নিজেদের সুস্থিত রাখবে যাতে সুশৃঙ্খলা বজায় থাকে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্ররা সন্তুষ্ট থাকে এবং তারা মর্যাদাতে উন্নীত হয়।' ঘোষণাটির নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে সমস্ত পরিস্থিতিকে হিন্দু ও মুসলমানরা একই দৃষ্টিকোণ থেকে

গ্রহণ ও বিচার করবে, সেই অনুসারে জনসাধারণ কর্মপদ্ধতি স্থির করবে এবং উভয় ধর্মাবলম্বীরই মূল্যায়ন হবে একই প্রতিমানে অর্থাৎ একাধিক ধর্ম সম্বলিত একই হিন্দুস্থানী তথা ভারতীয় জাতি হিসেবে।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জোব চার্ণক হুগলী নদীর উজান বেয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছনোর পর থেকে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালীদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই প্রথম এক শ বছরে তা প্রীতির সম্পর্ক হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে অর্থনীতি ক্ষেত্রে বাংলার বর্ণ হিন্দুদের একটা উল্লেখ্য অংশ স্পষ্ট করে ব্রিটিশের সহযোগী সম্প্রদায়রূপে বিকশিত হতে থাকে, তবু বাংলার বৃহত্তর জনসাধারণই থেকে যায় ব্রিটিশের অনমনীয় বিরোধী সম্প্রদায় রূপে। পরে যখন উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আধুনিকতার পাঠ নিল তখন স্বভাবতই তার গুরু ব্রিটিশের প্রতি তার গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা জন্মায়। যেহেতু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দুপ্রধান তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বহুলাংশে ব্রিটিশের স্বার্থে নিজেদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের প্রতিফলন দেখতে পেল এবং এর ফলে বাংলার জনসাধারণের কলকাতা-কেন্দ্রিকসমাজ তথা অগ্রসর আধুনিক সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসে ব্রিটিশের হিতাকাঙ্ক্ষীর ভূমিকা বিশ্বস্ত ভাবেই পালন করে আর এই ভূমিকার তাৎপর্য অনুধাবন করে' তার সদ্ব্যবহারে ব্রিটিশ শাসকেরাও শিথিলতা দেখাননি। আবার এই সমাজ আশ্রয় করেই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাগরণ সূচিত হয়, ফলে সামগ্রিক ভাবে উল্লিখিত জাগরণে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই এবং এক্ষেত্রেও তারা লাভ করে ইউরোপীয় জনহিতৈষীদের উৎসাহ ও সাহায্য; অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে মূলত হিন্দু সমাজই রূপান্তরিত হয় ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে তথা অগ্রসর আধুনিক সমাজে।

পক্ষান্তরে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে গ্রাম-কেন্দ্রিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী বৃহত্তর জনসাধারণ নির্মম ভাবে আধুনিকতার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে ও তার ফলে ইতিহাসের প্রবাহ থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই জন সাধারণ যে মুসলিম-প্রধান সেকথা সর্বদা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ ধর্মীয় উপকরণের বিচারে হিন্দুদের চাইতে মুসলিমরাই রইল ব্রিটিশের পরম শত্রু হিসেবে। কিন্তু ধর্মীয় সত্তার বিচার না করে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সত্তার বিচার করলেও দেখা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীতেও যখনই বৃহত্তর জনসাধারণ খানিকটা প্রস্তুত হতে পেরেছে তখনই প্রতিপক্ষের ঐতিহাসিক শক্তির পরিমাপ না করেই বিস্ফোরিত

হয়েছে সশস্ত্র বিক্ষোভে, ফলে জনসাধারণ অভিমুখে ব্রিটিশ শাসকদেরও মনোভাব ছিল বিশেষ রূপেই প্রতিকূল এবং ব্রিটিশ শাসকরাই বিবাদী জনসাধারণের ধর্মীয় উপকরণ বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার সূত্র আবিষ্কার করে। বাংলার মুসলিম-প্রধান জনসাধারণের তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আঠারো শ সাতান্নর সংগ্রামে একটা সর্বভারতীয় রূপ পায় এবং হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কতদূর বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে সে সত্যই উদঘাটিত করে।

আঠারো শ সাতান্নর সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা জয়ী হওয়ার পরে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কিরীটের অধীনে এনে খুব সুপরিকল্পিত ভাবে ভারতীয় জনসাধারণের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করার অভিযান শুরু করল ব্রিটিশ সরকার। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই অভিযান শুরু করার জন্যে সবচাইতে উপযুক্ত ক্ষেত্র জোগাল বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি। এখানকার কায়িক শ্রমজীবী জনসাধারণ মুসলিম প্রধান হলেও এখানকার অবস্থাপন্ন অগ্রসর সমাজ ছিল হিন্দু-প্রধান, সুতরাং ওই অগ্রসর সমাজকে সর্বতোরূপে জন-সাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন করা ব্রিটিশদের পক্ষে সুবিধাজনক ও সহজতর হলো। সরলকৃত করে এই বিচ্ছিন্নতাব কাহিনী এইভাবে বর্ণনা করা যায়: পাইক ও করণদের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে ব্রিটিশরা বাংলায় প্রাচ্যের প্রধান ঘাঁটি বা ঘট্টস্থল স্থাপন করে এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে করণরা বিত্তবান হয়ে উঠতে থাকে; তখন অন্যান্য বর্ণহিন্দুরাও ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের সৌভাগ্য গড়ে তোলা শুরু করে এবং সেই সৌভাগ্যের দৌলতে তারা অচিরেই নতুন জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়; আর একই প্রক্রিয়ার ভিতর থেকে মধ্যযুগীয় খোলস ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে দেশীয় অগ্রসর সমাজ ইংরেজী বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গুণগ্রাহী রূপে; এবং একই সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের বহু কীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হলে অগ্রসর সমাজ সেগুলিতে লাভ করল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নিরপেক্ষ আত্মগৌরবের অবলম্বন। যেহেতু ওই সমাজ ছিল হিন্দু-প্রধান তাই ওই গৌরবকে দাবি করা হলো হিন্দু গৌরবের ভিত্তি রূপে—অর্থাৎ হিন্দুত্বে গৌরবান্বিত ইংরেজী শিক্ষিত অগ্রসর ভাগ্যবান সমাজ হয়ে উঠল একটি প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[রাজনৈতিক চেতনার জন্ম ও রামমোহন—ভারতীয় বোধের জন্ম ও কেশবচন্দ্র—আধ্যাত্মিক সমন্বয়বাদ ও রামকৃষ্ণ—জাতীয়তাবাদের জন্ম ও তার ধর্মীয় রূপ।]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে বৃহত্তর জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অগ্রসর হলো অর্থনৈতিক বিচারে তাদের নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে তাদের নাম ব্রিটিশের সহযোগী, সাংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাম পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, সামাজিক বিচারে তাদের নাম বাবু সম্প্রদায় বা ভদ্র শ্রেণী, আবার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়। অধিকাংশ সময়ই এই নামগুলি শিথিল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৮২৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ রেগিনল্ড হেবের ন্যারেটিভ অব জর্নি ফ্রম ক্যালকাটা টু বম্বে' নামে ভ্রমণকাহিনীতে বারবার উল্লেখ করেছেন যে সেকালের ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত বাঙালীদেরও ইংরেজদের মতোই বিদেশী মনে করত, এবং ১৮৫৪-র জনোত্থানের সময় বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ যে বাঙালী বাবুদেরও ইংরেজদের মতোই দেশের শত্রু মনে করত তার বহুতর প্রমাণ ও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ১৮৫৭-র জনোত্থানের ফলে বাঙালী পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী খুবই বিপন্ন বোধ করে, কেননা এই উত্থান ছিল সর্বতোভাবে তাদের স্বার্থ ও স্বপ্নের বিরোধী, তাই যখন এই উত্থানকে দমনে ইংরেজরা সমর্থ হলো উল্লসিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেন :

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।

এর থেকে সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ব্রিটিশের সহযোগী মানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, অথবা বাবু সম্প্রদায় মানে ভদ্রশ্রেণী অর্থাৎ প্রগতিশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের যথার্থ মনোভঙ্গি অনুমান করা যায় এবং এই মনোভঙ্গিসম্পন্ন সমাজের মানসেই জন্ম হয় তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো রাজনৈতিক চেতনা। শাসিতের প্রতি শাসকের সেবার মনোভাবে নয়, শাসনকর্মে শাসিতেরও অংশ গ্রহণের যে

অধিকার তার স্বীকৃতিতেই অথবা সম্বন্ধে শাসিতের চেতনাতেই রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত।

দেশবাসীর ভাগ্য বিবেচনায় যে-কোনও একজন শাসিতের যে মতামত দেওয়ার ও তর্ক করার অধিকার আছে এই সত্য রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেন এবং সে অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রসর হন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত প্রেস অর্ডিন্যান্স-এর প্রতিবাদে। শাসিতের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম রামমোহন রায় শুরু করেছিলেন তার বিস্তার ও বিকাশ লক্ষিত হয় পরবর্তী সওয়া শ বছরের ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে। রামমোহনের মননের পথে ঐ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ। ডিরোজিয়োর ধমনীতে ছিল পোর্তুগিজ শোণিত এবং তাঁর ধর্ম ছিল খ্রীষ্টনীতি, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র নিজেকেই ভারতীয় বলে গণ্য করতেন না, ভারতপ্রেমের শিক্ষা দেওয়াকে তিনি জীবনের অন্যতম ব্রত বলে গণ্য করেছিলেন, তবে তাঁর শিক্ষার মূল কথা ছিল সমস্ত কিছুকে মুক্ত বুদ্ধিতে বিচার করা এবং চিত্তকে ভয়শূন্য করা। সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এক অখণ্ড প্রেমাস্পাদ সত্তা হিসাবে ধারণ করে তার উদ্দেশে রচিত যে-কাব্য একালে দেশপ্রেমের কাব্য বলে পরিচিত সেই কাব্যের গোমুখী ডিরোজিয়োর লেখনীতেই প্রথম উন্মুক্ত হয়। রামমোহনের গুণগ্রাহী দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি এবং ডিরোজিয়োর গুণগ্রাহীরা পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন—এ দুটোই ভারতবর্ষের প্রথম দুটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অচিরেই মর্মান্তিক সত্য পরিস্ফুট হলো যে বিচ্ছিন্নভাবে এ দুটি প্রতিষ্ঠান কোন মতেই সুসংহত ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না, তাই ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দুটিকে যুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করা হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ ছিল ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে সর্বভারতীয় স্বার্থকে প্রতিফলিত করার দিকে এবং কেমন করে এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তিকালে গঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনল কংগ্রেসের কাজকে এগিয়ে ও সহজ করে দিয়েছিল সে সম্বন্ধে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'হিষ্ট্রি অব ফ্রীডম মুভমেণ্টে বিশদ আলোচনা করেছেন।

কি মনে রাখতা ও উচিত যে সেকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ভাষাভাষীর মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্কের চাইতে বৈরিতার সম্পর্কই ছিল বেশি। বাঙালী রাজপুতদের মধ্যে মারাঠা অভিযাত্রীদের ধ্বংসলীলার স্মৃতি

তখনও তাজা ছিল; হিন্দুস্থানীদের কাছে বাঙালীরা পরিগণিত হতো ইংরেজদের সমান শত্রু; এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত দুঃসাধ্য ও বিপদ-সঙ্কুল ছিল; দু অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষার ব্যবধানের জন্যে ভাবের আদান প্রদান ছিল অকল্পনীয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের বোধ্য ভাষা হিসেবে ফার্সী সেকালে গুরুত্ব হারাতে বসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতবর্ষে ভারতীয় ছাড়া আর সকলেই ছিল—পাঞ্জাবী ছিল, মারাঠি ছিল, বাঙালী ছিল, রাজপুত ছিল, কিন্তু এরা কেউই আপন আঞ্চলিক পরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করত না, এরা কেউই আধুনিক অর্থে ভারতীয় ছিল না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে অবকাশ রাখা হয়েছিল, তবে তেমন কোনও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির জন্যে বাস্তবভিত্তি ছিল সেকালে নিতান্তই অস্পষ্ট। ১৮৫৭-র গুনোত্থানই সর্বপ্রথম সীমিত অর্থে সে-ভিত্তি গড়ে তোলে—এক সামান্য শত্রুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলবাসীদের মধ্যে বিক্ষুব্ধ আবেগের সাযুজ্য সম্পন্ন করে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ; ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কতকাংশে বাঙালী ও দক্ষিণ ভারতীয়দের বাদ দিয়ে আবেগের সাযুজ্যে এক নতুন বোধ জন্মলাভ করল যাকে বলতে পারি ভারতীয় বোধ।

সীমিত অর্থে যে ভারতীয় আবেগের জন্ম হলো তা ব্যাপকতর রূপ লাভ করল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ভ্রমণে। তিনি গেছলেন ধর্মপ্রচারের জন্যে এবং তাঁর বক্তৃতাগুলি ওই সব অঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা জাগিয়েছিল তার ফলে মাদ্রাজে বেদ সমাজ ও বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ নামে ব্রাহ্মাদর্শে অনুপ্রাণিতদের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁর ধর্মপ্রচারের জন্যে এই অভিযানটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তার মধ্যে নিহিত ছিল এক ও অখণ্ড ভারতীয় সত্তাকে অনুধাবন করার প্রথম সচেতন প্রয়াস। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন—এই সমাজের নামকরণে 'ভারতবর্ষীয়' শব্দটির প্রয়োগও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এর মধ্যে চেতনার যে নূতনত্ব ছিল তার অনুসরণে পরে তিনি 'ভারতবর্ষীয়' শব্দটির বদলে 'নববিধান' শব্দটি গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ বিভিন্নদেশীয় বিভিন্নধর্মীয় নরনারীর বাসস্থান। এখানে কত প্রকারের ধর্মমত এবং শাস্ত্র সম্মানিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। আমরা সেই সকল শাস্ত্র দর্শন করিলে

নিশ্চয়ই উপকৃত হইব, কারণ তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস ভক্তি বিবৃত আছে। সকল ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা কেবল মাত্র একদেশ-দর্শীর ন্যায় একটি ধর্মের শাস্ত্রে সম্মান প্রদর্শন করি, তবে আমরা নিজেরাই নিজ আত্মার বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে এবং ভারতমাতার বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হইব।' সমগ্র ভারতের প্রতি মাতৃত্ব আরোপের দৃষ্টান্ত প্রতাপচন্দ্রের আগে কারও বচনে বা রচনায় পাওয়া যায় না।

অতঃপর কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শহরেও ভ্রমণ করেন ও বক্তৃতা দেন এবং শেষে ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে ইংলণ্ডেও যান। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 'সামান্য মধ্যবিত্ত বাঙালী নিজের কেবল মনীষা ও প্রতিভাবলে বিলাতকে কাঁপাইয়া, মাতাইয়া তুলিয়া ছিলেন, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরীর নিকটে রাজযোগ্য সম্মান পাইয়াছিলেন, ইহাতে কেবল বাঙ্গালীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর চিত্ত গৌরবে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।' এর পরে লিখেছেন, 'এই স্বাজাত্যাভিমান সর্বত্রই জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় আত্মচৈতন্যের সূচনা করে। কেশবচন্দ্র এইরূপে আমাদের বর্তমান ভারতের বৃহত্তর জাতীয় প্রচেষ্টার ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মৃত্যু প্রসঙ্গে হেনরী কটনের যে-মন্তব্য ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার উদ্ধার করেছেন সেটির গূঢ়ার্থ বিশেষ অনুধাবনযোগ্য 'The residents of all parts of India irrespective of caste and creed, united with one voice in the expression of sorrow at his loss and pride in him as one common nation.'

অবশ্য সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ একালে সবচাইতে অকাট্য রূপে, প্রতিফলিত হয় রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে ও বাণীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে উদ্ভূত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিতে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও প্রবল পরোক্ষ প্রভাব ছিল। ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা বেদান্ত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সত্যের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে বিতর্কে ও বিরোধে বহুকাল ধরে ভারতীয় জ্ঞানীরা উপক্রত হয়ে এসেছেন; আপাত অশিক্ষিত রামকৃষ্ণ বহু শতাব্দীর দার্শনিক জটগুলিকে কেমন করে খুলেছেন তার অত্যন্ত নিপুণ বিশ্লেষণ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করেছেন 'ক্লাসিকল ইণ্ডিয়ন ফিলজফিজ, দেয়ার সিনথীসিস ইন দি ফিলজফি অব শ্রীরামকৃষ্ণ' নামক গ্রন্থটিতে। কিন্তু রামকৃষ্ণ শুধু ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনের অন্তর্নিহিত কূট তর্কগুলিরই

উদ্ভাসক সমাধান করেননি, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বাইরের থেকে আগত বিভিন্ন ধর্মের সত্যগুলিতেও যে-বৈষম্য সহজেই লক্ষিত হয় তারও স্বভাব-সম্মত ব্যাখ্যা ও সমন্বয়ের সূত্র দিয়েছেন আপন অননুকরণীয় ভঙ্গিতে।

কেশবচন্দ্র যখন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের কারণ জানতে চেয়েছিলেন তখন রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'এই পৃথিবীতে এটা আমার জমি ও এই আমার বাড়ি বলে ঘিরে বসে থাকে, কিন্তু ওপরে সেই এক অনন্ত আকাশ, সেখানে যেমন কেউ ঘিরতে পারে না, তেমনি মানুষ অজ্ঞানে আপনার আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে বৃথা গোলমাল করে। যখন ঠিক ঠিক জ্ঞানলাভ হয় তখন আর পরস্পরের বিবাদ থাকে না।' তাঁর উক্তিগুলোতে অধীত বিদ্যার প্রচার নেই, যা আছে তা হলো জনসাধারণের বাস্তব জীবনের সম্বন্ধে বা সেই জীবনের সঙ্গে সরাসরি ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অমোঘ প্রকাশ। অন্যত্র তিনি বলেছেন, যে যারা ঈশ্বরানুরাগী—তাদের ভেতর কোনরূপ দলাদলি থাকে না, যেমন পুষ্করিণী বা গেড়ে ডোবায় দল জন্মায়, নদীতে কখনও জন্মায় না। আবার বলেছেন, 'ভগবান এক, সাধক ও ভক্তেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও রুচি অনুসারে তাঁর উপাসনা করে থাকে।' এরকম ভাবে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সত্যকে অনুধাবন করেছিলেন বলেই তাঁর নির্দেশ—'ভগবানের নাম ও চিন্তা যেরকম করেই কর না কেন, তাতেই কল্যাণ হবে। যেমন মিছরীর রুটি সিধে করেই খাও বা আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগবেই লাগবে।'

আপাতদৃষ্টিতে রামকৃষ্ণের উক্তিগুলিতে যুক্তির দৈন্যকে উপমার ঐশ্বর্যে আবৃত করা হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু খতিয়ে দেখলে মানতে হবে যে তিনি যুক্তি সম্পর্কিত অভ্যস্ত তথা লোকপ্রসিদ্ধ ধারণাকেই শুধু অস্বীকার করেছেন এবং সে ধারণার বাইরে বিচরণশীল ও সক্রিয় জীবনের গূঢ়তর বোধ-জাত এক লৌকিক-ন্যায়ের অনুসারী তর্করীতিকে অবলম্বন করেছেন এর ফলে তাঁর তর্ক পণ্ডিতের চাইতে মূর্খ বুঝতে পারে বেশি সহজে, আর তাঁর প্রভাবিত উপমা ও তুলনা সর্বদাই লৌকিক অভিজ্ঞতার থেকেই উত্থিত; এবং আরও স্পষ্ট করে বলা যায় তাঁর সত্ত্ব ও সত্য তথাকথিত ছোটলোক শ্রেণীর ধারণা ও ভাবনাতে সম্পূর্ণ রূপে বিধৃত। সমাজের উচ্চতম বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর জীবনধারা ও বাকভঙ্গি ছিল ভদ্রলোক শ্রেণীর আদর্শ বা ঈপ্সিত জীবনধারা ও বাকভঙ্গির থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র পক্ষান্তরে বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনধারা ও বাকভঙ্গির সামিল এবং দেশবাসীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা একেবারে মৃত্তিকার স্তরে অবতরণের

দুর্লভ সামর্থ্যেই তাঁর অবতারত্ব। অলৌকিক শক্তির চমকপ্রদ প্রদর্শনে নয়, দেশীয় অধ্যাত্ম সাধনায় প্রতীকী উত্তরণে রামকৃষ্ণ আধুনিক ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনায় অনন্য।

যে বছর কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন সেই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দেই গোবিন্দ রায় নামে সুফী মতাবলম্বী এক নিষ্ঠাবান মুসলমান সাধকের কাছে কলমা পড়ে রামকৃষ্ণ ইসলাম ধর্মসাধনা করেন: সে-সময়ে তিনি শুধু আল্লার নাম জপ করতেন, নিয়মিত নামাজ পড়তেন, মুসলমানী ঢঙে কাপড় পরতেন, মুসলমানী কায়দায় রান্না করা খাবার খেতেন এবং তখন তাঁর মন থেকে সমস্ত হিন্দু ভাবধারা মুছে গেছল, হিন্দুর দেব-দেবীকে প্রণাম করা দূরে থাক, দেখতে পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছে হতো না। তিন দিন ধরে পরিপূর্ণরূপে এই রকম দশাতে থাকার পরে তিনি ইসলামের সাধনফল উপলব্ধি করেন। এর সাত বছর পরে রামকৃষ্ণকে বাইবেল পড়ে শোনান শম্ভুচরণ মল্লিক এবং সে সময় একদিন দেওয়ালে টাঙান মা মেরীর কোলে শিশু যীশুখ্রীষ্টের ছবি দেখে তিনি ভাবাবিষ্ট হন: হিন্দুসংস্কারগুলিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁর মন থেকে সেগুলি একেবারে দূর হয়ে গেল, খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সংস্কারগুলি আচ্ছন্ন করে ফেলল তাঁর হৃদয়কে, শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে তিনি হলেন পুরোদস্তর খৃষ্টান। তাঁর মতো ব্যক্তিও যখন অন্য ধর্মের চিন্তার প্রতিক্রিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার থেকে বিযুক্ত বোধ করেন তখন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অনুরূপ অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। অন্যান্য ধর্মগুরুর প্রসঙ্গেও রামকৃষ্ণের প্রতিপাদ্য বস্তু একই ছিল, কিন্তু বিদেশাগত দুটি ধর্মের সাধনাতে শুধু তাঁর উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে না, তাতে পাওয়া যায় সত্যোপলব্ধির ও সেই উপলব্ধির জন্যে পরিমিত ফললাভের জন্যে তাঁর নিপট আকুলতার অকাট্য সাক্ষ্য।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সমান্তরালে রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী বৃহত্তর জনসাধারণের বহু শতাব্দীব্যাপী আন্তরিক আকাঙ্খা ও সাধনার সম্ভবত মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত প্রতিফলন, পক্ষান্তরে তাঁর সাধনার সমান্তরালে বিকশিত জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত করে।

যে-বছর কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ও রামকৃষ্ণ ইসলাম মতে ধর্মসাধনা করেন সেই বছরেই 'জাতীয়তাবাদের প্রপিতামহ' রূপে পরিচিত রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা

এবং জাতীয়তাবাদের একটি সমগ্র পরিকল্পনা রূপে দেশীয় সঙ্গীত, দেশীয় চিকিৎসা, দেশীয় খাদ্য, দেশীয় পরিচ্ছদ, দেশীয় আচার প্রথা, দেশীয় ক্রীড়া প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করে রচনা করেন Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal. রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় যে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে স্বাদেশিকদের যে-সভা গঠিত হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই তার সদস্য ছিলেন।

রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেলা নামে একটি বার্ষিক সম্মিলনী প্রবর্তন করেন এবং ১৮৮০তে তার চতুর্থ অধিবেশনের পরে ন্যাশনাল সোসাইটি নামে এমন একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে সদস্যরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত মিলিত হতে পারতেন; তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ন্যাশনাল পেপার নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। ন্যাশনাল সোসাইটির নামকরণে আপত্তি উঠলে নবগোপাল ন্যাশনাল পেপারে লেখেন, 'We do not understand why our correspondent takcs exception to the Hindus who certainlv form a nation by themselves and as such a socicty established by them can very well be called 'National Society.' এদেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু আর নেশন বা জাতি শব্দ দুটির সম্পূর্ণ সমার্থ দাবি করে' তিনি আরও লেখেন 'It embraces all of Hindu name and Hindu faith throughout length and breath of Hindustan; neither geographical postion, nor the language is counted a disability. The Hindus are destined to be a religious nation.' নবগোপালের রচনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসেবে হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হয়ে থাকলে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসুর একটি ভাষণে ঘোষিত হয়েছে জাতি হিসেবে হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব: এই ভাষণের প্রতিপাদ্য বিষয়ই ছিল পাশ্চত্য সভ্যতা ও খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি উৎকর্ষ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালিতে প্রাচীন গৌরব ও মহিমার ভিত্তির উপরে যে রেনেশাসের জন্ম হয় তা উনবিংশ শতাব্দীতে পরিণত হয় সংগ্রামী জাতীয়তাবাদে; অনুরূপভাবে একই কালে উদ্ভূত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের মূলে প্রাচীন ভারতীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়ে সম্ভোলব্ধ জ্ঞান ছিল

বিশেষ ভাবে সক্রিয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও ভারতীয়রাও আপনার অতীত গৌরব সম্বন্ধে শোচনীয় ভাবে অজ্ঞই ছিল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার কনিংহ্যমের অধীনে ও নেতৃত্বে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খনন কার্যের থেকেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে আলোক সম্পাতের পর্ব সুরু হয় এবং তারই সমান্তরালে আরব্ধ ম্যাক্সম্যুলর, উইলসন, ফার্গুসন প্রভৃতি ভারতবিদ্যামূলক গবেষণার ফলাফল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, আবার এসব বিদেশী পণ্ডিতদের সমস্তরেই উদ্ভূত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৌলিক গবেষণা, সবব্যাপী পাণ্ডিত্য ও সবজনের পক্ষে কৌতূহলোদ্দীপক রচনাবলী। ব্রিটিশের শিক্ষায় ও শক্তিতে অভিভূত, নিজেদের দুর্দশায় হীনমন্য ভারতীয়রা সহসা আবিষ্কার করল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অতুলনীয় মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধি এবং দুর্বল ভারতীয়রা এক বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবময় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হলো। যদিও প্রাচীন ভারতীয়রা নিজেদেরকে হিন্দু বলে ঘোষণা করেনি এবং প্রাচীন কালে হিন্দু কলেজ হিন্দু মেলা ইত্যাদির মতো হিন্দু ধর্ম, হিন্দুদর্শন, হিন্দুসমাজ বলে কোনও ধর্ম দর্শন-সমাজের অস্তিত্ব ছিল না তবু উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষের সমস্ত কিছুকেই হিন্দুত্বে চিহ্নিত করার রীতি প্রচলন হয়।

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র বিষয়ে বক্তৃতায় বললেন, 'আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্মের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।' অতঃপর স্বজাতীয়ের উন্নতি সম্বন্ধে মিলটনের এক উক্তি উদ্ধার করে তিনি বললেন, 'আমিও সেইরূপ হিন্দু জাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডক পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্তি হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপণ করিতেছি।' এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পরে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'রাজনারায়ণবাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক!'

অবদানের দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব এবং তিনিই জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রধ্বনি 'বন্দেমাতরমে'র উদ্গাতা ; তাঁর রচনাবলীতেই এই সত্য প্রথম স্পষ্ট রূপে ঘোষিত হয় যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা আর জাতিপ্রতিষ্ঠার সূত্র ভারতীয় ইতিহাসে ছিল না এবং 'যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি' তার মধ্যে উল্লিখিত দুটি প্রসঙ্গের বিশদ বিশ্লেষণ তিনি ই প্রথম করেন 'ভারত-কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে। 'বন্দেমাতরম' গানটি রচনার দু বছর পরে ওই গানের অনুষঙ্গে যে কল্পনাকে তিনি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বিগ্রহের রূপ দেন তা শুধু একান্তরূপে হিন্দু-কল্পনারই সাধ্য নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষে তার অক্ষরগত অর্থ বিবাদীও বটে, উপরন্তু ওই উপন্যাসে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ধর্মযুদ্ধের প্ররোচনা রীতিমতো সোচ্চার। ব্যক্তিগত ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ইসলাম-বিরোধী ছিলেন না—'আনন্দমঠ' প্রথমে ছিল ইংরেজ-বিরোধী উপাদানের পরিণাম, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী ছিলেন বলে 'আনন্দমঠে'র কাহিনীকে তিনি চালনা করেন মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে ; আরও লক্ষণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতে যত অধিক সংখ্যক মুসলমান চরিত্র লেখকের সহানুভূতিতে ও প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত হয়েছে তেমনটি আর কারও রচনাতে হয়নি ; সবচাইতে বড়ো কথা, 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধে তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, 'যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল তবে শাহজাঁহা শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দী-শাসিত বাঙ্গলাকে পরাধীন বলি কেন?' এবং পরে উত্তর দিয়েছেন, 'ভিন্নজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না, ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।' এজাতীয় পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি থেকে মনে করার সঙ্গত কারণ বর্তমান যে ইসলাম ধর্মালবম্বীর বিরুদ্ধে কোনও সংস্কার দূরে থাক, সম্ভবত প্রচ্ছন্ন প্রীতিই ছিল। কিন্তু ভারতীয় জাতিবিষয়ক তাঁর যে-ধারণা সেখানে কোনও অহিন্দুর প্রবেশাধিকার ছিল না।

ভারতীয় জাতিবিষয়ক বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা তাঁর নিজের জবানী থেকেই অনুধাবন করা সমীচীন : 'আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাঁহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে

কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামেরও তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি এইরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

'হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। তাহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।'

জাতিপ্রতিষ্ঠার জন্যে নির্ণীত শর্ত দুটির মধ্যে সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে হিতসাধনার অবকাশ কতখানি প্রশস্ত অথবা সঙ্কীর্ণ সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এবং ভাবালু অস্পষ্টতা কাটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং উত্তর দিয়েছেন, 'এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয়রা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে।' অতঃপর আলোচ্য জাতিপ্রতিষ্ঠার যে-আদর্শ তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত: 'স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে।' অর্থাৎ, প্রথমত, জাতিপ্রতিষ্ঠার আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষিত অথবা মধ্যবিত্ত কিংবা বর্ণহিন্দু বাঙালী লাভ করেছিল ইংরেজের কাছ থেকেই এবং সে আদর্শেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়; দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধির জন্যে বা উপযুক্ত প্রয়োজনে হিন্দুজাতির পক্ষে পরজাতির পীড়ন বাস্তবসম্মত। এর মধ্যে পরবর্তীকালের জন্যে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বা অন্যান্য জাতির পক্ষে বিপজ্জনক বিস্ফোরণের যে-বীজ নিহিত

ছিল সে-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং তাই একথাও লিখেছিলেন যে এর প্রভাবে 'আরও কি হইবে বলা যায় না।'

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ ও দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে-আদর্শকে একান্ত রূপে ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে অনুধাবন করেছিলেন বাস্তব ঘটনাবলীর পেষণে, অন্তত জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে, উনবিংশ শতাব্দীতে নিতান্ত ভ্রূণাবস্থাতে তার ব্যর্থতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

একই কালে সূত্রপাত হয় আর্যসমাজ আন্দোলনের এবং এই আন্দোলন যথার্থই উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জনজীবনকেও স্পর্শ করেছিল। আর্য সমাজের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেই গুজরাত, রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এসব অঞ্চলের রাজন্যবর্গ তাঁর ভক্তমণ্ডলীতে পরিণত হয়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে বৈদিক হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের জন্যে তিনি ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'সত্যার্থপ্রকাশ' গ্রন্থে আহ্বান জানান এবং স্বীয় মতের প্রচারে ভারত ভ্রমণের কালে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে পৌঁছান; সেখানে প্রার্থনা সমাজের নেতাদের সঙ্গে মতভেদের ফলে স্বামী দয়ানন্দ আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পান। তাঁর মনস্তত্ত্বে এই সত্যই ধরা পড়ে যে ইসলাম, খ্রীস্টনীতি প্রভৃতি বিদেশাগত ধর্মের সাফল্যের কারণ বিদ্যমান। সেই কারণটা কী? ওইসব ধর্মের মতে কোন-না-কোন একটি সর্বজনীন, অবশ্যমান্য ও অভ্রান্ত শাস্ত্র রয়েছে। সুতরাং হিন্দু জীবনের অবক্ষয় রোধ করার জন্যে অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ হিন্দু ধর্মেরও একটি সর্বজনীন, অবশ্যমান্য, অভ্রান্ত শাস্ত্র চাই আর বেদই হলো সেই শাস্ত্র এবং প্রচলিত সায়ন-ভাষ্যকে অস্বীকার করে স্বামী দয়ানন্দ স্বয়ং বেদের নতুন ভাষ্য রচনা করেন।

এইচ. বি. সারদা প্রণীত 'দয়ানন্দ' নামক জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করা ছিল স্বামী দয়ানন্দের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য; তিনিই সর্বপ্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি প্রয়োগ করেন এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তীব্র দেশপ্রেমই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান প্রেরণা এবং এই দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ছিল বিদেশাগত ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বলে মনে হয় এরূপ অসহিষ্ণুতা, আর বিদেশাগত ধর্ম বলতে তিনি ইসলাম ও খ্রীস্ট-ধর্মকেই বুঝতেন; তবে স্বভাবতই খ্রীস্টধর্মের চাইতে ইসলামের প্রতি তাঁর বিরোধিতা ছিল স্পষ্টতর এবং তরুণ আর্য সমাজীরা প্রকাশ্যেই বলতেন যে মুসলমান ও ব্রিটিশদের সঙ্গে হিসাব মিটিয়ে ফেলার দিনটির জন্যে তাঁরা ছিল

শুনছেন। স্বামী দয়ানন্দের প্রধান জীবনীকারের মত অনুসারে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের পথিকৃৎ হোন-না-হোন, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একটি সামান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে ভারতীয় জাতি গড়ে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা।

ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতীয় জাতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বামী দয়ানন্দের প্রবল আগ্রহ মূর্ত হয়ে ওঠে শুদ্ধি আন্দোলনে ; কোন-না-কোন কারণে যেসব ভারতীয় কোনও বিদেশাগত ধর্মকে গ্রহণ করেছিল তাদেরকে হিন্দু ধর্মীয় উদারতার প্রচ্ছদে শুদ্ধ করে হিন্দু ধর্মে দীক্ষা দেওয়া ও ভারতীয় জাতিকে এক আর অখণ্ড হিন্দু জাতিতে পরিণত করাই ছিল শুদ্ধি আন্দোলনের লক্ষ্য। বৈদিক যুগে আর্যরা গো-মাংস ভক্ষণ করত বলে প্রথম জীবনে তিনি গোহত্যা অনুমোদন করলেও শেষ জীবনে গোরক্ষিণী সভা স্থাপন করেন স্পষ্টতর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অভ্যাস আচার ও রুচিকে আঘাত করার জন্যে। ভগবদ্গীতার নতুন ভাষ্যে 'দুর্বৃত্ত' শব্দটির সংজ্ঞা নির্ণয় না করেই একথা ঘোষণা করেছেন যে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যে দুর্বৃত্ত অহিন্দুদের হত্যা করা সঙ্গত। বৈদিক হিন্দুধর্ম পুনঃ প্রবর্তনের আন্দোলনে বহু আপাত প্রগতিশীল অঙ্গ থাকলেও সামগ্রিক তাৎপর্যে ও সারাৎসারে এটা ছিল নিতান্তই আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার উচ্চকিত আত্মপ্রকাশ।

এটাও সত্য যে স্বামী দয়ানন্দের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে বহু উত্তর ভারতীয় বিপ্লবীকে হিংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচিত করে, বিশেষত পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনেক নেতাই ছিলেন দয়ানন্দের অনুবর্তী এবং এঁদের মধ্যে লালা লজপত রায়, অজিত সিং, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দয়ানন্দের অনুবর্তীদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনোভাবাপন্ন তাঁরা বৈদিক ধর্মচিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো বেদিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যক্ষ লালা হংসরাজের অধীনে এই কলেজটি হয়ে ওঠে পাঞ্জাবে জাতীয়তাবাদের শিক্ষাকেন্দ্র ; অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতির উন্নতি সাধনের জন্যে লালা লজপত রায় গঠন করেন বৈদিক স্যালভেশন আর্মি নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী— দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম থেকেই উদ্যোক্তাদের বৈদিক সংস্কার প্রকট।

মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা রূপে বিষ্ণু চিপলুঙ্কর, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, গোপাল গণেশ অগরকার, বালগঙ্গাধর টিলক, গোপালরাও হরি দেশমুখ, জ্যোতিরাও ফুলে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের অন্যান্য

অধিবাসীদের যেমন গৌরবের সূত্র অনুসন্ধানে সুদূর অতীতের থেকে কীর্তি-প্রমাণ ইত্যাদি উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের তেমন থাকতে হয়নি, কেননা মাত্র এক শ বছর অর্থাৎ ইংরেজদের শক্তি প্রতিষ্ঠার আগে, এমন কি ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, তাদের গৌরবময় কীর্তিকথা তাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল রূপেই জাগ্রত ছিল। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বাল গঙ্গাধর টিলক নিজেরই অজ্ঞাতে বাঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তোলেন স্ব-সম্পাদিত 'কেশরী' পত্রিকাতে—'We are at present, gradually being inspired by the spirit of patriotism. The birth of patriotism among us is due to English rule and English education.' অতঃপর ভারতের জাতীয় প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের অবদানকে ব্যাখ্যা করে লেখেন, 'English rule has made us realise the necessity of cultivating patriotism in our national concerns'. জাতীয় প্রসঙ্গে দেশপ্রেমকে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তীর্ণ করাই ছিল টিলকের আমৃত্যু সাধনা এবং তিনি শিবাজী উৎসব ও গণপতি পূজাকে নতুন রূপে প্রচলন করেন।

টিলক প্রবর্তিত ব্যবস্থা দুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে জনসাধারণ বলতে তিনি ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণকে বোঝেননি, সেই জনসাধারণের একটা খণ্ডকে অর্থাৎ শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী অংশকেই বুঝেছিলেন। মনে রাখা ভালো যে শিবাজী যে সমাজকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আচার-বিচারগত বিভাগ-বিচ্ছেদ সেই সমাজের একেবারে মূলের জিনিস' এবং এজন্যেই যদুনাথ সরকারের মতে মরাঠা-রাজ্যের পতনের প্রথম কারণই হলো 'জাতিভেদের বিষ'। আর গণপতির পূজা একান্তরূপেই পৌরাণিক হিন্দু আচার সম্মত একটি অনুষ্ঠান এবং কোনও অহিন্দুর পক্ষে এরূপ পূজার মাধ্যমে ভারতীয় সত্তার সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত করা অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে বাল গঙ্গাধর টিলক ছিলেন একান্তরূপে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু এবং সে জন্যেই সহবাস সম্মতি আইনের বলে সাধিত হিন্দু সমাজের সংস্কারের বিরোধিতা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ওই আইনকে যেসব প্রগতিশীল হিন্দু সমর্থন করেছিলেন তাঁদেরকেও ধর্মদ্রোহী ও দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, ফলে ভাণ্ডারকর, চন্দ্রাভরকর, গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। টিলকের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভঙ্গি সব চাইতে উগ্ররূপে প্রকাশ পায় গো-রক্ষা সমিতি প্রবর্তনে—এই সমিতির থেকে প্রকাশিত পুস্তকাদিতে দেওয়া হতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্র প্ররোচনা। উদারতাবাদী ও অনুগ্রপন্থী সমাজনেতা

বা দেশনেতাদের রাস্তায় নিগ্রহ করাও ছিল টিলকের অনুগতবৃন্দের কার্যকর্মের অন্তর্গত। এই অনুগতবৃন্দ এই সময় হিন্দুধর্মের প্রতিবন্ধক দূরীকরণ সমিতি নামে একটি সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেন। টিলকের অকপট জাতীয়তাবাদী সাধনাকে এক কথায় বলা যায় তীব্র দেশপ্রেমের সঙ্গে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সমীকরণ সম্পন্ন করার প্রাণান্ত প্রয়াস এবং এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদে হিন্দু ধর্মীয় উপকরণ যোজনায় থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির অবদানও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সমিতির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল মাদ্রাজ, তবে সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতেই তার প্রভাব ছিল যেমন গভীর তেমনই ব্যাপক। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে মাডাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অলকটের উদ্যোগে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিকে শ্রীমতী অ্যানি বেশাণ্ট নাম্নী ব্রিটিশ মহিলা ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাণসত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে। বেশাণ্ট প্রত্যক্ষরূপে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব লাভ করেন ১৯১৬-র হোমরুল আন্দোলনে, কিন্তু জাতীয় মানসে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রচারক ও প্রবক্তা রূপে তিনি আপন অনন্যতা প্রমাণ করেন উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের সমান্তরালেই। বিধবা বিবাহের বিরোধী, অবস্থা বিশেষে পুরুষের বহু বিবাহের সমর্থক ও অলৌকিক রহস্যবাদের প্রচারক অ্যানি বেশাণ্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বারাণসীর হিন্দু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কালক্রমে পরিণত হয় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি একান্ত রূপে বিশ্বাস করতেন যে আধ্যাত্মিকতাই হলো ভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তঃসার আর হিন্দুধর্মই সেই অন্তঃসারের যথার্থ অভিব্যক্তি এবং পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো হিন্দুধর্ম, ফলে স্বভাবতই এই বিদেশিনীর বচনে ও রচনায় রক্ষণশীলদের আত্মপ্রসাদবৃত্তি ও আত্মসর্বস্বতা পেয়েছে পর্যাপ্ত ইন্ধন, উপরন্তু অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের হেয় জ্ঞান করতেও শিখিয়েছে।

যখন স্বামী দয়ানন্দ ও বাল গঙ্গাধর টিলকের চিন্তাধারা সুস্পষ্টরূপে অহিন্দুদের প্রতি বিরোধী মনোভাবাপন্ন, বেশাণ্টের শিক্ষাও প্রকারান্তরে সেই একই মনোভাবের পরিপোষক তখন রামকৃষ্ণের সাধনায় অভিভূত স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেন যে বস্তুসর্বস্বতায় আচ্ছন্ন পাশ্চাত্যেরই আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন বেশি, পক্ষান্তরে বর্তমান ভারতের সব চাইতে বেশি প্রয়োজন হলো বস্তুগত অবস্থার উন্নতিসাধন। বিবেকানন্দের অধিকাংশ বক্তৃতার অন্তরালেই দেখা যায় এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছায়ামূর্তিকে: ডক্টর রমেশচন্দ্র

মজুমদারের গবেষণা থেকে জানা যায় যে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের সমালোচনাতেই বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা শুরু হয়েছিল। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় ওই সূচনা পরিত্যক্ত হয়। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ওই সভাতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও উপস্থিত ছিলেন আহূত হয়ে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ অনাহূতরূপে যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি রাতারাতি দিগ্বিজয়ীর সম্মান পান এবং সমগ্র হিন্দুসমাজই তাতে অতুলনীয় প্রতিফলিত সম্মানের অধিকারী হয়।

বিবেকানন্দের অনুধাবিত হিন্দুধর্ম প্রকৃতই সমগ্র মনুষ্য সমাজের পক্ষে গ্রহণীয় এক অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ভাবাদর্শ। 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জনৈক প্রতিনিধি এক সাক্ষাৎকারে ভারতের পক্ষে বিবেকানন্দের আন্দোলন কোন উদ্দেশ্য সাধন করবে জানতে চাইলে বিবেকানন্দ উত্তর দেন 'হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করা এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিয়া দেওয়া,' তারপর শ্লেষের সঙ্গে বলেন, 'আজকাল দেখি উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটি বিষয়ে একমত—গো-মাংস ভোজনে সকল হিন্দুরই আপত্তি।' স্পষ্টতই জাতীয় চেতনা জাগ্রত করাকে তিনি জীবনের অন্যতম ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, পক্ষান্তরে গো-মাংস ভোজনে আপত্তির ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য সম্পাদনের যে-প্রয়াস তার প্রতি তাঁর চিত্ত ও বুদ্ধি বিরূপ ছিল। ইংলণ্ডে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বিশ্ব-জনীন ধর্মের আদর্শ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে একই সত্য লক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে এবং প্রত্যেক ভাবটিই তাহার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথার্থ।' 'যত মত তত পথ' বলে রামকৃষ্ণ একটি শাণিত সংক্ষিপ্ত উক্তিতে যে-সত্যকে ব্যক্ত করেছেন তাকেই বিবেকানন্দ এখানে প্রকাশ করেছেন এবং সম্ভবত এইটে ছিল বিবেকানন্দের পরম জীবনোপলব্ধির অন্যতম অংশ। কিন্তু রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বচন ও রচনাগুলি পাশাপাশি রেখে যাচাই করলে দেখা যায় যে প্রথম জনের সমস্ত যুক্তি-দৃষ্টান্তই ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে লৌকিক জীবনধারা আর শেষোক্তজনের বিশেষভাবে হিন্দু বলে চিহ্নিত জীবনধারা থেকে উদ্ভূত এবং এখানেই গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক অবস্থান থেকে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে যে প্রকৃতপক্ষে কে জনসাধারণের আর কে ভদ্রশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা ও সাধনাকে, লক্ষ্য ও সত্যকে প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। এর ফলে বিবেকানন্দ যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করেন তা আপাত ও প্রত্যক্ষ তাৎপর্যে ভারতীয় জাতীয় চেতনার পরিবর্তে হিন্দু জাতীয় চেতনাতেই রূপান্তরিত হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও বিবেকানন্দ—বাঙালী মুসলীমের সমন্বয়বাদ ও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর সম্প্রদায়বাদ—হিন্দুত্বের প্রচারক ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ—সুরেন্দ্রনাথ ও কংগ্রেস গঠনের ব্রিটিশ পরিকল্পনার ব্যর্থতা।]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিবর্তন অনুসরণে চারটি সুস্পষ্ট পর্ব বিভাগ লক্ষিত হয় : প্রথম পর্বে রামমোহনের প্রয়াসে রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ, দ্বিতীয় পর্বে কেশবচন্দ্রের প্রয়াসে সর্বভারতীয় চেতনার জাগরণ ও সেসঙ্গে বিদেশী শাসনের প্রতি নির্লজ্জ আনুগত্য প্রকাশ, তৃতীয় পর্বে রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, দয়ানন্দ, টিলক, বেশাণ্ট প্রমুখের প্রয়াসে আঞ্চলিক ভিত্তিতে দেশীয় গৌরবের উদ্ধার ও জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ এবং এই তিনটির সমূহ পরিণাম রূপে চতুর্থ পর্বে জন্মলাভ করল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা আর এই চতুর্থ পর্বের নায়ক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

অত্যন্ত স্বল্প সময়ের পরিসরে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব অতি দ্রুত অন্তত তিনটি মূল পর্যায়ের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হয় : প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ঘোর যুক্তিবাদী, মধ্য জীবনে আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধানে হলেন সন্ন্যাসী, আর শেষ জীবনে হলেন সমাজতন্ত্রবাদী। তাঁর যুক্তিবাদী স্বরূপ উপযুক্ত উপকরণের অভাবে বহুলাংশে অস্পষ্ট ; তাঁর সমাজতান্ত্রিক স্বরূপ সবচাইতে প্রকটরূপে প্রকাশিত হয়েছে 'আমি সমাজতান্ত্রিক' নামক প্রবন্ধে, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধের চর্চা তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ; তাঁর যে স্বরূপ সবচাইতে বেশি জনপ্রিয়, দেশীয় মানসে সবচাইতে বেশি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে তা হলো সন্ন্যাসীর স্বরূপ এবং এইটেই তাঁর জীবনের সবচাইতে উত্তুঙ্গ পর্যায়। সন্ন্যাসীর পর্যায়ে যে ধর্মের প্রচারে ও সংস্কারে তিনি আত্মনিয়োগ করেন তা হিন্দু ধর্ম এবং ওই আধ্যাত্মিক চিন্তার মূল পটে বহুতর সামাজিক চিন্তার টানাপোড়েনে তিনি এক অভিনব দেশীয় চেতনার প্রতিমান সৃষ্টি করেন—এই চেতনাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রদত্ত 'আমার জীবন

ও ব্রত' নামে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছেন, 'ভারতবাসীরা কোনকালেই একটি শক্তিশালী বিজয়ী জাতি হইতে পারিবে না। কোনদিনই তাহারা রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হইবে না। এ-কাজ তাহাদের নয়। বিশ্বসভায় ইহা ভারতবর্ষের ভূমিকা নয়। ভারতের ভূমিকা কি? ভারতবর্ষের আদর্শ—ভগবান, একমাত্র ভগবান।' একই বক্তৃতাতে তিনি আরও বলেছেন, 'আপনি যদি ভারতবর্ষে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চান, তাহা হইলে আপনাকে ধর্মের ভাষায়-কথা বলিতে হইবে।' তাঁর বক্তব্যকে সোজা বাংলায় সাজালে এই দাঁড়ায় যে, ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রসঙ্গই ধর্মের আধারে বিধৃত এবং এখানে একমাত্র ধর্মের প্রচ্ছদেই রাজনীতির চর্চা সম্ভব। ভারতীয় ধর্ম বলতে বিবেকানন্দ বিশেষ ভাবে কোন্ ধর্মকে বুঝতেন তা তাঁর মধ্য জীবনে অর্থাৎ সন্ন্যাসীর পর্যায়ে অনুসৃত কর্মধারা অনুধাবনেই পরিষ্কার হয়—সেই বিশেষ ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম এবং এটাও অনস্বীকার্য ও স্বাভাবিক যে প্রথম জীবনের যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ যৌক্তিকতায় ও উদারতায় হিন্দুধর্মকে সংগঠনেই সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু লক্ষণীয় যে এক বক্তৃতায় ভারতীয় মহাপুরুষদের যে-তালিকা স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছেন তার মধ্যে বর্তমান যুগে হিন্দু সমাজ বলতে যে-মণ্ডলকে বোঝায় তার বাইরের কোনও মহাপুরুষকেই স্থান দেওয়া হয়নি; তিনি যখন বিশেষ ভাবে বঙ্গীয় যুবকদের ডেকে বলেন, 'এস, আমাদের ধর্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য—যাহা হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য, তাহারই ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হই' তখন তিনি বিস্মৃত হন যে অধিকাংশ বাঙালীরই ধর্ম ইসলাম; বিবেকানন্দ ঘোষিত যে-স্বদেশমন্ত্র অসংখ্য দেশপ্রেমিক তরুণকে জাতীয় সংগ্রামে অকল্পনীয় প্রেরণা যুগিয়েছে সেটি এই: 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাস সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন

কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' কিন্তু এই স্বদেশমন্ত্র কোনও অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, ভারতের অজস্র দেবদেবীকে কোনও অহিন্দুর পক্ষে নিজের ঈশ্বর বলে কল্পনা করা অসম্ভব, গৌরীনাথ কিংবা জগদম্বার কাছে কোনও অহিন্দুর পক্ষে নিজেকে মানুষ করার জন্যে প্রার্থনা জানানোও সম্ভব নয় এবং গূঢ়তর তাৎপর্যে যা-ই হোক, এই স্বদেশমন্ত্র আক্ষরিক ও তাৎক্ষণিক অর্থে একান্ত রূপে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতীয়েরই স্বদেশমন্ত্র অর্থাৎ এর আবহে অহিন্দুর প্রবেশাধিকার নেই।

উদ্ধৃত স্বদেশমন্ত্রে স্বামী বিবেকানন্দের শেষ জীবনে উপলব্ধ সমাজতন্ত্রের বীজ অমোঘ রূপেই নিহিত এবং একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষে তিনিই সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা : যে-ঐহিক-জিজ্ঞাসায় তিনি প্রথম জীবনে ব্যাপক রূপে আক্রান্ত হয়েছিলেন তার উৎপাত তাঁর মধ্য জীবনে হ্রাস পায় বটে, কিন্তু শেষ জীবনে আবার তা তীব্র হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দের জীবন পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে তাঁর চরিত্রে প্রাচীনতা ও আধুনিকতা, প্রাচ্যাদর্শ ও পাশ্চাত্যাদর্শ ইহ-বিমুখতা ও ইহ-জিজ্ঞাসা, বিচার-প্রবণতা ও বিশ্বাস-প্রবণতা, সামাজিক ন্যায়বাদ ও ব্যক্তিগত অধিকারবাদ প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী ভাবনা চিন্তার সংঘর্ষ এমন এক প্রচণ্ড রূপ নিয়েছিল যা ভয়ংকরতায় অতুলনীয় ও চমকপ্রদ, এবং হয়তো সেজন্যেই ঘটে তাঁর অকালমৃত্যু।

কিন্তু অন্তিম মূল্যায়নে স্বামী বিবেকানন্দের যে ঐতিহাসিক অবদান তার কোন্ তাৎপর্য নির্ধারিত হবে? তিনি যখন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র উপস্থাপন করেছেন তখন তা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাদর্শে তথা হিন্দু ধর্মাদর্শে অলঙ্কৃত হয়েই দেশবাসীর সকাশে উপস্থিত হয়েছে, যে-ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভাষা, তাঁর বচনে ও রচনায় যে-পরিবেশ গড়ে উঠেছে তা বিশেষ ভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবনযাত্রার অনুকূল পরিবেশ, তাঁর চিন্তার জগতে যেসব চিত্রকল্প ও প্রতীক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেসব হিন্দু ধর্মেরই

চিত্রকল্প ও প্রতীক, তিনি যখন ঘোষণা করেছেন, 'আমি সমাজতন্ত্রবাদী' তখনও প্রাচীন ভারতীয় তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বর্ণবিন্যাসের যে আদর্শ-ও-কল্পনা তার বাইরে তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ নিরবলম্ব। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার ক্ষেত্র বহুতর আধুনিক ফসলে অসাধারণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এটাও সত্য যে প্রাচীন ভারত ও হিন্দুধর্মের পুনঃপুনঃ প্লাবনে সে-ফসল বিনষ্ট হয়েছে।

স্পষ্টতই একদিকে আপাত প্রেরণার ও অন্যদিকে গভীর ব্যঞ্জনার ধারা দুটির সংযোগেই আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের জটিল ও তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান। কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনার ধারাটিতে নয়, তাঁর আপাত প্রেরণার ধারাটিতেই পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যাত্রা এবং গভীর ব্যঞ্জনার যে-ধারা তার নিষ্ফলতার প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করেই হয়তো ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, "It was the personality of my Master himself, in all the fruitless torture and struggle of a lion caught in a net." প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিসত্তা একদিকে হিন্দু ধর্মাদর্শ অনুসারী আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সাধনা ও অন্যদিকে কোনও বিশেষ ধর্মাদর্শের বাইরে নির্যাতিত মানুষের বস্তুতান্ত্রিক উন্নয়নের সাধনা। এদুটি সাধনার অবিরাম সংঘর্ষে বিদীর্ণ এবং আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত এই ব্যক্তিসত্তার বিশ্বস্ত বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ভগিনী নিবেদিতার 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে। নিবেদিতার সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায় যে অমরনাথ যাত্রার পথে আলমোড়ায় জনৈক ভদ্রলোক যখন প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় জানতে চাইলেন তখন 'The Swami turned on him in surprised indignation. 'Why ! thrash the strong, of course !'—he said, 'You forget your own part in this karma. Yours is always the right to rebel.' এই উক্তিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গির যথার্থ রাজনৈতিক বিদ্রোহীর স্বরূপ যা পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের ওই রাজনৈতিক স্বরূপের পাশেই দেখা যায় যে তিনি শিব ও কালীর কল্পনায় আচ্ছন্ন হচ্ছেন, 'কালী, দি মাদার' নামে বিখ্যাত ধর্মীয় প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করছেন এবং অমরনাথ থেকে কলকাতায় ফিরে বলছেন যে তাঁর মাথায় শিব এমন চড়েছেন যে কিছুতেই নামছেন না।

স্বামী বিবেকান্দের মানসে আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা দুটির জন্মে

পৃথক পৃথক ক্ষেত্র বা সীমানা-ভেদ প্রতিপন্ন হয়নি, বরং দুটি ভাবসত্ত্বকেই তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভেদাভেদহীন বা সীমানাতীত সমগ্র জাতীয় সমাজের ক্ষেত্রে এবং সম্ভবত জাতীয় সমাজ যে বহু দেশজ ও বিদেশী ধর্মের অবলম্বী ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত এই বিশেষ পরিস্থিতির সম্যক গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা তিনি করেননি। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পরিসরে বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আবিষ্কার করা সহজ হলেও আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের পরিসরে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব—সেকালে শ্রমজীবী দরিদ্র শ্রেণী বলতে শুধু শূদ্রবর্ণকেই বোঝাত পক্ষান্তরে একালে ওই শ্রেণী বলতে শূদ্রবর্ণ ছাড়াও আরও বহু ধর্মাবলম্বী শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষকে বোঝায়। যদিও স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে বর্ণনা করেননি, বরং সমাজতন্ত্রবাদী বলেই ঘোষণা করেছেন তবুও তাঁর আপাত প্রেরণায় অর্থাৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অজ্ঞাতপূর্ব গৌরবে অভিষেক করার পরিণামে ভারতীয় মানসে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদেরই জন্ম হলো আর সে-জাতীয়তাবাদ চিহ্নিত হলো একান্তরূপেই হিন্দু ধর্মাদর্শে।

আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রচলিত ধারণা অনুসারে সন্ন্যাসীর পক্ষে সঙ্গত কোনও বৈরাগ্যই তাঁর ছিল না, দেশ ও দেশবাসীর উন্নতি সাধনের চিন্তা তাঁকে জীবনের শেষ কয়েক বছর সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, 'Throughout those years, in which I saw him almost daily, the thought of India was to him like the air he breathed.' হিন্দু ধর্ম ও দেশপ্রেমকে তিনি জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শে ও উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং হিন্দু ধর্ম ও দেশপ্রেমের অনিবার্য সমীকরণেই সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের গোমুখী খুলে গেল। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা।' কিন্তু মনে রাখা ভালো যে তাৎক্ষণিক তাৎপর্যে সে-আন্দোলনের ভিতরে চণ্ডাল মুচি মেথর প্রভৃতি অন্ত্যজদের জন্যে স্থান থাকলেও মুসলমান পারসীক খ্রীস্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের, অর্থাৎ ভারতের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকে আসা ধর্মকে যারা কোন-না-কোন কারণে গ্রহণ করেছিল তাদেরকে, স্থান দেওয়া হয়েছে সেই একই আন্দোলনের বাইরে, যেন বিদেশাগত ধর্ম গ্রহণের অপরাধে তাদেরকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ নেওয়ার জন্যে আহূতদের তালিকায় বর্জন করা হয়েছে।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়। তিনি যদি বেশি দিন বাঁচতেন তাহলে কী হতো বলা মুশকিল, তবে এটা ঠিক যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ক্রমশই প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ধারণাগুলিকে ছাপিয়ে উঠছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর বা সমকালের পাশ্চাত্যে উদ্ভূত বিভিন্ন ভাববাদী বৈপ্লবিক সমাজ-চিন্তাগুলির অভিমুখেই বিকশিত হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেকালে ভারতবর্ষের সব চাইতে প্রগতিশীল সমাজেরও সামগ্রিক আবহে ছিল হিন্দু ধর্মীয় চেতনার মানদণ্ডে মানুষের মূল্যায়ন করার রীতি এবং এই রীতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেরই তৎকালীন রচনাবলীতে।

নব পর্যায়ে যখন বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হলো তখন তার প্রথম সংখ্যাতেই ব্রহ্মবান্ধব 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠা' নামে প্রবন্ধে লেখেন, 'হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয়, তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রমধর্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদের ইহপরকালে মঙ্গল হইবে।' রামেন্দ্রসুন্দর 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার' প্রবন্ধটিতে এ দেশের ব্যধি নির্ণয় করলেন এই যে ইংরেজী শিক্ষা দেশীয় সামাজের স্বভাবে মেশেনি বলেই অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে এবং সেই স্বভাবের পুনর্জাগরণেই রয়েছে সমাধানের ইঙ্গিত; নিঃসন্দেহে তাঁর প্রদত্ত সমাধান হিন্দু সমাজ ও স্বভাবের পরিমণ্ডলেই আশ্রয় পেয়েছে; তথাপি রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যটি এই কারণেই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে ইংরেজী ভাষার সূত্রে দেশীয়দের মধ্যে প্রকৃতই দুটি ভাগ হয়ে গিয়েছিল: একদিকে ইংরাজীতে অজ্ঞ বিরাট জনসাধারণ অন্যদিকে ইংরেজীতে শিক্ষিত এক নতুন সম্প্রদায়; এবং বিরাট জনসাধারণের জীবনে ধর্মীয় বিভেদ থাকলেও যেমন বাস্তব বিভেদ অর্থাৎ বস্তুগত ক্ষেত্রে বা বস্তুগত স্বার্থ নিয়ে সমষ্টিগতভাবে বিদ্বেষ-বিরোধ ছিল না তেমনই তারা প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রূপে আপন আপন সমাজের রুদ্ধ কক্ষে বাস করত না, পক্ষান্তরে জাতীয় চেতনার উন্মেষের কাল থেকে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তথা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর থেকে স্বতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশের আস্পৃহা উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, ফলে, হয়তো নেতাদের অজ্ঞাতেই, হিন্দু ধর্মাবলম্বী ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয় যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয় সেভাবে দেশীয়

জনসত্যের প্রতি অর্থাৎ একাধিক ধর্মাবলম্বীর সহাবস্থান জনিত বৈচিত্র্যের প্রতি বিরুষ্ট না হলেও অসাড় হয়ে যেতে থাকে।

একালের পক্ষে যা কৌতূহলোদ্দীপক তা হলো শেখ ওসমান আলীর 'দেবলা', কায়কোবাদের ষাট সর্গে সমাপ্ত বিপুলায়তন কাব্য 'মহাশ্মশান', মীর মশারফ হোসেনের 'সঙ্গীত লহরী' প্রভৃতি কাব্যে পুনঃপুনঃ প্রকাশিত একই বৈচিত্র্যের প্রতি অপরিসীম আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা—কৌতূহলোদ্দীপক এজন্যে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদিতা, গণতান্ত্রিক উদারতা, দার্শনিক প্রজ্ঞাতে আপ্লুত এঁরা হননি, আলোকদীপ্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ এঁরা পাননি। এদের মধ্যে মশারফ হোসেন সবিশেষ উল্লেখ্য, কেননা জনসত্যের স্তরে বিরোধের ধর্মীয় প্রকৃতি যে আরোপিত ব্যাখ্যা, প্রকৃত ব্যাখ্যা যে আর্থনীতিক প্রকৃতির বা বিত্তবান ও বিত্তহীনদের বিরোধ তার প্রথম রূপায়ন তাঁর 'জমিদার দর্পণ' নাটকেই মেলে, উপরন্তু 'সৎপ্রসঙ্গ', 'গোজীবন' প্রভৃতি প্রবন্ধে ও আত্মস্মৃতিমূলক 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' পুস্তিকায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বিষয়ে তাঁর গভীর ও প্রগাঢ় অনুধ্যান এমন অবিস্মরণীয় অভিব্যক্তি লাভ করেছে যার তুলনা সেকালের বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ : 'এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান, পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে—ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক—সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না।'

আবার এরই প্রায় সমসময়ে, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে, দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেও চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় ইংরেজ বিতাড়নের প্রস্তুতি হিসেবে যুবকদের অস্ত্রবিদ্যা ও সামরিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য 'হিন্দুধর্মের প্রতিবন্ধক অপসারণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক ভারতবর্ষে গুপ্ত সমিতির ধারার প্রবর্তক বাসুদেও বলবন্ত ফাদকে ইংরেজীতে অজ্ঞ পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংগঠনের কাজ করেছিলেন, কিন্তু চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির ধর্মীয় চরিত্র এর নামেই স্বতঃব্যক্ত। দু-বছর পরে, ১৮৯৭-র ১২ই জুন, বাল গঙ্গাধর টিলক শিবাজী উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় ইংরেজ দণ্ডবিধির প্রভাব বা ভয় থেকে মুক্ত হয়ে প্রয়োজন অনুসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রোক্ত গুরু ও স্বজনবৃন্দকেও হত্যার নীতি গ্রহণের জন্য মহারাষ্ট্রীয়দের প্রতি আবেদন জানান। টিলকের আবেদনে চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় নিঃসন্দেহে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, ওই বক্তৃতার ঠিক দশ দিন পরে পুনার কলেক্টর মিষ্টার র্যাণ্ডের ও লেফটেনাণ্ট আয়ার্স্টের উপরে চাপেকারদের গুলি নিক্ষেপের ঘটনা থেকে পাণ্ডিত্য ও

বাগ্মিতায় দক্ষতার ভিত্তিতে যে জাতীয় আন্দোলন চলছিল তার থেকে সরে গিয়ে সশস্ত্র ও বিপজ্জনক আন্দোলনের পথ বেছে নিতে শুরু করে।

ইতিপূর্বে ইতালীয় কার্বোনারি আন্দোলনের আদর্শে রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বাংলায় গুপ্ত সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। র‍্যাণ্ড হত্যার বছরে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী মামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বোম্বাইয়ে বেড়াতে গিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী মহারাষ্ট্রীয় গুপ্ত সমিতির ধারাকে বয়ে আনলেন বাংলায় আর তাঁরই প্রেরণায় ও বঙ্কিম-চন্দ্রের আদর্শে নৈহাটি-নিবাসী প্রমথ মিত্র ১৮৯৭-তেই এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন; পরবর্তী কালে এই সমিতি অনুশীলন সমিতি নামে বিখ্যাত হয় এবং বন্দেমাতরম ধ্বনিটিকে সর্বপ্রথম জাতীয় মন্ত্র হিসেবে প্রচলিত করে, ফলে ওই মন্ত্রের অনুষঙ্গে 'আনন্দমঠে' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' পরম ভক্তির সঙ্গে বর্ণিত, অথচ অহিন্দুর নিকটে সম্পূর্ণ নিঃসত্ত্ব, দেবীর কল্পনা ও প্রতিমা মিশে যায় অনিবার্য অবিচ্ছেদ্যতায়। কি প্রাচীন যুগে কি মধ্যযুগে কোনও সময়েই যুক্তিসম্মত সমাজ-ও-রাষ্ট্রতত্ত্ব ভারতবর্ষে বিকশিত হয় নি, ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সশস্ত্র কর্ম-তৎপরতা গ্রহণের সময়েও প্রাণশক্তি আহরণ করতে হয় ধর্মীয় প্রেরণা থেকে আর তার পরিণামে ব্রিটিশ বিতাড়নের পরিকল্পনায় গঠিত গুপ্তসমিতিগুলি উপাদানে ও উপসর্গে সর্বদা বহুলাংশেই ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রূপে তৎপর হয়ে ওঠে।

জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগে আক্রান্ত কর্মীদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের মূল কোথায় তা পদে পদে অনুধাবনযোগ্য : প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের বিত্তবান ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যস্থিত বিপুল শূন্যতায় উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও উত্থানই ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাস; কিন্তু এই ইতিহাসের অন্তর্নিহিত উদ্ভ্রান্তির অন্যতম কারণ বিদেশী শাসনের বাইরের আঘাতে মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট জনসত্যের থেকে শোচনীয় বিচ্ছেদ; অন্তত ১৮৫৭-র অভ্যুত্থান পর্যন্ত ওই বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আশ্রয় করে। ফলে রামমোহন বঙ্কিমচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে সবসময় মুসলিম-বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট না হলেও একই সামাজিক স্তরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব ও মূল্য সম্বন্ধে অনবহিততা বিলক্ষণ প্রকট। সেজন্যে অলোকসামান্য কবিদৃষ্টির অধিকারী হয়েও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা'-র আদর্শগত পার্থক্য নির্ধারণ করতে গিয়ে

রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।' লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্যদর্শে জাতিগঠনের যাথার্থ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত কারণেই সন্দিগ্ধ অথচ তাঁর প্রাচ্য সভ্যতা সম্পর্কিত ধাবনায় শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সভ্যতাই স্বীকৃত এবং এই স্বীকৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংমিশ্রণে বিকশিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রত্যাখ্যানেরই নামান্তর।

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় ভঙ্গিতে লিখেছেন, 'বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীত ও বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত করিতেছে'। আর ওই অতীতের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সমাজ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে,' কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে দেরি হয় না যে উল্লিখিত অতীত ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত নয়, তার এক খণ্ডাংশ মাত্র, আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে তা ভারতীয় ইতিহাসের শুধু প্রথম ভাগ, কেননা একই প্রবন্ধের যেখানে লিখেছেন, 'ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজ কলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল—নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই' সেখানে স্পষ্টতই তাঁর উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজ-বিন্যাসের ভিত্তি রূপে উদ্ভাবিত বর্ণাশ্রম প্রথার প্রতি প্রশংসা-জ্ঞাপন এবং প্রকারান্তরে সেই প্রথার পুনরুদ্ধারে প্ররোচনা-দান। একই কালে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণে ও সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিস্ময়কর রূপে স্বচ্ছ : যেসব আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে জাতি গঠনের ধারা গড়ে ওঠে তার এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বস্তুগত উন্নতি প্রয়াসের সঙ্গে আগ্রাসী রাজনীতির অশুভ মিলনের অন্তিম পরিণাম সম্বন্ধে তাঁর নিগূঢ় আশঙ্কা ও উদ্বেগ পরবর্তী কালের ইতিহাসে অনস্বীকার্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ যখনই 'ব্রাহ্মণ' 'প্রাচীন ভারতের এক:', 'নকলের নাকাল', 'হিন্দুত্ব বা ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে বা 'নৈবেদ্য'-র কবিতায় পাশ্চাত্য আদর্শগুলির বিকারগ্রস্ত অনুকরণ-বৃত্তির প্রতিবাদী কোনও মূল্যবোধ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন তখনই তাঁর অবলম্বন হয়েছে ইসলামের আগমনের পূর্বকালীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার থেকে উদ্ভূত বহুতর বৈশিষ্ট্যগুলি এবং এর ফলে তাঁর রচনার

প্রাথমিক তাৎপর্য যে মুসলিম-বর্জিত ভারতীয় ইতিহাসের মহিমাকীর্তনে নিঃশেষ হলো সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব প্রথম থেকেই ইহলোক সম্পর্কিত গভীর আগ্রহে ও দুর্মর জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত, ইহলোকের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ও অবিরাম কৌতূহলে উদ্দীপিত এবং সেজন্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে লেখেন, 'এ কথা যিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় আদর্শে লোককে কেবলই তপস্বী করে, কেবলই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলে, তিনি ভুল বলেন এবং গর্বচ্ছলে মহান আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যখন মহান ছিল, তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান ছিল। তখন সে বীর্যে ঐশ্বর্যে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান ছিল; তখন সে কেবলই মালাজপ করিত না।' অতঃপর যে অস্বাভাবিকতাকে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যাধি রূপে নির্ণয় করেছেন তার ধারণাকে বিশদ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কেবল ইংরেজ-স্যভতা নহে; আমাদের দেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও আমরা অস্বাভাবিক। আমরা তাহার বাহ্যিক ক্ষণিক অংশ লইয়া যে-আড়ম্বর করিতেছি তাহা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, স্বাভাবিক হইতেই পারে না।'

এখানে উনিশ শতকীয় জাগরণের অস্বাভাবিকতা নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ লাভ করেছে গূঢ়তর ঐতিহাসিক তাৎপর্য, কেননা স্বাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব ও নিরপেক্ষ বিচার-বোধকে জাগ্রত করার যে-ভাবসত্ব গড়ে তোলার প্রাণান্ত প্রয়াসে রামমোহন জীবনপাত করেছিলেন তার সমূহ বিপর্যয় ঘটে ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের পরে, বহুতর পৌরাণিক দেবদেবীর পূজার জন্যে অনুষ্ঠান আয়োজন উপকরণ আচারবিচার নিয়মপ্রথা সংস্কার ইত্যাদিতে জড়িত হিন্দু ভাবসত্বকে মুখ্যত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কর্তৃক গৌরবপ্রদানের প্রয়াসে এবং আধুনিক কালে ওই ভাবসত্ব ব্যক্তিগত সাধনার স্তরে অর্থময় হলেও সমাজগত বিকাশের স্তরে শুধু অর্থহীন নয়, হয়তো বা বহু ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যানুভূতির পরিপন্থীও বটে।

কিন্তু হিন্দু জাগরণের তাৎক্ষণিক তাৎপর্যের বিপদ অথবা পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের পরিণাম সম্বন্ধে সশঙ্ক রবীন্দ্রনাথ যখন দেশীয় আদর্শের প্রতিমান অন্বেষণে অগ্রসর হলেন তখন সর্ষের মধ্যেকার ভূতের প্রভাবে পুনরায় নিজেই অবতীর্ণ হলেন বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজতত্ত্বের প্রচারে: 'তপোবন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে বিশ্লেষিত শিক্ষাদর্শে প্রতিষ্ঠা করলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম ও ব্রহ্ম-

বিদ্যালয়, সেসঙ্গে ছাত্রদের চিত্তকে যে ধর্মচিন্তায় আলোকিত করতে চাইলেন তা তাঁর অনন্যসাধারণ ও অনাড়ম্বর আধ্যাত্মিক সাধনার সাক্ষ্য হলেও ঔপনিবেশিক সমাজের শোচনীয় বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে তার যাথার্থ্য প্রশ্নাধীন, উপরন্তু তা একান্তরূপেই প্রাচীন অর্থাৎ যাকে অনেক সময় হিন্দু ভারতবর্ষ বলা হয় সেই ভারতবর্ষের মর্মমূল থেকে উৎসারিত এবং হিন্দুত্ব ও ভারতবর্ষীয় সামাজিক আদর্শের মধ্যে তিনি স্বয়ং সমীকরণ সম্পন্ন করেছিলেন ১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে।

অবশ্য এই পর্যন্ত রবীন্দ্রমানসের যে-প্রকাশ দেখা যায় তা যেমন রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অথবা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে বিশেষ আত্মপ্রসাদ-জনক তেমনই বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী কালে তাঁর মতামত একই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগায় শুধুই বিক্ষোভ, কেননা সম্ভবত তিনিই প্রথম হিন্দু যিনি দেশীয় সমাজের জনোপকরণের স্বরূপ অনুধাবন করে বিরোধমূলক হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের জন্যে হিন্দু সম্প্রদায়কেই অভিযুক্ত করেন ১৩১৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধটিতে। একই নামে পূর্বে রচিত প্রবন্ধে তিনি ব্যাধি নির্ণয় করেছিলেন দেশীয় ধর্মসাধনার অস্বাভাবিকতা, কিন্তু এবারে নির্ণয় করলেন যে মুসলমানকে প্রতি পদে অপমান করার হিন্দুজ বৃত্তিটাই আসল ব্যাধি এবং 'আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমতো প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।' পাপের উল্লেখমাত্র নয়, তার প্রকৃত বিরোধাত্মক স্বরূপকেও তিনি উল্লিখিত প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেশের জাগ্রত হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি, অতএব তিনি নিজেও যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ওই পাপের অংশীদার তজ্জনিত তাঁর গভীর মর্মদাহ প্রবন্ধটির প্রতি ছত্রে অব্যর্থ রূপে পরিস্ফুট। কিন্তু মেনে নেওয়াই সমীচীন যে বর্ণের ও জাতের বিচারে যে ধর্মাবলম্বীরা আপনাতেই বহুধা খণ্ডিত তারা বিভাগ ও বিচ্ছেদের কল্পনাকে যে অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গে বিরোধের কল্পনাতে পরিণত করতে পারে এসত্য বঙ্গভঙ্গের পূর্ববর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের চেতনাতেও অনুমিত হয়নি।

সেই হিন্দুমেলার যুগে কবি হিসেবে জনসমক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশের কাল থেকে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চেতনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতর মনীষার সমস্ত প্রধান লক্ষণেই তা

আক্রান্ত—একই সীমাবদ্ধতাতে জর্জরিত আবার একই প্রাণপ্রেতিতে উদ্বেলিত, যা অধিকন্তু তা হলো মানবিক বিষয় সংক্রান্ত প্রাচুর্যের সঙ্গে সৃষ্টি-রহস্যের আনন্দে আপ্লুত সৌন্দর্য-চেতনার অশ্রুতপূর্ব সহাবস্থান, এবং ভারতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচনে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও আদপেই মৌল নয় অর্থাৎ সমকালের দুজন পুরুষই ভারতীয় সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে সেই একই যুগের জয়গানে মুখর যা হিন্দু সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও বিস্তারের যুগ বলে সাধারণ্যে চিহ্নিত যা বিচিত্র ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী-কৌম কর্তৃক আনীত বহুতর শোণিতধারার মধ্যে সমন্বয় ও সাযুজ্য সম্পাদনে বিস্ময়কর দক্ষতার যুগ। কিন্তু এর সরল তাৎপর্য এই যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যখন ইসলাম এল, ভারতীয় জনসাধারণের একটা অংশের মনে স্থান করে নিল তখন যে-যুগের সূচনা হলো সে-যুগটা ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত, গুরুত্বহীন, উপেক্ষণীয়, সে-যুগটা যেন এতই অলীক ও অবাস্তব যে তার সম্বন্ধে কোন উল্লেখেরই প্রয়োজন নেই, নীরবতাই সেখানে প্রকৃত মনোভাবের সঙ্গত প্রকাশ। যে বাঙালী সমাজে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যায় অধিক সেখানেও এ-জাতীয় মনোভাবের পরিণাম যে সুযোগ সন্ধানীদের হাতে কোন অস্ত্র তুলে দিতে পারে তা বোঝা গেল হিন্দু মুসলমানের জনসংখ্যার ভিত্তিতে বঙ্গবিচ্ছেদের প্রস্তাবে এবং এদিক থেকে ওই প্রস্তাব যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমনই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।

ভারতীয় ইতিহাসে বঙ্গবিচ্ছেদ ঘটনাটির তাৎপর্য এই যে এতকাল জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে ছিল ব্রিটিশ শাসনের সহযোগী একটি আন্দোলন, কিন্তু বঙ্গ বিচ্ছেদের সূত্রেই এই আন্দোলনের ধারা সহসা তীব্র বাঁক নিয়ে ধরল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী একটি আন্দোলনের রূপ। এই সন্ধিক্ষণেই রবীন্দ্রনাথও হৃদয়ঙ্গম করেন যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, নেতাদের পূর্ব-পরিকল্পনার জন্যেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, সর্বভারতীয় চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে, কেননা সে আন্দোলনের দুয়ার মুখ্যত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্যেই অবারিত, এবং তাই এই সন্ধিক্ষণের অব্যবহিত পূর্বে রচিত 'ভুবনমনোমোহিনী' প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন, 'এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্র সভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত।' নিজের রচনার বিচারে রবীন্দ্রনাথ একান্ত রূপে হিন্দুত্ব-ব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, অন্যেরা দেখাননি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রমুখের রচনা ও ভাষণ হিন্দু-

অহিন্দু নির্বিশেষে সবাইকে সমান ভাবে উদ্বোধনে সমর্থ, বরং উল্টোটাই সত্য—কেননা আপাত দৃষ্টিতে তাঁদের সামগ্রিক তাৎপর্য হিন্দু সংস্কৃতির আধারেই বিধৃত, ফলে তাঁদের অনুধ্যানের সঙ্গে অহিন্দুদের মানসিক ঐকানুভূতিতে একটা বাস্তব বাধা থেকেই যায় এবং কখন কখন তাঁদের রচনাবলী মুসলিম বিরোধী মনোভঙ্গির জন্মদাতাও বটে। বিপিনচন্দ্র পালের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তিনি ও তাঁর সমকালীন যুবকবৃন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপাঠে মুসলমান-বিরোধী মনোভঙ্গি লাভ করেছিলেন, যদিও একই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা তাঁদেরকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম ধর্মসম্প্রদায় ইত্যাদি দিয়ে ভারতীয় সত্তাকে চিহ্নিত না করে রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের সাদৃশ্যে ও সাযুজ্যে ভারতীয় সত্তা জাগরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও শাসনের অত্যুৎসাহী গুণগ্রাহী এবং ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রূপেই তিনি জীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত সমস্তরের এক কর্মচারীর ব্যক্তিগত অবিচারে বহুল নিনাদিত ব্রিটিশের জাতীয় উদারতা সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ হয়, সে সঙ্গে তিনি এই নির্মম ও প্রয়োজনীয় সত্যটি আবিষ্কার করেন যে ওই ধরনের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার শুধু রাষ্ট্রনৈতিক অর্থে ভারতীয় জাতি গঠনের পথেই সম্ভব। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় অবগাহন করে সুরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য আদর্শে জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই ধর্মের প্রসঙ্গ তাঁর কাছে গৌণ প্রতিভাত হয়েছিল এবং বহু ধর্ম সংবলিত ভারতীয় জাতিগঠনের সমস্যার সরল সমাধান করে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দেই উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'In the name, then, of a common country, let us all, Hindus, Musalmans, Christians, Parsees, members of the great Indian Community, throw the pall of oblivion over jealousies and dissensions of bygone times and embracing one another in fraternal love and affection, live and work for the benefit of our beloved fatherland.' একই বছরে শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুগামী যুবকদের সহায়তায় ও সমর্থনে তিনি ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন এবং তারপর সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে একটি অখণ্ড ও সর্বব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে দু বছর ধরে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনই প্রথম ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এবং এর অন্যতম

কার্যক্রম ছিল, 'to promote friendly feelings between Hindus and Muslims' এই সমিতি জন্মক্ষণ থেকেই ব্রিটিশ শাসকদের দারুণ দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়েছিল এবং ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও প্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্যে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিনের পরামর্শে ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন সচিব অ্যালান অক্টেভিয়ন হিউমের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় ব্রিটিশ শাসনের গুণগ্রাহী এক দেশীয় পক্ষ সংগঠন করাই লর্ড কর্ণওয়ালিসের পরিকল্পনা ছিল তেমনই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে লর্ড ডাফরিনের উদ্দেশ্য ছিল ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের বিপরীতে ব্রিটিশ শাসনের পরিপোষক এমন এক দেশীয় পক্ষ সৃষ্টি করা যার কাজ হবে দেশীয় স্বার্থের রক্ষক সেজে ব্রিটিশ স্বার্থ সাধন করা অর্থাৎ ভিতরে ব্রিটিশের বন্ধু থেকে বাইরে দেশবাসীর বন্ধু হওয়া। বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ব্রিটিশ চাতুর্যের মোকাবিলা করার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন অভিনব রণকৌশল। ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে তিনি সদলবলে যোগ দিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে এবং কংগ্রেসের ভিতরে ঢুকে ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্যে সচেষ্ট হলেন, ফলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনেই কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনের লক্ষণ সূচিত হলো। আপন আশীর্বাদপূত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরিত্র ও প্রকৃতির রূপান্তরে লর্ড ডাফরিনের হতাশা ও বিক্ষোভ ১৮৮৮-এর ৩০শে নভেম্বরে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ ডে উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে বিস্ফোরিত হলো এবং কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্বকে 'microscopic minority' রূপে তিনি বর্ণনা করলেন। ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান রূপে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে খাড়া করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়াতে দেশীয় মানসে রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হলো; অতঃপর ব্রিটিশ সরকার তৎপর হলো রাজনীতির ক্ষেত্র বাদ দিয়ে অন্য কোনও ক্ষেত্রে বিভেদ সৃজনে এবং এবারে ধর্ম-সম্পর্কিত ভারতীয় পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ স্বার্থ দেখতে পেল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার সুবর্ণসুযোগ।

ব্রিটিশ সরকারের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত অবস্থায় ভারতীয়দের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী তারা গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী তাদের থেকে বিচ্ছিন্নরূপে নিজেদের জাগ্রত চেতনাকে বহুতর আধুনিক লক্ষণে সুশোভিত করে তুলেছিল। যে-শিক্ষার থেকে উক্ত

আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া প্রেরণা ও নির্দেশনা লাভ করেছে তার পীঠস্থান হিন্দু কলেজ শুধুমাত্র নামেই হিন্দুত্বে চিহ্নিত নয়, সেখানে দেশীয় জনসাধারণের বৃহৎ অংশেরই অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশাধিকার পর্যন্ত ছিল না। নবজাগরণের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দুটি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিচারে ও সংস্কারে বিশ্বাসে ও মূল্যবোধে বহু পল্লবগ্রাহী পার্থক্য এবং একথাও অনস্বীকার্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু ধর্মাবলীর আচরণ ইসলাম ধর্মাবলম্বীর প্রতি অপমানসূচক। এই বিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৫৭র গণ অভ্যুত্থানের পরে, যখন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হলো শুধু প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসকে অবলম্বন করে তখন তার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা গেল স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতিরূপে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দেরকে সংগঠন করার দিকে; ধর্মীয় প্রসঙ্গের উপরে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির ভাষা অথবা মহাদেব গোবিন্দ রানাডের অর্থনীতির ভাষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগায়নি, পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ, টিলক প্রভৃতির ধর্মের ভাষা দেশবাসীর বৃহত্তর অংশকেই ভাবাবেগে উত্তাল করে তোলে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ধর্মের ভাষায় ও মাধ্যমে রাজনীতির চর্চা করাই ভারতীয় প্রথা হিসেবে সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে ওঠে এবং একারণেই সুভাষচন্দ্র বসুও পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দকে বর্ণনা করেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক জনক রূপে।

আদর্শ-বোধ আর ইতিহাস-বোধ এক জিনিস তো নয়ই, বরং বহু ক্ষেত্রে তা পরস্পর-বিরোধী: প্রাচীন যুগের ভারতীয় আদর্শের পরিসরে বিদেশাগত রক্তধারাগুলির মিলন সংঘটনের ও মধ্যযুগের পরিসরে বিদেশাগত ধর্মগুলির সমন্বয় সাধনের প্রয়াস প্রকট, কিন্তু যে-ঐতিহাসিক ধারা থেকে মধ্যযুগের আদর্শের উদ্ভব তাকে উজানে ঠেলে প্রাচীন যুগের আদর্শে নিয়ে যাওয়ার উনিশ শতকীয় চেষ্টা আসলে বাইরের সুবিধাসন্ধানীদেরই সহায় হিসেবে প্রমাণিত হয়।

প্রাচীন যুগে ভারতীয় আর হিন্দু শব্দ দুটি সমার্থবাচক ও বিশেষ ভৌগোলিক আধারে বিধৃত ছিল, মধ্যযুগে হিন্দুর সংজ্ঞা সঙ্কুচিত হলো, কেননা ইসলামের মতো তা ধর্মবাচক অর্থে আশ্রয় নিল, পক্ষান্তরে ভারতীয়ের সংজ্ঞা হলো বিস্তৃততর, কেননা ওই শব্দের উদার পক্ষপুটে আশ্রয় পেল অন্যান্য বিদেশাগত ধর্মাবলম্বীরাও এবং মনে রাখা ভালো যে এ যুগে শুধু মুসলমানরাই নয়, খ্রীস্টান,

পারসী, ইহুদীরাও ভারতবর্ষের নানা স্থানে আবাস সৃষ্টি করে। প্রকৃত পক্ষে যে-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে 'হিন্দু' শব্দের ঘটে সংজ্ঞার সঙ্কোচন এবং 'ভারতীয়' শব্দটির সংজ্ঞার প্রসারণ ঘটে সে-প্রক্রিয়াটির মর্ম উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্বোধকগণ অনুধাবন করেননি এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে ওইসব মনীষীদের মনোভাব যে-পরিমাণ সসম্ভ্রম ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরা সে-পরিমাণ সচেতন নন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠন প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন ও হিন্দু নেতাগণ—মুসলিম দুর্দশা ও মুসলিম উন্নতির জন্যে সৈয়েদ আহমেদের প্রয়াস—আহমেদের সত্যসন্ধ ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন—আলিগড় আন্দোলন ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের পেছনে ব্রিটিশ প্ররোচনা।]

দৈহিক গঠন অনুসারে একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব-সমষ্টিকে ইংরেজীতে বলে 'স্পিসিজ', বাংলায় প্রজাতি; যেমন মানুষ প্রজাতি; এর বিভাগকে বলে 'রেস'—বাংলায় 'রেস' শব্দটির কোনও যথার্থ প্রতিশব্দ নেই, তবে ব্যবহার থেকে উদ্ভূত অর্থ অনুসারে জাতি বলা যায়, যেমন মোঙ্গল বা পীত জাতি; যাদের চীনা বলা হয় তারা মোঙ্গল জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং চীনারা এক শুদ্ধ জাতি অর্থাৎ চীনাদের মধ্যে অন্য জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচ্ছন্ন; কিন্তু যাদের ভারতীয় বলা হয় তারা কোনও শুদ্ধ জাতি নয়, বহু জাতির সংমিশ্রণে গঠিত তারা এক সংকর জনসমষ্টি। অধিকাংশ ভারতীয়দের ধর্মই হিন্দু, হয়তো এজন্যেই ভারতীয় আর হিন্দু শব্দ দুটি সমার্থে ব্যবহৃত হয়—এর ফলে হিন্দুর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে: উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দাবি ওঠে যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এক অখণ্ড ও সম্পূর্ণ জাতি, কিন্তু এই দাবির অসারতা স্পষ্ট হয়ে যায় নেপালের প্রসঙ্গ উত্থাপনে, যেহেতু অধিকাংশ নেপালীর ধর্ম হিন্দু তাই হিন্দু ও ভারতীয় সমার্থবোধক হলে একথাও মানতে হয় যে অধিকাংশ নেপালীই আসলে ভারতীয়। আবার হিন্দুধর্মাবলম্বীরা এক জাতি এমন দাবি তোলার অনেক আগে থেকেই বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের উপবর্ণকে বোঝাবার জন্যেও জাতি শব্দটির বহুল প্রচলন ছিল, যেমন কায়স্থ কোনও বর্ণ নয়, তা একটি বিশেষ জাতি এবং উপবর্ণের অর্থে জাতির কোনও প্রতীচ্য প্রতিশব্দ নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রতীচ্যে 'নেশন' শব্দটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আর সেসঙ্গে মুখ্যত ইতালী ও জার্মানীতে রাজনীতি-ভিত্তিক নেশন গঠনের তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। লক্ষণীয় যে একই আন্দোলন একই শতাব্দীতে ভারতবর্ষেও শুরু হয়—তফাৎ এই যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 'ন্যাশনালিজম্' শুধু রাজনীতির ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে না, তা এখানে ধর্মের ক্ষেত্রেও ভিত্তি খুঁজে পায়, উপরন্তু

ধর্মের উপরেই ওই 'ন্যাশনালিজম্'-এর ভার বেশি চাপানো হয়। প্রকাশ থাকে যে 'নেশন'-এর ভারতীয় প্রতিশব্দ হলো জাতি আর 'ন্যাশনালিজম্-'এর হলো জাতীয়তাবাদ। লক্ষ্যের গুণগত বিচারে ইয়োরোপীয় জাতীয়তাবাদ আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য নগণ্য, দুয়ের জন্ম শতকও একই, কিন্তু ভিত্তির গুণগত বিচারে দুয়ের স্বাতন্ত্র্য একান্তই মৌল, কেননা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাধারণ ভাবে বহু উপপ্রজাতির অর্থাৎ 'রেস' অর্থে জাতির সংমিশ্রণ স্বীকার করেও ধর্মীয় প্রসঙ্গে শুদ্ধতারই পরিপোষক এবং সেই শুদ্ধতার যুক্তিতে উপস্থাপিত হয় শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে 'নেশন' অর্থে এক অভিনব জাতিগঠনের সূত্র।

এখন ভালো করে বোঝা দরকার যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল সমস্যা কোনখানে। প্রথম সমস্যার আভাস আগে দেওয়া হয়েছে, হিন্দুমাত্রেই যদি এক জাতি হয় তাহলে নেপালের হিন্দুরা কোন জাতি হবে? পরের প্রশ্ন, বহুকাল ধরে যারা ভারতবর্ষে বসবাস করে আসছে শুধু তারাই যদি ভারতীয় জাতি হয় তাহলে বাংলা, কেরল প্রভৃতি অঞ্চলের বিপুলসংখ্যক অহিন্দুরা কোন জাতিরূপে গণ্য হবে? ধর্মই যদি জাতি বিচারের মানদণ্ড হয় তাহলে যেসব ভারতীয় কোন-না-কোন কারণে ধর্ম বদল করেন, যেমন করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁদেরকে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় বা হিন্দু জাতি বলতে শুধু ভারতবর্ষে বসবাসকারী হিন্দুদেরই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসেবেই গণ্য করা হয়েছিল এবং স্পষ্টতই সেই জাতির ধারণা থেকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে বিদেশী জনোপকরণ হিসেবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যাদেরকে বাদ দেওয়া হলো তারা কি স্রোতে ভাসমান জনোপকরণ হিসাবে সন্তুষ্ট থাকবে নাকি তারাও নিজেদেরকে একটি জাতি, একটি পৃথক জাতি হিসাবে সংগঠনে প্ররোচিত হবে?

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতির ধারণা প্রতিষ্ঠার ফলে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের মাটিতে একাধিক জাতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার অতিশয় অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হলো। সোজা বাংলায়, ধর্মীয় সূত্রে একটি জাতির জন্মের লগ্নেই রোপিত হলো একই সূত্রে আরও জাতির জন্মের অমোঘ ও অব্যর্থ বীজ। বহু ধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষের একটি ধর্মাবলম্বীরা জাতি হিসাবে উত্থিত হবে আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা তার নীরব ও নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে চিরকাল হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এটা আশা করাই বাতুলতা।

ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পরেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা

সব চাইতে বেশি, স্থতরাং হিন্দুরা অখণ্ড, পৃথক ও সম্পূর্ণ জাতি হিসেবে বিকশিত হলে অনিবার্যভাবেই মুসলিমরাও একই পথ অনুসরণ করল। আর মুসলিম জাতির কল্পনা যে-আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয় তা পরিচিত হলো আলিগড় আন্দোলন নামে অথচ এই আন্দোলনের জনক সৈয়েদ আহমেদ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন আধুনিক উদার সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ব্যক্তি রূপে। যে-বছর কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় সেই ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী রূপে তিনি জীবন শুরু করেন। ১৮৫৭-র জনোত্থানের সময় তিনি বিজনোরের সদর আমিনের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং জনসাধারণ ও ব্রিটিশ কর্মচারীদের মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে তুলে তিনি রক্ষা করেছিলেন সেই এলাকার ইয়োরোপীয়দের প্রাণ ও সম্পত্তি। সৈয়েদ আহমেদের বুদ্ধিমত্তা, কর্মক্ষমতা ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের মূল্য বুঝতে উর্ধ্বতন ব্রিটিশ কর্মচারীদের দেরি হয়নি, কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা যখন তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইল তখন তিনি কোনও ব্যক্তিগত স্থযোগ-স্থবিধা গ্রহণে অক্ষমতা জানালেন, পরিবর্তে এমন কিছু ব্যবস্থা প্রার্থনা করলেন যা দিয়ে ওই অঞ্চলের জনসাধারণ উপকৃত হবে। সঙ্গত কারণেই তাঁর জনোপচিকীর্ষার মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে একটা বিশেষ স্থান ছিল, কেননা কোম্পানী শাসনের আমল থেকে মুসলিমরাই অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত হয় এবং মুসলিমদের ওই দুর্দশার জন্যে তিনি মুসলিমদের অত্যধিক রক্ষণশীলতাকেই মূল কারণ হিসাবে নির্ণয় করেন, স্থতরাং তাঁর নির্ধারিত কর্মপন্থার প্রধান লক্ষ্য হলো ওই রক্ষণশীলতা ও কূপমণ্ডুকতা দূর করা।

আলিগড় আন্দোলনের আগে ভারতীয় মুসলিমদের অবস্থা প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন আর. এম. সায়ানি—১৮৯৬-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সায়ানি বলেন, 'By a stroke of misfortune, the Musalmans had to abdicate their position and descend to the level of their Hindu fellow-countrymen. The Hindus who had before stood in awe of their Musalman masters were thus raised a step by the fall of their said masters, and with their former awe dropped their courtesy also. The Musalmans, who are a very sensitive race, naturally resented the treatment and would have nothing to do either with their rulers or with their fellow-

subjects. Meanwhile the noble policy of the new rulers of the country introduced English education into the country. The learning of an entirely unknown and foreign language, of course, required hard application and industry. The Hindus were accustomed to this, as even under the Musalman rule, they had practically to master a foreign tongue, and so easily took to the new education. But the Musalmans had not yet become accustomed to this sort of thing, and were, morever not then in a mood to learn, much less to learn anything that required hard work and application, especially as they had to work harder than their former subjects, the Hindus. Moreover, they resented competing with the Hindus, whom they had till recently regarded as their inferiors. The result was that so far as education was concerned, the Musalmans who were once superior to the Hindus now actually became their inferiors. Of course, they grumbled and groaned, but the irony of fate was inexorable. The stern realities of life were stranger than fiction. The Musalmans were gradually ousted from tneir lands, their offices ; in fact everything was lost save their honour. The Hindus, from a subservient state, came into the lands, offices and other worldly advantages of their former masters. Their exultation knew no bounds, and they trod upon the heels of their former masters. The Musalmans would have nothing to do with anything in which they might have to come into contact with the Hindus. They were soon reduced to a state of utter poverty. Ignorance and apathy seized hold of them while the fall of their former greatness rankled in their hearts'

অনীহা কাটিয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আধুনিক চিন্তাভাবনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে কৌতূহল সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পায় ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে আবদুল লতিফ কর্তৃক কলকাতায় মহামেডান লিটারেরি সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় ; পরে

এর নামকরণ হয় সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন। উল্লেখ্য যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও এই সমিতির সদস্য হতে পারত। কিন্তু একান্তরূপে ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা তাঁদের ছিল না।

আরও লক্ষণীয় যে এখন থেকে মুসলিম বা মুসলমান শব্দটির পরিবর্তে মহামেডান শব্দটি চালু করা শুরু হলো—আপাত দৃষ্টিতে মুসলিম ও মহামেডান সমার্থবাচক হলেও শব্দ দুটির তাৎপর্য স্বতন্ত্র, কেননা মুসলিম মানে আল্লাহ্‌র জন্যে উৎসর্গিত এবং মহামেডান শব্দটির মানে মহম্মদের অনুসারক অথচ মহম্মদের মহিমা শুধু এটুকুই যে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা ও আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক।

অতঃপর ধর্মীয় ভিত্তিতে হিন্দুমেলা ও জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে নবাব আমীর আলী খানের উদ্যোগে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় মুসলিমদের হিতসাধন ও রাজনৈতিক জাগরণের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইংরেজী শিক্ষার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আস্তে আস্তে চেতনা জাগতে থাকে এবং ১৮৬৮-র ১০ই জানুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আবদুল লতিফ সহকর্মীদের প্রতি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানান আর সেসঙ্গে কলকাতা মাদ্রাসার অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগকে একটা কলেজের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ১৮৭৩-এ হাজী মহম্মদ মহসীনের অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে বাংলার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষার জগতে প্রবেশে বিশেষ সুগম ও সহজ হয়, কেননা তিনি এরূপ ব্যবস্থা করেন যে অতঃপর ইংরেজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্রদের প্রত্যেকের শিক্ষার দরুন বেতনের দুই তৃতীয়াংশ মহসীন ট্রাস্ট ফণ্ড বহন করবে। এর ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সীর ইসলাম ধর্মাবলম্বী জন সাধারণ অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে আধুনিক শিক্ষায় অনেক বেশি এগিয়ে যায়: হিসাবে দেখা যায় যে ১৮৮১-২ খ্রীস্টাব্দে বাংলার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ৩৮৩১, অন্য পক্ষে মাদ্রাজে ১৭৭, বোম্বাইয়ে ১১৮, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি একত্র করে ৬৯৭ আর পাঞ্জাবে ৯১ এবং আরও দেখা যায় যে ১৮৫৮-৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৯০ জন, বোম্বাই থেকে ৩০ জন, পাঞ্জাব থেকে ১০২ জন আর এলাহাবাদ থেকেও ১০২ জন মুসলিম গ্র্যাজুয়েট হন। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের চাইতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আধুনিক সংস্কৃতিতে অনেক পেছিয়ে ছিল আবার বাংলা প্রেসিডেন্সীর মুসলিমদের চাইতে অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিমরা ছিল আরও অনেক বেশি পেছিয়ে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মুসলিম জনসাধারণের যে-উত্থান মুখ্যত আবদুল লতিফ ও হাজী মহম্মদ মহসীনের নেতৃত্বে হয় তার লক্ষ্য ছিল আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করা এবং শিক্ষিত হিসেবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী দেশীয়দের সঙ্গে চাকুরি ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। পক্ষান্তরে উত্তর ভারতে তখন চলেছে ব্রিটিশদের প্রচণ্ড দমনমূলক অভিযান : ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল মুখ্যত ব্রিটিশ বিরোধী এবং তাতে যারা অংশ নিয়েছিল তারা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী—এই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ব্রিটিশরা ধরে নেয় যে ১৮৫৭-র ব্রিটিশ-বিরোধী জনোত্থানও আসলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরই কাজ, তাই তাদের আক্রোশমূলক দমনাভিযানের শিকার হয় উত্তর ভারতের মুসলিম জনসাধারণই বেশি। এ-সময়ে সৈয়েদ আহমেদ ব্রিটিশ আক্রোশের হাত থেকে সমধর্মীদের বাঁচাবার জন্যে প্রচার করতে থাকেন যে মুসলিমরা কোনও সময়েই ব্রিটিশ বিরোধী নয়, তাদের ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল শিখদের বিরুদ্ধে আর ১৮৫৭-র জনোত্থানে মুসলিমরা অংশ নেয়নি, যদি নিয়েও থাকে তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়, সুতরাং মুসলিমদের উপরে ব্রিটিশদের দমনাভিযান অবিলম্বে বন্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের প্রবণতা যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তনের দিকে ছিল সে সত্যও সম্ভবত সৈয়েদ আহমেদ অনুধাবন করেন। এবং সেসঙ্গে আবিষ্কার করেন যে আধুনিকতার পথকে উত্তর ভারতের অধিবাসীরা নিজেদের মূঢ়তা দিয়ে রুদ্ধ করে রেখেছে। সরকারী চাকুরির সূত্রে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে রামমোহনের মতো তিনিও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পান ও অনুভব করেন যে আধুনিকতাই ভারতবর্ষের মুক্তির পথ। এই উপলব্ধি থেকে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লীর সন্নিকটে গাজীপুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন ট্র্যানস্লেশন সোসাইটি যা পরবর্তী কালে বিবর্তিত হয় সায়েন্টিফিক সোসাইটি অব আলিগড় নামক ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে উত্তর ভারতীয় জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নতি সাধক প্রতিষ্ঠানে। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান তথা আধুনিক ধ্যানধারণাকে দেশীয় জনগণের কাছে, বিশেষত মুসলিম জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া, কেননা তিনি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে 'to cultivate our intellects and to conform ourselves to the age' হলো ভারতবর্ষের গৌরব উদ্ধারের অদ্বিতীয় পন্থা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সায়েন্টিফিক সোসাইটির কর্মসূচী ছিল বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিদ্যা বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থগুলি

উর্দুতে অনুবাদ করে উর্দুভাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিবরণ করা ও একটি দ্বিভাষী পত্রিকার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার বিষয়ক উদার চিন্তাধারার প্রচার করা।

অর্থাৎ সৈয়েদ আহমেদের লক্ষ্য ছিল দুটি : একদিকে ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও ভাবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে মুসলিম মানসে ঔৎসুক্য ও পক্ষপাত জাগানো। ইংরেজদের তিনি বোঝাতে চাইলেন যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়রা ইংরেজদের শত্রু তো নয়ই, বরং তারা ইংরেজদের সহায় হতে ইচ্ছুক, সুতরাং মুসলিমদের প্রতি ইংরেজদের অসূয়া শুধু অনর্থক নয়, অসঙ্গতও বটে ; পক্ষান্তরে একথাই তিনি মুসলিমদের বোঝাতে চাইলেন যে মুসলিমের ভবিষ্যৎ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা অর্জনের উপরেই মুখ্যত নির্ভরশীল। ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতারা মনে করতেন যে কোরানে বর্ণিত জেহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, কিন্তু সৈয়েদ আহমেদ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদের আহ্বানকেই শাস্ত্র-বহির্ভূত ও স্বার্থ প্রণোদিত একটি কর্মপন্থা রূপে সমালোচনা করলেন এবং জানালেন যে ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানে যে সব মুসলমান অংশ নিয়েছিল তারা সকলেই ভ্রান্ত। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বহু আচরণ ও মনোভাবের তীব্র সমালোচনায় তিনি দেখালেন উদারতা ও সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা এবং ধর্মান্ধ মুসলিমরা প্রত্যুত্তরে তাঁকে বিধর্মী আখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না. তাঁকে গোপনে হত্যা করার হুমকিও দিলেন। ধর্মান্ধতা যেমন ধর্মীয় প্রসঙ্গে বিচারশক্তিকে বিনষ্ট করে তেমনই অন্য যে কোনও প্রসঙ্গের অন্ধতা একই ফলোৎপাদন করে : ধর্মীয় প্রসঙ্গে সৈয়েদ আহমেদের অন্ধতা ছিল না, কিন্তু তাঁর অন্ধতার ক্ষেত্র ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে—যা-কিছু পাশ্চাত্য সবই তাঁর কাছে প্রতীত হয়েছিল সমালোচনার অতীত মহীয়ান বিষয় রূপে। ১৮৬৯-এর ১৫ই অক্টোবর তিনি এক চিঠিতে লেখেন, "Without flattering the English, I can truly say that the natives of India, high and low, merchants and petty shop-keepers, educated and illiterate, when contrasted with the English in education, manners, and uprightness, are as like them as a dirty animal is to an able and handsome man. Do you look upon an animal as a thing to be honoured? Do you think it necessary to treat an animal courteously," or the

reverse ? You do not ! We have no right to courteous treatment. The English have reason for believing us in India to be imbecile brutes' এই পত্রাংশ থেকে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের বিপরীতে ভারতীয়দের প্রতি সৈয়েদ আহমেদের প্রকৃত মনোভাব খুবই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়; তবে মানতেই হবে যে স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা ও জুগুপ্সা কোনও দেশনেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না এবং উদ্ধৃত পত্রাংশে প্রকটিত মনোভাব যে কোনও দেশনেতার জন্যে রক্ষিত আগ্রহ ও মর্যাদা বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু লক্ষণীয় যে এখানে প্রকাশিত মনোভাবকে ইংরেজদের নির্লজ্জ পদলেহনকারীর মনোভাব বলে যদি বা চিহ্নিত করা যায় তবু কোনমতেই সেটাকে সাম্প্রদায়িক বলা যাবে না এবং যাদেরকে ঘৃণ্য পশু বলেছেন নিজেকেও তাদেরই শামিল করেছেন। ১৮৭৭-এ তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে অনুষ্ঠিত এক সভার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং বাংলা ভাষীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'The are the only people in our country whom we can properly be proud of, and it is only due to them that knowledge, liberty and patriotism have progressed in our country. I can truly say that really they are the head and crown of all the different communities of Hindusthan' পাঞ্জাবীদের এক সভাতে তিনি ঘোষণা করেন যে হিন্দুস্তানের অধিবাসী মাত্রেই হিন্দু যদিও সে ইসলাম খ্রীস্টান বা অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী হতে পারে, অর্থাৎ হিন্দুর পরিচয় ধর্মভিত্তিক নয়, তা দেশভিত্তিক এবং একথার পরে তিনি যোগ করেন, 'I am therefore sorry that you do not regard me as a Hindu.' একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে ১৮৮৪-তে প্রদত্ত তাঁর আর-এক বক্তৃতায়, 'Remember that words Hindu and Mahomedan are only meant for religious distinction—otherwise all persons, whether Hindu or Mohomedan, even the Christians who reside in this country, are all in this particular respect belonging to one and the same nation.' এইটে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে জাতি সম্পর্কিত ধারণাতে সৈয়েদ আহমেদ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের অধিকাংশ নেতাদের চাইতে বাস্তব চেতনার পরিচয় দিয়েছেন এবং সুস্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে ভারতবর্ষে বসবাসকারী ব্যক্তি সকলেই একটি ও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণভাবে বলা যায় যে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়েদ আহ্‌মেদের ব্যক্তিত্ব একটি বিশেষ ধারায় বিবর্তিত হয়েছে এবং সে বিবর্তন প্রকৃতই অনন্য। ১৮৮৪ পর্যন্ত তাঁর যে-ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সে-ব্যক্তিত্ব জন মানুষ, আচার-বিচার, জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি তাবৎ বস্তুর ইয়োরোপীয় সংযোগ অর্থাৎ যাবতীয় ইয়োরোপীয় বস্তু সম্বন্ধেই ভক্তিতে এত আপ্লুত যে অনেক সময় মনে হয় তা লজ্জাশীলতার সীমা লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু মনে রাখা উচিত সে-ব্যক্তিত্ব কোনমতেই সাম্প্রদায়িক নয়, পরধর্মদ্বেষী নয় ধর্মীয় প্রশ্নে অসহিষ্ণু নয়, ধর্মীয় ভিত্তিতে জাতিসত্ব ধাবনে সে-ব্যক্তিত্ব নিশ্চিত রূপেই অপ্রস্তুত এবং যেকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দু একজন ব্যতিক্রান্ত পুরুষকে বাদ দিলে অধিকাংশ দেশনেতাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এক নতুন মহান জাতি গঠনের কল্পনায় উদ্দীপিত তখন সৈয়েদ আহ্‌মেদ ভারতীয়ের যথার্থ সমৃদ্ধ সংজ্ঞা সন্ধান করেছেন ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমষ্টিগত সত্তায়। কিন্তু সে-ব্যক্তিত্ব যে অকস্মাৎ কতখানি মৌল রূপে পরিবর্তিত হয় তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে মীরাটে প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত ভাষণটি: 'Now suppose that all the English were to leave India, then who would be rulers of India? Is it possible that under these circumstances two nations, the Muhammadan and the Hindu, could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable.' এটা বুঝতে কোনও অসুবিধেই হয় না যে ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৮-র মধ্যে এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে সৈয়েদ আহ্‌মেদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব আমূল পরিবর্তিত হয়েছে।

১৮৮৪ পর্যন্ত সৈয়েদ আহ্‌মেদের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী কী? ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি গাজীপুরে ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; পাঁচ বছর পরে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড ভ্রমণে যান এবং পাশ্চাত্য উন্নতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন, ফলে অকসফোর্ড বা কেমব্রিজের আদর্শে স্বদেশবাসীদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কল্পনা তাঁর মনে জাগে; তাঁর সে-কল্পনাকে তিনি অবশেষে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হন—ওই বছর তাঁর প্রাণান্ত প্রয়াসের পরিণামে লর্ড লিটন কর্তৃক ৮ই জানুয়ারি মহামেডান

অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি ধর্ম নির্বিশেষে সকল অবস্থাপন্ন ভারতীয়েরই সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং পাতিয়ালার নবাব, ভিজিয়ানাগ্রাম ও বেনারসের মহারাজাদ্বয়, মহারানি স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছিলেন। কলকাতার হিন্দু কলেজের দ্বার শুধু মুসলিমদের জন্যে নয়, নিম্নবর্ণ হিন্দুদের জন্যেও রুদ্ধ ছিল এবং বিংশ-শতাব্দী পর্যন্ত এই কলেজ বহুল পরিমাণে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব বজায় রেখেছে, কিন্তু সৈয়েদ আহমেদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেজের দ্বার প্রথম থেকেই সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্যে ছিল অবারিত। সাত বছর পরে স্যার উইলিয়ম হাণ্টার যখন এই কলেজ পরিদর্শন করেন তখন সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্রের সংখ্যা সাতান্ন।

সৈয়েদ আহমেদ সমধর্মীদের বোঝাতে সচেষ্ট হন যে শান্তি সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধই ইসলামের যথার্থ আদর্শ এবং ধর্মের ক্ষেত্রে বল-প্রয়োগের নীতিরীতি ইসলাম বিরোধী। অবশ্য বল-প্রয়োগ অবস্থা বিশেষে সিদ্ধ, কিন্তু তা কখন সিদ্ধ তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, 'Mahamedanism grasped the sword, not to destroy all infidels and pagans, not to force men to become Moslems at the sword's point, but only to proclaim that eternal truth, the unity of Godhead, throughout the whole extent of the then known globe.' উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলিম নবজাগরণের জনক ঘোষণা করলেন যে, যে-ব্যক্তি ইসলামের প্রসারের জন্যে বল-প্রয়োগ করে সে জন্মসূত্রে মুসলিম হলেও ধর্মসূত্রে অমুসলিম।

(তবে একথাও সত্য যে সৈয়েদ আহমেদের) চেতনায় ভারতীয় শব্দটির অর্থভুক্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে একটু বিশেষ বিবেচনা ছিল, এবং আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের জন্যে আহ্বানে তিনি পুনঃপুনঃ মুসলিম যুবকদেরই নামোল্লেখ করেছেন, কেননা জাতি হিসেবে নয়, সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমরা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পেছিয়ে ছিল এবং আধুনিকতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা-হেতু ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের প্রকৃতই একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে ভারতীয়দেরই একটা অংশের সঙ্গে ইংরেজদের ওই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোক, ভারতীয়রা ইংরেজদের লেজিসলেটিভ কাউনসিল বা আইনসভাতে যোগ দিক এবং সেখানে আধুনিকতায় দীক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ধর্ম নির্বিশেষে সব ভারতীয় সমান মর্যাদা লাভ করুক। তিনি জানতেন

যে, 'respect will be commanded only when my countrymen will be holding positions equal to those of the ruling race.'

এবার দেখা যাক ১৮৮৪ পর্যন্ত অন্যান্য কী ঘটনাবলী ঘটেছে। অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ন লীগের প্রতিষ্ঠা যা পরের বছর ৬শে জুলাই থেকে পরিচিত হয় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে। সেই বছরই ইণ্ডিয়ন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়সের নিম্নতম সীমাকে ২১ থেকে নামিয়ে আনা হয় ১৯-এ; তখনকার দিনে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় খুবই কম সংখ্যক ভারতীয় প্রতিযোগিতা করত এবং যারা করত তারা ছিল বিশেষ ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের সন্তান, কিন্তু তাদের পরীক্ষার বয়ঃসীমা নিয়েই সুরেন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন এক সর্বভারতীয় আন্দোলন —এখানে প্রকাশ থাকে যে সুরেন্দ্রনাথের এই আন্দোলনে সৈয়েদ আহমেদ ছিলেন একজন সক্রিয় সমর্থক।

ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় এবং ওই প্রথম অধিবেশন থেকেই বোঝা যায় যে ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন যতটা নিরীহ কর্মসূচী নিয়েছে ততটা নিরীহ কর্মসূচীতে সন্তুষ্ট থাকবে না, অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের গতিই হলো সরকারের বিরোধিতা করার দিকে। এই ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন বসল দু বছর পরে। সেই একই বছরে, ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন যখন কলকাতায় বসছে, ঠিক তখনই বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। কেন, কী ভাবে, কাদের বুদ্ধিতে ও কাদের স্বার্থে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা হয় তা আজ সবই প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৫৭-র অভ্যুত্থান দমনের পরেও ইংরেজ সরকার পুনরায় অনুরূপ বিস্ফোরণের আশঙ্কায় সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত; ইংরেজদের ধারণা ছিল যে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে লাভবান জমিদার শ্রেণী চিরকাল ইংরেজদের অনুগত হয়ে থাকবে, যদি কেউ ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে দেশীয় ইংরেজ-পক্ষই তাকে শাসন করবে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের কার্যকলাপ স্পষ্টতই তাঁর ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবকে প্রকট করল, উপরন্তু জমিদার শ্রেণীর মুখ্য প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনও সুরেন্দ্রনাথের পেছনে এসে দাঁড়াল। এই যেখানে মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের মাত্রা দ্রুত পুঞ্জীভূত হবেই এবং সে-বিক্ষোভ

ফেটে পড়লে মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণী তাদের নিরস্ত করবে না বলেই মনে হয়। এ-অবস্থায় ইংরেজদের কাছে সম্ভাব্য বিক্ষোভের প্রতিকার ছিল এমন একটি দেশীয় সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যার আসল কাজ হবে ব্রিটিশ-বিরোধিতাকে যথাসাধ্য ঘুমিয়ে রাখা।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান স্থপতি অ্যালান অক্টোভিয়ন হিউম ছিলেন ইণ্ডিয়ন সিভিল সার্ভিসের প্রাক্তন সদস্য এবং তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের আশীর্বাদ নিয়েই হিউম কংগ্রেস গঠনের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। কেন তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন: 'A safety-valve for the escape of great and growing forces, generated by our own action, was urgently needed, and no more efficacious safety-valve than our Congress movement could possibly be devised'.

সোজা বাংলায় সমস্ত ব্যাপারটাকে সাজালে এই দাঁড়ায় যে, এসময় ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে পুনর্বার একটা তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে উঠছিল এবং সেই বিরোধিতা ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে পাছে ফেটে পড়ে এই ভয়ে ব্রিটিশ সরকার একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে ইণ্ডিয়ন ন্যাশনাল কংগ্রেস সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুরকম সাহায্যই করে। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডবলু. সি. ব্যানার্জী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভাষা ও প্রথা, এক কথায় যা কিছু ভারতীয় সবকিছুকেই নিম্নস্তরের জিনিস বলে মনে করতেন এবং সেসবের সংশ্রব যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতেন। ব্রিটিশ সরকার, এক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিন, আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস দেশীয় শিক্ষিত সমাজে তাদের গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার গুণকীর্তন করে তাদেরকে জনপ্রিয় করে তুলবে এবং বরাবরই দেশীয়দের হিতৈষী সেজে আসলে ইংরেজদের হিতসাধন করবে অর্থাৎ মুখে দেশীয় স্বার্থের রক্ষক হয়ে কাজে ভক্ষক হবে। কিন্তু কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের মুখে ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা সমঝোতা হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ইংরেজবিরোধী নেতাগণ ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে কংগ্রেসের মাধ্যমেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বলতে গেলে রাতারাতি ব্রিটিশ চাটুকারদের প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত হলো ব্রিটিশ সমালোচকদের প্রতিষ্ঠানে!

আপন আশীর্বাদপুষ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই রূপান্তরে লর্ড

ডাফরিনের প্রচণ্ড উষ্মা ও হতাশা বিস্ফোরিত হলো ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ৩০ শে নভেম্বর সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ ডে ডিনারে প্রদত্ত ভাষণে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত কংগ্রেসকে তিনি বর্ণনা করলেন 'microscopic minority' রূপে এবং এই অণু-পরিমাণ সংখ্যালঘুদের যে দেশবাসীর স্বপক্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করার অধিকার আছে বা থাকতে পারে তা তিনি অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে দেশবাসীর মনে যে-দেশপ্রেম জেগেছিল তার বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই কংগ্রেস এক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় এবং এই রূপান্তরণ ঘটেছিল মুখ্যত দেশের বাস্তব অবস্থার চাপে। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলার নেতাগণও প্রাদেশিক দলীয় স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের পুরোনো প্রতিষ্ঠানকে বিলীন করে দিলেন কংগ্রেসের মধ্যে এবং এভাবে আত্ম-বিলোপের অবকাশেই ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন আদর্শগত ভাবে ইণ্ডিয়ন ন্যাশনাল কংগ্রেসকে পুরোপুরি অধিকার করল, ইংরেজদের সেবা করার জন্যে সৃষ্ট কংগ্রেসকে নিয়োগ করল ভারতবাসীর সেবায়। অর্থাৎ ব্রিটিশ কূটনীতি-বিদদের ঐকান্তিক সাধনায় যে-উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্যে কংগ্রেসের উদ্ভব সে উদ্দেশ্যের পরাভব এক বছরেই অনিবার্য হয়ে উঠল এবং দেশীয় ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম যথার্থ সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে।

স্বভাবতই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের বিকাশ ও বিস্তার ব্রিটিশ কূটনীতিবিদদের গভীর শঙ্কা ও ত্রাসের কারণ হলো; অতঃপর তাঁরা ব্রিটিশ স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে অন্য কোনও পন্থা বা প্রতিষ্ঠানের অন্বেষণ শুরু করলেন। লক্ষণীয় যে ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল কংগ্রেস দুটি প্রতিষ্ঠানই প্রথম থেকেই বহু ধর্মাবলম্বী ভারতীয় সত্তার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ও তার উদ্বোধনে সচেষ্ট হয়। সুতরাং কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান শ্রীবৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করার শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো দেশীয় ঐক্যের ভিত্তিকে চূর্ণ করা এবং যেহেতু রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, বাল গঙ্গাধর টিলক, শ্রীমতী অ্যানি বেশাণ্ট প্রভৃতির প্রভাবে ভারতীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এক অনন্যতা ও স্বতন্ত্রতা বোধে আক্রান্ত হয়, তাই তার সুযোগে দেশীয় ঐক্যের ভিত্তিকে চূর্ণ করা খুব সহজসাধ্য হলো। ইংরেজ বিরোধিতার প্রবণতাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিল: হিন্দুরা তো নিজেদের আলাদা করে নিয়েইছে

আর মুসলমানরাও সব দিক থেকে পেছিয়ে পড়েছে, এই পরিস্থিতিতে যদি মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও স্বতন্ত্রতা বোধকে জাগানো যায় তাহলেই ইংরেজের কেল্লা ফতে। স্পষ্টতই ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল কংগ্রেসের মিলনের পরিণামে ভারতবর্ষের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কণ্টকহীন কর্তৃত্ব ও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা রক্ষা করার প্রধান ও প্রথম শর্ত হলো ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের মানসে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বারুদ স্তূপীকৃত করা ও তারপরে সেই বারুদের স্তূপের সঙ্গে জনসাধারণের জীবনস্তরে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক বিভেদের সলতেটিকে সাবধানে যোগ করা।

দেখা যাচ্ছে, মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বছর ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল কংগ্রেসের মিলনের বছর ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা এক নতুন বাঁকে বইতে শুরু করল : হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রভাবের বিপরীতে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী প্রভাবের বিস্তার এবং এরই মধ্যে শোনা গেল ভারতবর্ষের ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে পাশ্চাত্য আচারে-বিচারে রঞ্জিত করে তোলার জন্যে সৈয়েদ আহমেদের উদাত্ত আহ্বান। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ নিশ্চিত রূপেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ এবং যেখানে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে পাশ্চাত্য পোশাকে সাজাবার চিন্তা সম্ভব সেখানেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পেতে পারে নিজের সহায়।

যা কিছু পাশ্চাত্য তারই প্রতি সৈয়েদ আহমেদের অন্ধ আস্থা ও ভক্তি। সুতরাং পাশ্চাত্য বংশোদ্ভূত যে কোনও ব্যক্তির পক্ষেই আহমেদকে ইচ্ছামতো পরিচালনা করা সম্ভব : প্রথম সর্গেই সৈয়েদ আহমেদ অন্ধের মতো পরিচালিত হলেন থিয়োডোর বেকের হাতে—এই বেক্ সাহেব নাকি স্বদেশে আপন উন্নতির প্রশস্ত পথ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের মুসলিমদের উন্নতির জন্যে প্রাণপাত করে বিখ্যাত হয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় মুসলিমদের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগের নামে তিনি আসলে স্বদেশের স্বার্থকেই ষোলো আনা সিদ্ধ করেছেন, তাই ১৮৯৯-এ তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ্যে স্যার আর্থর স্ট্র্যাচি লেখেন, 'An Englishman who was engaged in the consolidation of the empire has disappeared from the scene.' ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে উল্লিখিত বেক সাহেব আলিগড় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হলে অচিরকালের মধ্যেই সৈয়েদ আহমেদের উপরে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন এবং সেই প্রভাব এতই অবাধ ও গভীর ছিল যে সৈয়েদ আহমেদের অনুগতরাই বলত, 'the college is of Syed

Ahmed and the order is of Beck.' শুধু কলেজের কর্তৃত্বের ব্যাপারেই নয়, আলিগড় ইনস্টিট্যুট গেজেট নামক পত্রিকার সমস্ত দায়িত্বও তিনি নিজের হাতে তুলে নেন ও সৈয়েদ আহমেদের নামে নিজেই সম্পাদনা শুরু করেন : অতঃপর নিয়মিত ভাবে একদিকে বাঙালী, অন্যদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তীব্র বিষ উদ্গার করা এই পত্রিকার এক পবিত্র কাজ হয়ে ওঠে, কিন্তু রচনাগুলির ভাষা ও শৈলীর থেকে নিশ্চিত রূপেই বোঝা যায় যে সম্পাদকীয় স্তম্ভের আড়ালে গুপ্ত যাঁর লেখনী থেকে ওগুলি নিঃসৃত হতো তাঁর মাতৃভাষা ইংরেজী না হয়েই পারে না অর্থাৎ খুব সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় যে ওগুলি আসলে ভারতবর্ষের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্যে বেক সাহেবের ঐকান্তিক উদ্যমেরই কিছু প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বেনামে বা অনামে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে কয়েকটি. নির্দিষ্ট বক্তব্যের পুনঃপুনঃ উল্লেখে বেক সাহেব এই প্রতীতি পাঠক সমাজে উৎপন্ন করতে সচেষ্ট হলেন যে (১) ভারতবর্ষে একাধিক জাতির বসবাস, (২) সংসদীয় সরকার ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং (৩) যদি বা কখনও ঘটনাচক্রের ফলে এখানে ওইরূপ সরকার গ্রাহ্য হয় তবে তা নিশ্চিত রূপেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সমূহ সর্বনাশের কারণ হবে।

বেক সাহেবের অন্যতম প্রধান কীর্তি হলো ১৮৮৮-র আগস্ট মাসে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ব্রিটিশ সরকারের বশীভূত অভিজাত ও রাজন্যবর্গদের নিয়ে আলিগড়ে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ন পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কংগ্রেসের বিরোধিতা ও ব্রিটিশ রাজানুগত্যের মহিমা প্রচার করা, কংগ্রেস-বিরোধীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সংসদকে ওয়াকিবহাল রাখা এবং দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে সরকারকে সর্বতো রূপে সাহায্য করা। এই সমিতির একটি শাখা ইংলণ্ডেও খোলা হয় এবং সেই শাখার দায়িত্ব যাঁকে দেওয়া হয় সেই মিস্টার মরিসন-ই আলিগড় কলেজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন বেক সাহেবের পরে। এই সমিতির তালিকায় হিন্দু ও মুসলিমদের যেটুকু যোগাযোগ ছিল তা বেক সাহেবের মনঃপূত ছিল না, তাই ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তাঁরই প্ররোচনা ও পরিকল্পনায় শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে স্থাপিত হলো মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব অপার ইণ্ডিয়া। বেক স্বয়ং হলেন এর সম্পাদক। এই সম্মিলিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সব সময় সব-বিষয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত রাখা। বেক সাহেব মনে করতেন যে 'The

objective of the Congress is to transfer the political control of the country from the British to the Hindus. It demands the repeal of the Arms Act, reduction of military expenditure, and the cosequential weakening of frontier defences. Musalmans can have no sympathy with there demands.' কিন্তু এত সব বিস্তৃত বাক্যের পেছনে নিহিত আসল কথাটা কী? 'It is imperative for the Muslims and the British to unite with a view to fighting these agitators and prevent the introduction of democratic form of government, unsuited as it is to the needs and genius of the country. We therefore, advocate loyalty to the Government and Anglo-Muslim collaboration.'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[ব্রিটিশ রাজনীতি চরিত্র ও স্বরূপ—কর্জনের পরিকল্পনা ও বঙ্গভঙ্গ—জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতির সংযোগে মুসলিম লীগের জন্ম—সাম্প্রদায়িকতার দ্রুত বিস্তার।]

'Divide et impera should be the motto of our Indian administration, whether political, civil or military'—এই প্রস্তাব ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে কার্নাটিকাস ছদ্মনামধারী কোনও ইংরেজ প্রথম লিখিত ভাবে উত্থাপন করেন এশিয়াটিক জার্নালে এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা তাতে সমর্থন জানান। আবার ১৮৫৭-র জনোত্থানের সময় মোরাদাবাদের কম্যাণ্ডাণ্ট লেফটেনাণ্ট জন কোক লেখেন, 'Our endeavours should be to uphold in full force the (for us fortunate) separation which exists between the different religions and races, not to amalgamate them. Divide et impera should be the principle of Indian Government.' এই জনোত্থানকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছে এবং কেমন করে তা দমন করা হয় সে প্রসঙ্গে ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ স্যার জন সীলের বক্তব্য, 'You see the mutiny was in a great measure put down by turning the races of India against each other. So long as this can be done, the goverment of India from England is possible, and there is nothing miraculous about it.' এ প্রসঙ্গে স্যার জন লরেন্সের বিশ্লেষণ বিশেষ অনুধাবনযোগ্য: 'Among the defects of the pre-Mutiny army, unquestionably the worst, and the one that operated most fatally against us, was the brother-hood and homogeneity of the Bengal army.'

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সাধনে ইংরেজেরা প্রথম দিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পরিপোষণ করার নীতি নিয়েছিল, এবং সপ্তম দশক পর্যন্ত ইংরেজেরা এই নীতি একটানা অনুসরণ করে উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জাগরণকে সম্ভব করে তোলে। কিন্তু ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন ও পরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্যবর্গের রাজনৈতিক তৎপরতায় শঙ্কিত হয়ে

হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত ভারতীয়দের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরেজেরা সন্দিহান হয় এবং সে সময় থেকেই আলিগড় আন্দোলনকে সম্পূর্ণত ব্রিটিশ স্বার্থে চালনার নীতি অনুসৃত হয়। সেসঙ্গে খুব সুপরিকল্পিত ভাবে পুনঃপুঃন উচ্চারিত কপট হিতৈষিতায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মনে এই ধারণা জাগানো হয় যে কংগ্রেসের মূল অভিসন্ধি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রভাব বিস্তার করা এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সর্বতোভাবেই বঞ্চিত ও পতিত রাখা, সুতরাং নিতান্ত সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই মুসলিম ভারতীয়দের কর্তব্য হবে এদেশে তাদের রক্ষক রূপে ব্রিটিশের স্বার্থ কায়েম করা।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের জন্যে আন্দোলনকারী কংগ্রেস ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত ইণ্ডিয়ন কাউনসিল্‌স অ্যাক্টে প্রথমে খুবই উল্লসিত হয়, কেননা এতে প্রতিনিধিত্বের নীতিকে আইনত স্বীকার করে নেওয়া হয়, কিন্তু ওই আইনের পেছনে ব্রিটিশের যে-কূটবুদ্ধি লুকিয়ে ছিল তা ধরতে পারেননি কংগ্রেসের নেতারা। তৎকালীন গভর্ণর-জেনারল লর্ড ল্যান্সডাউন ওই আইনকে বর্ণনা করেছেন চারটি ধারায়:

'1. It is not expected of us that we shall attempt to create in India a complete and symmetrical system of representation.

'2. It is expected of us that we shall make a bonafide endeavour to render the Legislative Councils more representative of the different sections of the Indian Community than they are at present.

'3. For this purpose we are at liberty to make use of the machinery of election wherever there is a fair prospect that it will produce satisfactory results.

'4. The ultimate selection of All Additional Members rests with the Government and not with the electors.' প্রকৃতপক্ষে এই চতুর্থ ধারাটিতেই সেই ছিদ্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে যেখান দিয়ে সরকার নিজের পছন্দ অনুসারে অর্থাৎ সুবিধে বা প্রয়োজন মতো সদস্য প্রবেশ করাতে পারবে এবং এই আইন হলো দ্বৈত নির্বাচনপদ্ধতির প্রকৃত ভিত্তি।

স্পষ্টতই হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার জন্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রয়াস নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কোনও মাথা ব্যথা ছিল না, বরং ধর্মীয় প্রসঙ্গে

উৎসাহ দানে অনেক ইংরেজই অক্লান্ত ছিল, এবং ইংরেজদের মাথা ব্যথার আসল কারণ ছিল ভারতীয় প্রশাসন ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপের প্রয়াস আর এই প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় হিসেবে বের করেছিল কংগ্রেসের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বিপজ্জনক লক্ষণ রূপে তুলে ধরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কংগ্রেস-বিরোধিতায় প্ররোচনা দান। যাঁর সমর্থনে স্যার সৈয়েদ আহমেদ একদা এগিয়ে এসেছিলেন সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হয়েছেন, 'The Muhammadan community, under the leadership of Sir Sayid Ahmed, had held aloof from the Congress. They were working under the auspices of the Patriotic Association in opposition to the National Movement. Our critics regarded the National Congress as a Hindu Congress and the opposition papers described it as such'. এখানে বিরোধী পত্রিকা বলতে শুধু আলিগড় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পত্রিকাগুলোর কথা বলা হয়নি, ইংরেজ পরিচালিত অধিকাংশ পত্রিকার কথাও বলা হয়েছে।

১৮৮৭-র ২৮ শে ডিসেম্বর লখনৌয়ে এবং পরের বছর ১৮ই মার্চ মীরাটে সৈয়েদ আহমেদ যে-দুটি বক্তৃতা দেন তাতে তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ করেননি, করেছেন জাতীয় কংগ্রেসের অভিপ্রায় ও কর্মসূচীকে এবং এই কংগ্রেসের সংস্পর্শ থেকে আপন সম্প্রদায়কে দূরে থাকতেই বলেছেন। উল্লিখিত বক্তৃতা দুটি সম্পর্কে 'রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অব দি অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ' এর লেখক মোহাম্মদ নোমান-এর যে মন্তব্য ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার 'হিস্ট্রী অব দি ফ্রীডম মুভমেণ্ট' গ্রন্থে উদ্ধার করেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য: 'No Mussalman of note since then joined the Congress except one or two. Even Syed Ahmed Khan's co-religionists who differed from his views on religious, educational and social matters and opposed him violently, followed him in politics and preserved their isolation from the Congress'. ডক্টর মজুমদার কর্তৃক পরিবেশিত এসব তথ্যও অভিনিবেশ দাবি করে যে মীরাট, লখনৌ, এলাহাবাদ, লাহোর, মাদ্রাজ ও আরও নানা স্থানের মুসলমানরা পর্যায়ক্রমে কংগ্রেসের প্রতি ধিক্কার-জ্ঞাপক বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং মহামেডান অবজার্ভার, ভিক্টোরিয়া পেপার, রফিক-ই-হিন্দ, মুসলিম হেরাল্ড, ইম্পীরিয়াল পেপার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও পরিচালিত বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকার সঙ্গে একযোগে ও সমস্বরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে থাকে।

কিন্তু একটি কথা এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে যদিও আলিগড় আন্দোলনে প্রভাবিত সমাজ আস্তে আস্তে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হয়ে ওঠে তথাপি এ-আন্দোলন শুরুতে হিন্দু ধর্মের অথবা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিরোধী ছিল না ; হিন্দুধর্মাবলম্বীদের আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলার জন্যে যে আন্দোলন প্রথমে পূর্ব ভারতে শুরু হয় সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু পরে উত্তর ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে আলিগড় আন্দোলনের সূত্রপাত এবং উভয় আন্দোলনই আপন আপন ধর্মের মহিমা ও স্বাতন্ত্র্য পুনরুদ্ধারে একই প্রকৃতির উদ্যোগ। আলিগড় আন্দোলনের উদ্গাতা সৈয়েদ আহমেদ কখনও হিন্দু ধর্ম অথবা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হননি, সমালোচনা করলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অন্ধতা ও রক্ষণশীলতাকেই সমালোচনা করেন এটা বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার ; তবে তাঁর মূল বিরোধিতা ও বিদ্বেষের একমাত্র লক্ষ্যই হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি।

আরও বলা দরকার যে আলিগড় আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান নেতা সৈয়েদ আহমেদ সাধারণত সাম্প্রদায়িক বিরোধের জনক রূপে অভিযুক্ত হয়ে থাকেন, কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে ভারতীয় জনসাধারণের হিন্দু ধর্মাবলম্বী অংশ গৌরবে ও স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হবে আর ইসলাম ধর্মাবলম্বী অংশ অজ্ঞতায় ও হীনতায় পতিত হয়ে থাকবে এটা একেবারেই অবাস্তব, কিন্তু পশ্চাদ্বর্তী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নেতার পক্ষে ইংরেজদের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত ওই অবাস্তবতার পাষাণ ভাঙা ছিল অসম্ভব। যদি ইংরেজদের সৌজন্যে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা সাম্প্রদায়িকতার সূচনা না হয়ে থাকে তাহলে সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্যে আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠাকে ঐতিহাসিক দুর্লক্ষণ মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

মিস্টার বেক পর্যাপ্ত সাফল্যের সঙ্গে স্যার আহমেদের মনে এই শঙ্কা জাগাতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেসে যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থকে উপেক্ষা করবে। আর কংগ্রেসের সকল সদস্যই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমান অনুভূতিশীল ছিলেন না— ১৮৮৭-র মাদ্রাজ অধিবেশনেই গোহত্যা নিবারণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তবে তা শেষপর্যন্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে বলে গৃহীত হয়নি। এটা অনস্বীকার্য যে কংগ্রেসের মধ্যেই একটা অংশে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল, আবার সে-মনোভাব দমিয়ে রাখার জন্যে বাকি অংশ যথেষ্ট বেগ স্বীকারে ছিল সর্বদা প্রস্তুত। পক্ষান্তরে ১৮৯৬-র

অধিবেশনে আইনসভা, জিলাপরিষদ ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যেই সমান সংখ্যক আসনের দাবি উত্থাপন করেন হাজী মোহম্মদ ইসমাইল খান, কিন্তু সে-প্রস্তাবের সব চাইতে তীব্র বিরোধিতা করেন সেবারের কংগ্রেস সভাপতি রহিমুতুল্লা সায়ানি, আবার সৈয়েদ আহমেদ প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে প্রবন্ধ লেখেন ও জানান যে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে কংগ্রেসে যোগদানের পক্ষে মুসলিমদের কোনও আপত্তিই থাকবে না। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে নিছক কোনও ধর্মীয় সংস্কারের বশবর্তী হয়ে স্যার আহমেদ কোনও প্রথা নিবর্তন বা প্রবর্তন করতে চাননি, তিনি যা চেয়েছেন তার পেছনে থেকেছে সংখ্যাতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত অত্যন্ত স্বাভাবিক সন্দেহ ও সন্ত্রাস।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে স্যার সৈয়েদ আহমেদের মৃত্যু হয় এবং তখন আলিগড় আন্দোলনের নেতা হন নবাব মহসীন-উল-মুল্ক। পরের বছর অধ্যক্ষ বেকের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মিস্টার মরিসন। বেকের প্রচণ্ড প্রভাব সত্ত্বেও সৈয়েদ আহমেদ হিন্দু ধর্ম ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষেত্রভেদ রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মরিসন যখন অবিকল বেকের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেন তখন তার প্রভাব উপেক্ষা করার মতো ব্যক্তিত্ব মহসীন-উল-মুল্ক-এর ছিল না, ফলে অচিরেই আলিগড় আন্দোলন হিন্দু ধর্ম বিরোধী আন্দোলনেও রূপান্তরিত হতে থাকে।

যখন উত্তর ভারতে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া ধর্মীয় চরিত্রে আক্রান্ত হয় তখন সেই ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দেই, পূর্ব ভারতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূত্রপাত হয়: লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারল রূপে নিযুক্ত হন। তাঁর কর্মক্ষমতা এমন বিপুল যে গোখলে একদা ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন; কারও উপরে কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না; এমন কি গভর্ণর, লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর ও দেশীয় রাজ্যে অবস্থানকারী ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি স্বয়ং চিঠিপত্র লেখালেখি করতেন: 'his touch was felt in the most distant corners of the territory over which he held sway।' দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকদের জন্যে তাঁর যে দুশ্চিন্তা তা ছিল আন্তরিক এবং তিনিই প্রথম গভর্ণর-জেনারল যাঁর কাছে ভারতবর্ষ বলতে দেশীয় কৃষক সমাজই ছিল একমাত্র বাস্তবতা। কিন্তু শিক্ষিত ও রাজনীতি-সচেতন সম্প্রদায় সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও বিমুখতা প্রকাশে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসংকোচ, তাদের কর্মপন্থার অসারতা সম্বন্ধেও ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তাই স্পষ্ট করেই বলেন, 'More places on this or that

Council for a few active or eloquent men will not benefit the raiyats।' রায়তদের হিত সাধনের জন্যেই হোক বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব চূর্ণ করার জন্যেই হোক, কার্জনের যেটি প্রধান কীর্তি সেই বঙ্গ বিভাগের আপাত পরিণাম হলো নম্রপন্থী ও উগ্রপন্থীর মধ্যে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং দীর্ঘকালীন পরিণাম হলো বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভাষাভাষীর মধ্যে বিরোধ।

লর্ড কার্জনের প্রশাসনিক নীতি সম্বন্ধে স্যার হেনরী কটন লিখেছেন, 'It was a part and parcel of Lord Curzon's policy to enfeeble the growing powers and to destroy the political tendencies of a patriotic spirit.' বাংলায় তখন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম ক্রম-বর্ধমান। সুতরাং কার্জনের কাছে আশু সমস্যা হলো ওই দেশপ্রেমের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করা এবং তিনি বুঝলেন যে তা ব্যাহত করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ ঘটাতে হবে। এযাবৎ বিভেদ ঘটিয়ে শাসনের যে-নীতি অনুসৃত হয়েছে তাতে ধর্ম নিয়ে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সংঘটনের প্রয়াস প্রকট। ওই নীতিকে কার্জন প্রয়োগ করতে উদ্যত হলেন ব্যাপকতর ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুধু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই নয়, একই ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যেও।

কার্জন পর্যালোচনা করে দেখলেন যে অসমীয়াভাষী ও বাংলাভাষীদের মধ্যে একটা বিরোধের ক্ষেত্র ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ থেকেই প্রস্তুত—ওই বছর বাংলাভাষী গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট অঞ্চল তিনটি নিয়ে আসাম প্রদেশ গঠিত হয় যার ফলে আসামের মধ্যে বাংলাভাষীরা অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়; কিন্তু আসামের সঙ্গে যদি বাংলাভাষী আরও কয়েকটি অঞ্চলকে যোগ করা যায় তাহলে সেখানে বাংলাভাষীরা পরিণত হবে নগণ্য সংখ্যালঘু থেকে প্রবল সংখ্যালঘুতে, ওই অঞ্চলগুলিতে যদি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয় তাহলে তাদের পক্ষে স্থানীয় রাজনীতিতে চাপ সৃষ্টি করাও সোজা হবে এবং তার ফলে জাগ্রত হিন্দু গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে যথেষ্ট খর্ব করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের শেষাশেষি কার্জন সরকার বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব প্রথম প্রকাশ করে যে চট্টগ্রাম ডিভিশন ও ঢাকা আর মৈমনসিংহ জেলা যোগ করে নতুন আসাম প্রদেশ সংগঠিত হবে। প্রস্তাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষীদের বিদ্যমান অখণ্ডতাকে চূর্ণ করার ওই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চতুর্দিকে বিক্ষোভ দেখা দেয়—বিক্ষোভকারীদের মধ্যে

শুধু রাজনীতিবিদ্‌রাই ছিলেন না, জমিদার-মধ্যবিত্ত-ও-কৃষক-শ্রেণীও সে-বিক্ষোভের শামিল হয় এবং উল্লেখযোগ্য যে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নয়, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও বঙ্গভঙ্গের প্রথম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানায়। ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শুধু পূর্ববঙ্গে দু মাসের মধ্যে অন্তত পাঁচশ-টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

অধস্তন কর্মচারীদের উপর কোনও দায়িত্ব দিয়ে কার্জন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকার পাত্র ছিলেন না, তাই যুক্তি দিয়ে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত সংগঠনের জন্যে তিনি নিজেই পূর্ব বাংলা পরিক্রমায় গেলেন এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী জমিদারদের স্বয়ং বোঝাতে চাইলেন যে বঙ্গভঙ্গের পরিণাম মুসলিমদের জন্যে খুবই হিতকর হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বাঙালীর অখণ্ডতা-বোধের তীব্রতা অনুধাবন করে তিনি নিঃসংশয় হলেন যে ওই অখণ্ডতা অচিরে চূর্ণ করতে না পারলে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘোর বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং সে-বিপর্যয়কে রোধ করার অদ্বিতীয় পন্থা হলো অধিকতর সুষ্ঠু পরিকল্পনায় বাংলাভাষী জনসাধারণকে বিভক্ত করা ও তাদের একাংশের বিরুদ্ধে অপরাংশকে উত্তেজিত করা। তাই গোপনে নতুন পরিকল্পনা রচিত হলো উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে রাজনৈতিক অর্থে পশ্চাদ্বর্তী ইসলাম ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ এক প্রদেশ গঠন এবং পশ্চিম বাংলাকে বিহার ও ওড়িশার সঙ্গে যুক্ত করে এমন এক প্রদেশ গঠন যেখানে রাজনীতিতে নিরুৎসুক বিহারী ও ওড়িয়ারা সম্মিলিত ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে – দুটি প্রদেশেই জাগ্রত বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হবে, উপরন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বী বাংলাভাষী ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাংলাভাষীর মধ্যে সূচিত হবে এক সূক্ষ্ম বিরোধের সম্পর্ক। পাছে আগে প্রকাশ পেলে দেশবাসী ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত বিভেদসাধক অভিসন্ধি ধরে ফেলে এবং তার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির পর্যাপ্ত অবকাশ পায় তাই গোপনে রচিত বাংলার সদ্যজাত জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার আয়োজনও হলো নিতান্ত গোপনেই।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে যে-পরিকল্পনা কার্জন সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত হয় তা সত্যিই বাস্তবে পরিণত হচ্ছে কি হচ্ছে না সে-সম্বন্ধে ১৯০৫-এর জুন মাস পর্যন্ত দেশবাসী শঙ্কিত থাকলেও প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ১৯০৫-এর ৭ই জুলাই জানা গেল যে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা রাষ্ট্রসচিব কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কিন্তু পুরো পরিকল্পনাটি যে কী তা প্রথম প্রকাশ পেল

২০শে জুলাই। বঙ্গভঙ্গের এই আইন কার্য্যকর হয় ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর থেকে।

ইতিমধ্যে পুনঃপুনঃ ব্যক্তিগত সংযোগের ফলে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত বাংলাভাষীদের একটা উল্লেখ্য গোষ্ঠীকে বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে প্রভাবিত করতে কার্জন সমর্থ হয়েছিলেন—নবাবের প্রতি সরকারী আনুকূল্যের অভিজ্ঞান হিসেবে তিনি নামমাত্র সুদে নবাবকে সরকারী ঋণের ব্যবস্থা করে দেন, তাছাড়া বোঝান যে নতুন প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা, তখন স্বভাবতই ঢাকার নবাব হবেন প্রদেশের সবচাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং অন্যান্য বিত্তবান মুসলমানদের এই আশ্বাস দেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায় বহুতর সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সমর্থ হবে। অতঃপর সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববাংলার একটা ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ ও স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কৃষকদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার শুরু করে এবং আস্তে আস্তে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের বৃহত্তর অংশই হয়ে ওঠে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সমর্থক। আইনটি কার্যকর হওয়ার পরে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যেই মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষণ করতে থাকল। নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেনাণ্ট-গভর্ন'র বমফিল্ড ফুলার বললেন যে রূপকথার দুই রানির মতো তাঁর সুয়োরানি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আর দুয়োরানি হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে তিনি পরে লেখেন, 'I said that I was like a man who was married to two wives, one a Hindu, the other a Muhammadan, both young and charming,—but was forced into the arms of one of them by the rudeness of the other.' আরও সরকারী আনুকূল্যের আশায় একদা কংগ্রেসের সমর্থক পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মুসলমানরাও অচিরেই বঙ্গভঙ্গের সমর্থকদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৯০৬-এর ৩০শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ প্ররোচনায় ঢাকায় আয়োজিত এক বিরাট সভায় মুসলিম নেতারা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন যে বঙ্গভঙ্গ মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অশেষ হিতকর একটি ব্যবস্থা হয়েছে। এভাবে সম্পূর্ণ সাধিত হলো ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীর স্বার্থের বিচ্ছেদ। মুসলমানরা দেখল যে বহুকাল সামাজিক ক্ষেত্রে অপমানের ও অবজ্ঞার পাত্র থাকার পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা হয়েছে ইংরেজের চোখের মণি আর হিন্দুরা দেখল যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত হয়েও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

তারা হয়েছে ইংরেজের চোখের বালি; মুসলমানরা দেখল যে বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, আর হিন্দুরা দেখল যে তাতে তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে; মুসলমানরা দেখল যে হিন্দুরা তাদের প্রগতির অন্তরায় আর হিন্দুরা দেখল যে তাদের প্রতি নির্যাতনের অবলম্বন হলো মুসলমানরা—এর ফলে সুস্পষ্ট ভাবে সূচিত হলো দুই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষের শোচনীয় সম্পর্ক।

বঙ্গভঙ্গের ফলে ব্রিটিশ সরকার দেশবাসীর বৃহত্তর অংশের কাছে বিশেষ অপ্রিয় হয়ে পড়ল, অনিবার্য হয়ে উঠল উপর মহলের রদবদল, ব্রিটিশ সরকারের বহু প্রচারিত উদারতা প্রমাণের প্রয়োজন দেখা দিল। কার্জনের বদলে নতুন গর্ভনর জেনারল হলেন লর্ড মিণ্টো, তাঁর একান্ত সচিব হলেন কর্ণেল স্মিথ আর আলিগড় কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হলেন মিস্টার আর্চবোল্ড। নাটকের নতুন অঙ্কের কুশীলব রঙ্গমঞ্চে নিজের নিজের স্থান নিলেন। যবনিকা উত্তোলিত হলো সিমলায় স্মিথ ও আর্চবোল্ডের বৈঠকের উপরে। অতঃপর ১৯০৬-এর ১০ই আগস্ট আর্চবোল্ড এই চিঠি লিখলেন আলিগড় আন্দোলনের নেতা নবাব মহসীন-উল-মুল্কের কাছে। চিঠিটির অংশ বিশেষ অনুধাবনযোগ্য: 'Colonel Dunlop Smith now writes to me that the Viceroy is. prepared to receive that deputation of Musalmans and intimates me that a formal petition be submitted for it. In this connection the following matters require consideration.

'The first question is that of sending the petition. To my mind it would be enough that some leaders of Musalmans, even though they may not have been elected, should put their signatures to it. The second is the question as to who the members of the deputation should be. They should be representatives of all the provinces. The third question is of the contents of the address. In this connection my opinion is tnat in the address loyalty should be expressed, that thanks should be offered that in accordance with the settled policy steps are going to be taken in the direction of self-government according to which the door will be

opened for Indians to offices. But apprehension should be expressed that by introducing election injury will be done to Musalman minority and hope should be expressed that in introducing the system of nomination or granting representations on religious basis the opinion of Musalmans will be given due weight. The opinion should also be given that in a conntry like India it is necessary that weight should be attached to the views of zamindars.

'My personal opinion is that the wisest thing for Musalmans to do would be that they support the system of nomination because the time for introducing election has not yet come. Besides it would be very difficult for them, if the system of election is introduced, to secure their proper share.

'But in all these matters I want to remain behind the screen and this move should come from you. You are aware how anxious I am for the good of the Musalmans and I would, therefore, render all help with the greatest pleasure. I can prepare and draft the address for you. If it be prepared in Bombay then I can revise it because I know the art of drawing petitions in good language. But Nawobabshaheb, please remember that if within short time any great and effective action has to be taken then you should act quickly.'

কার্জন ওদিকে এক ঢিলে দু পাখি মেরে গেছেন বঙ্গভঙ্গ করে—একদিকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সুস্পষ্ট বিরোধ জাগিয়েছেন অন্যদিকে বপন করেছেন অসমীয়া ও বাঙালীর এবং বিহারী-ওড়িয়া ও বাঙালীর মধ্যে বিরোধের বীজ। কিন্তু সে-বিরোধের জল কোথায় গড়াবে সে-সম্বন্ধে তখন ধারণা ছিল অস্পষ্ট। তাই বাঙালীর অখণ্ডতা চূর্ণ করাকে কেন্দ্র করেই তখন গোটা ভারতবর্ষে বিশেষ করে কংগ্রেস মহলে দেখা দেয় প্রচণ্ড বিক্ষোভ। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ওই

'বিক্ষোভের ব্যাপকতা লক্ষ করে মহাত্মা গান্ধী 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে লেখেন, 'the real awakening (of India) took place after the Partition of Bengal' এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে বাংলা বিভাগই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার শুরু। মুখ্যত কংগ্রেস পরিচালিত ওই বিক্ষোভের শক্তিতে মিণ্টো শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে তখন ভাবতে হয় একটা 'possible counterpoise to Congress aims'-এর কথা। স্পষ্টতই পূর্ব ভারতে কার্জনের প্রচুর ব্যক্তিগত প্রযত্ন সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পর্যাপ্ত বিচ্ছেদ ঘটানো যায়নি—১৯০৬-এর এপ্রিল মাসে আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হলো পূর্ব বাংলারই বরিশালে এবং পুলিশ দিয়ে লেফটেনাণ্ট-গভর্ণরকে সে-সভা ভাঙতে হলো অর্থাৎ তখনও পূর্ব-বাংলার ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের একটা বড়ো অংশ কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শামিল ছিল। তদুপরি কার্জন যা করেছিলেন তা আইনের ঢোল পিটিয়েই করেছিলেন, ফলে তাতে ব্রিটিশ সরকারের কূটনৈতিক অভিসন্ধি পুরোপুরি ফাঁস হয়ে যায়। তাই লর্ড মিণ্টো অগ্রসর হলেন যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে—কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসেবে ধর্মীয় বিচ্ছেদের পাশাপাশি তিনি ভাষার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে উর্দুভাষী ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হলেন, তাঁর হয়ে কথাবার্তা চালালেন তাঁর একান্ত সচিব এবং এই একান্ত সচিব কলকাটি নাড়ার নির্দেশ দিলেন আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষকে। কেমন করে অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড ভারতীয় মুসলমানদের বুদ্ধি জোগালেন তা মহসীন-উল মুল্কের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতেই স্পষ্ট। লক্ষণীয় যে আর্চবোল্ড পর্দার আড়ালেই থাকতে চেয়েছেন এবং তিনি হয়তো বরাবরই পর্দার আড়ালেই থেকে যেতেন যদি না পরে মৌলবী সয়ীদ তুফাইল আহমদ মাঙ্গলোরি সমস্ত গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিতেন।

আর্চবোল্ডের ওই চিঠির প্রায় আড়াই মাস পরে, ১লা অক্টোবর, সত্তর জন সদস্য বিশিষ্ট এক মুসলিম গণপ্রতিনিধি গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোর সকাশে উপস্থিত হলেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন আগা খান, অন্তত আর্চবোল্ডের তৈরি খশড়ার ভিত্তিতে স্মারকপত্রটি ভাইসরয়ের সামনে পাঠের দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। তাতে উচ্চ সরকারী পদে, উচ্চ আদালতের বিচারক পদে, বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠান ও জিলা পরিষদের সভ্যপদে মুসলমানদের জন্যে প্রবেশের বিশেষ সুযোগ প্রার্থনা করা হয়।

আরও বলা হয় যে গভর্ণর-জেনারল যেন ইংরেজ শাসনের পূর্বে মুসলমানদের যে-অবস্থা ছিল তার কতকটা ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টা বিবেচনা করেন। তাছাড়া তাঁরা ধর্ম ও মননচর্চার কেন্দ্র হিসেবে একটি বিশেষ ভাবে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যেও আবেদন জানানো হয়। এ সঙ্গে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, 'We hope your Excellency will pardon our stating at the outset that representative institutions of the European type are new to the Indian people; many of the most thoughtful members of our community in fact consider that the greatest care, forethought, and caution will be necessary if they are to be successfully adopted to the social, religious and political conditions obtaining in India, and that in the absence of such care and caution their adoption is likely, among other evils, to place our national interest at the mercy of an unsympathetic majority.'

ওই গণপ্রতিনিধিদের আবেদনের উত্তরে লর্ড মিণ্টো যা বলেছিলেন তা অনিবার্য ভাবেই আন্তরিক আশ্বাসে পূর্ণ ছিল: আবেদনে প্রকাশিত আশঙ্কাকে তিনি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলে ঘোষণা করেন, সুতরাং ভারতীয় পরিস্থিতির যে-বিশ্লেষণ ও তা প্রতিকারের যে-প্রস্তাব আবেদনে করা হয়েছিল তাকেও জানালেন অকুণ্ঠ সমর্থন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন নীতি ঘোষিত হলো মিণ্টোর কণ্ঠে: 'I can only say to you that the Mohammedan community may be rest assured that their political rights and interests as a community will be safeguarded by any administrative reorganization.'

যেদিন মুসলিম গণপ্রতিনিধি সিমলাতে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেদিনই, ১লা অক্টোবর, লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকাতে মিস্টার বেক-এর বক্তব্য উদ্ধার করে এক প্রবন্ধে লেখা হয় যে ভারতবাসীরা গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়। পরদিনই আর একটি প্রবন্ধে 'টাইমস' লেখে যে বিক্ষুব্ধ বাঙালীরা মূর্খ, কেননা তারা জাতীয় অখণ্ডতায় বিশ্বাসী, পক্ষান্তরে মুসলিমরা সাহসী, কেননা তারা জাতীয় অখণ্ডতার গালগল্প ভেঙে বিভেদের সত্যকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করেছে। স্পষ্টতই সমস্ত ব্যাপারটা এমন ভাবে সাজানো হয় যাতে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের দাবি বিদেশে খুব ব্যাপক প্রচার পায় এবং ইংলণ্ডের

অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকাই মুসলিম গণপ্রতিনিধিত্বের সংবাদ খুব ফলাও করে ছাপে, তাছাড়া অনেক পত্রিকা-ই কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনার সঙ্গে মুসলমান জাতির উচ্চ প্রশংসা করে।

সৈয়েদ আহমেদ কর্তৃক আরব্ধ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতির সংস্রব এড়িয়ে ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ, ফলে আলিগড় আন্দোলনের সূত্র ধরে এতদিন পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বা সঙ্ঘের উদ্ভব হয়নি। কিন্তু উত্তর ভারতে হিন্দী বনাম উর্দু ভাষা নিয়ে বিতর্কের পিঠোপিঠি উর্দুভাষী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উল্লেখ্য অংশের মুখে কংগ্রেসী আন্দোলনের বিপরীত দাবির বিষয় ও ভাষা জুগিয়ে দেওয়ার পরে ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ও চেষ্টা হলো ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্যের নামে সঙ্ঘবদ্ধ করা। অতঃপর স্বয়ং গভর্ণর-জেনারেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ওই মুসলমানরা স্বভাবতই বিশেষ উৎসাহিত হলো রাজনীতিতে, অনুভব করল লর্ড মিণ্টোর আশ্বাসের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। একদা একই উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু অচিরেই তা যখন যথার্থ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হলো তখন থেকেই ব্রিটিশ কূটনীতি-বিদরা পালটা চালের জন্যে দিন গুনছিল এবং তখনই তারা স্থির করেছিল যে জাতীয়তাবাদীদের প্রভাব খণ্ডনের জন্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের ব্যবহার করতে হবে। প্রায় আঠারো বছরের ঐকান্তিক প্রযত্নের পরিণাম আসন্ন হয়ে উঠল ভাইসরয়ের সকাশে মুসলিম গণপ্রতিনিধিত্বের ফলে। ১৯০৬-এর ডিসেম্বরে মহামেডান এডুকেশলাল কনফারেন্স উপলক্ষ্যে ঢাকায় সমবেত বিশিষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে নবাব সলিমুল্লাহ মুখোমুখি আলোচনার সুযোগ পেলেন এবং তখন তিনিই রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে মুসলমানদের একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের প্রস্তাব দিলেন · প্রস্তাবে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে ওই সমিতির লক্ষ্য হবে যেমন একদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তরুণদের রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা তেমনই অন্যদিকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতিকূল আন্দোলন গড়ে তোলা।

নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাব অনুসারে মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের অব্যবহিত পরেই, ১৯০৬-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ঢাকার অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ

প্রতিষ্ঠিত হলো, তার যুগ্ম সম্পাদক হলেন নবাব মহসীন-উল-মুল্ক আর নবাব ওয়কর-উল-মুল্ক। লীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন বসল করাচীতে, ১৯০৭ এর ২৯শে ডিসেম্বর। করাচীতে এই অধিবেশন আহ্বানের কারণ হিসেবে ঘোষিত হলো 'Sindh is that pious place in India, where Muhammad Bin Qasim came first, with the torch of religion and the gift of *Hadis*. No other place could appeal to our elders.' লীগের উদ্দেশ্যে ও কর্মসূচী হলো, (ক) ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জাগানো এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও অনুসৃত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির পথ রোধ করা; খ) সরকারের কাছে ভারতবর্ষের মুসলমানদের দাবিদাওয়া পেশ করা এবং তাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করা; এবং (গ) অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে কোনও শত্রুতায় মনোভাব জাগার পথ রোধ করা। 'We are not opposed to the social unity of the Hindus and the Musalmans', লীগের সম্পাদক স্বয়ং ঘোষণা করলেন, 'But the other type of unity (political unity) involves the working out of common political purposes. This sort of unity with the Congress cannot be possible because we and the Congressmen do not have common political objectives. They indulge in acts calculated to weaken the British Government. They want representative Government which means death for Musalmans. They desire competitive examinations for employment in Government services and this would mean the deprivation of Musalmans of Government jobs. Therefore, we need not go near political unity. It is the aim of the League to present Muslim demands through respectful request, before the Government. They should not, like Congressmen, cry for boycott, deliver exciting speeches and write impertinent article in newspapers and hold meeting to turn public feeling and attitude against their benign Government.' কর্মসূচীতে ও সম্পাদকের ভাষণে বিশেষ

লক্ষণীয় যে মুসলিম লীগ উৎপত্তির যুগে কংগ্রেসের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজনীতির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সে সঙ্গে লক্ষ্য রেখেছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতির উপরে। সোজা বাংলায়, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের জন্ম হলো হিন্দু সমাজের বা সম্প্রদায়ের বিরোধী প্রতিষ্ঠান রূপে নয়, ব্রিটিশের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে -হিন্দু বা মুসলমান নয়, এখানে প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ব্রিটিশের স্বার্থ।

কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোষিত আদর্শ ও বাস্তবে অনুসৃত আচরণের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর, তাই হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও বিরূপতার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া ভালো। কংগ্রেস ভারতীয় বলতে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জনসাধারণকে বোঝালেও কার্যত বিভেদসাধক আচরণকে উৎখাত করতে পারেনি, বরং তা ক্রমশ ব্যাপক হতে থাকে। তাই কংগ্রেসী আন্দোলনের সহযোগী খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা মহম্মদ আলি পর্যন্ত কটাক্ষের সঙ্গে মন্তব্য করেন, 'that it is a retrograde step in our political evolution to live at the mercy of an angelic majority.' কটাক্ষের কারণ বোঝাও সহজ : হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সাধারণত উদারতা প্রচারে উদাত্ত ও গর্বিত এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সাধারণত ধর্মান্ধতায় অভিযুক্ত। অথচ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গো-নির্যাতন নিবারণের জন্যে নয়, গো-হত্যা নিবারণের জন্যে যে-আন্দোলন তা আসলে মুসলমানদের খাদ্যরুচিকে ধিক্কারজ্ঞাপন ছাড়া তাৎপর্যহীন। এ জন্যেই ভগিনী নিবেদিতার কাছে কটাক্ষের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন হিন্দুর ঐক্য শুধু গো-হত্যা নিবারণের প্রশ্নেই জাগে আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে যারা আত্মরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না তারাই আবার গোহত্যা নিবারণে ঐক্যবদ্ধ হয়। গণেশ উৎসব বা শিবাজী উৎসব পালনে মুসলমানদের আহ্বান ও জাতীয় সংহতি সাধনের প্রয়াস ব্যঙ্গপূর্ণ না হলেও অর্থহীন। স্বদেশী আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির গঙ্গাস্নান, কালীপুজো, গীতা, আনন্দমঠ প্রভৃতির যে-প্রেরণা তা একান্তভাবেই সংকীর্ণ ধর্মীয় সত্তা থেকেই উৎসারিত —মনে রাখা ভালো কংগ্রেসের উগ্রপন্থীদের তিন নেতার অন্যতম বিপিনচন্দ্র পাল স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে 'আনন্দমঠ' থেকে তাঁরা যৌবনে মুসলমান-বিদ্বেষী মনোভাব লাভ করেছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনকারীরা বা সন্ত্রাসবাদীরা যে ওই রচনা থেকে অন্যরকম মনোভাব লাভ করেছিলেন এমন মনে করারও কারণ নেই।

উগ্রপন্থীদের অপর নেতা বাল গঙ্গাধর টিলক ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা। কি শিবাজী উৎসবের প্রসঙ্গে প্রদত্ত ভাষণে কি 'কেশরী' পত্রিকার পৃষ্ঠাতে তিনি বারংবার ধর্মের দোহাই 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বহুবার ধর্ম বলতে স্পষ্ট করে 'হিন্দু' শব্দটাই ব্যবহার করেছেন। 'স্বরাজ' বলতেও তিনি কোথাও আধুনিক গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ বোঝাননি, বুঝিয়েছেন শিবাজী কর্তৃক পরিকল্পিত সপ্তদশ শতাব্দীর স্বরাজ আদর্শকে। গোহত্যার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'How can I bear this heart rending spectacle ? Have all our leaders become like helpless figures on the chess-board ? What misfortune has overtaken the land ?' কংগ্রেসের ভিতর থেকেই যখন কোন কোন উদারপন্থী নেতা টিলককে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির জন্যে সমালোচনা করেন তখন টিলক তার উত্তর দেন, 'there was nothing wrong in providing a platform for the Hindus of all high and low classes to stand together and discharge a joint national duty.' স্পষ্টতই টিলকের জাতীয়তাবাদ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মবাদ। এর মর্মার্থ হলো এই যে অহিন্দুরা স্বরাজের অধিকারী নয় অথবা স্বরাজের সাধনা অহিন্দুদের সাধনা নয়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে কংগ্রেসের ভিতরেই ইংরেজের গুণমুগ্ধ তথা ইংরেজের সদিচ্ছাতে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তাবিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অপেক্ষা টিলক কর্তৃক উত্থাপিত স্বরাজের দাবি অনেক বেশি সদর্থক এবং জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পরিপোষক ছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে স্বরাজের ওই দাবি ভারতীয় জনসমষ্টির সামগ্রিক বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাজনীতিকে তিনি স্থাপন করেছিলেন ধর্মের উপরে এবং এজন্যেই আধুনিক ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার মাইকেল এডোয়ার্ডস 'দ্য লাস্ট ইয়র্স অফ দ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে টিলককে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন এবং লিখেছেন, 'Tilak had been first to recognize the power of religious feeling as a weapon aganist the British ; Jinnah learned the lesson and turned it against Congress.'

ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যমূলক মনোভাবের জন্যেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, স্বদেশী আন্দোলনকারীদের হাতে বহু মুসলমান লাঞ্ছিত হতো। পুলিশের নথিপত্র থেকেই দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গের একমাস পরে, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, একমাত্র বরিশালেই বিদেশ থেকে আমদানী করা

জিনিস কেনার অপরাধে স্বদেশী আন্দোলনকারীরা স্থানীয় মুসলমানদের উপর হামলা করে এরূপ ঘটনার সংখ্যা ষাটটি। এরূপ লাঞ্ছনার হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকাতে মহামেডান ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়—বস্তুত ওই অ্যাসোসিয়েশন আত্মরক্ষামূলক নীতির ভিত্তিতে স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান এবং এর পরেই পরিপূরক আক্রমণ মূলক নীতি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়। তেমনই আবার মহামেডান ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশন এবং মুসলিম লীগের প্রভাব খণ্ডন করার জন্যে তথা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ও সহযোগীসঙ্ঘ রূপে কলকাতায় বেঙ্গল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন এবং পরে ইণ্ডিয়ন মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শেষোক্ত ব্রিটিশ বিরোধী ও কংগ্রেস সহযোগী সঙ্ঘগুলি কোনও সময়েই ভারতীয় মুসলমানদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়নি, পক্ষান্তরে সরকারী প্রশ্রয়চ্ছায়াতে লালিত মুসলিম লীগের কর্ম তৎপরতার ফলাফল ক্রমশই স্পষ্টতর হতে থাকে। ওই তৎপরতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমকালীন ঘটনাবলীর বিশেষ গুরুত্ব ছিল এবং এই ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে এক নতুন বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কুমিল্লা শহরে ও মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর সাম্পদায়িক দাঙ্গা আকারে এমন ভয়াবহ ছিল যে তা নিয়ে ইংলণ্ডের হাউস অফ কমন্সেও প্রশ্ন ওঠে। উত্তরে বলা হয় যে মুসলমানদেরকে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ে হিন্দুরা বাধ্য করছিল এবং তার ফলে দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উত্তেজনা জন্মায় সেটাই আস্তে আস্তে দাঙ্গার রূপ নেয়। হাউস অফ কমন্সের উত্তরে স্বদেশী ও বিদেশী দ্রব্যের মূল্য ও গুণাগুণের প্রসঙ্গটি চেপে যাওয়া হয় যাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যা মিশে না যায়। স্বভাবতই অর্থনৈতিক সমস্যার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা প্রচলিত ধারার অনুবৃত্তি বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। এই উত্তরের প্রতিবাদ করে ১৫ জন হিন্দু নেতা একটা বিবৃতি দেন, 'The ill feeling between the Hindus and the Mohammedans affects only a limited area in Eastern Bengal and is of very recent growth' ওই দাঙ্গার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের কোন সম্পর্কও তাঁরা অস্বীকার করেন। তাঁদের প্রতিবাদ থেকে দুটি সত্য স্বতঃই প্রকাশিত: (১) দাঙ্গা ব্যাপারটা পূর্ববঙ্গের মাত্র কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ ব্যাপার অর্থাৎ তখন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক আকার নেয়নি, সমস্ত পূর্ব বঙ্গে বিস্তৃতও হয়নি এবং

(২) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি নতুন ব্যাপার অর্থাৎ এটা প্রচলিত ধারার অনুবৃত্তি নয়, জমি নিয়ে দাঙ্গার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে দাঙ্গাকে মিশিয়ে ফেলা ভুল, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের দাঙ্গাটা ইতিহাসে এক নতুন যোজনা আর এই যোজনার পেছনে শাসকদের একটা নিশ্চিত ভূমিকা আছে।

শাসকদের ভূমিকাটা কী সে প্রসঙ্গে ওই ১৫ জন নেতার বক্তব্যও অনুধাবনযোগ্য। তারা অভিযোগ করেন যে দাঙ্গার কয়েক মাস আগে থাকতেই পূর্ব বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এক লাল ইশতাহার বিলি করা হয়, ওই লাল ইশতাহার কারা ছাপত, কারা বিলি করত তা জানা যায় না, কিন্তু স্থানীয় জমিদারদের বারংবার আবেদন সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার সরকার অজ্ঞাত সূত্র থেকে আগত ও বিতরিত ওই লাল ইশতাহার সম্বন্ধে কোনরকম খোঁজখবর নেয়নি বা তার প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করেনি। ওই লাল ইশতাহার ছিল সুস্পষ্ট ও তীব্রভাবে প্ররোচনামূলক। তাতে পতিত ও নিদ্রিত মুসলমানদের জাগ্রত ও উত্থিত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। হিন্দুদের সঙ্গে এক বিদ্যালয়ে বিদ্যাভাস করতে, হিন্দুদের দোকান থেকে পণ্য ক্রয় করতে, হিন্দুদের প্রস্তুত দ্রব্য স্পর্শ করতে, হিন্দুদের অধীনে কোন কর্ম করতে নিষেধ করা হয়। বলা হয় যে মুসলমানরা অজ্ঞ এবং তাঁদের আক্কেল জাগ্রত হলে তাঁরা হিন্দুদের জাহান্নমে পাঠাবে। আরও বলা হয় যে প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, চাষীদের মধ্যেও তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ; কৃষিই হলো সম্পদের উৎস এবং হিন্দুদের কোনও নিজস্ব সম্পদ নেই, মুসলমানদের পরিশ্রম থেকেই তারা সম্পদশালী—যদি মুসলমান পর্যাপ্ত আলোকপ্রাপ্ত হয় তাহলে হিন্দুরা অনাহারে ধ্বংস হবে অথবা মুসলমান হবে। তখনকার কালে নেতারা এই লাল ইশতাহার বিতরণে ব্রিটিশদের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে দাঙ্গার প্রকৃত কারণ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু ওই ইশতাহারে নিষেধাত্মক বা আজ্ঞা মূলক অংশ বাদ দিয়ে যুক্তিমূলক অংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মানতে হবে যে কৃষিই সম্পদের উৎস এবং কৃষকদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সম্পদের উৎপাদক ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জমিদার মহাজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধীনেই তাদের শোচনীয় অস্তিত্ব। সুতরাং এটা বহুলাংশে ছিল ধর্মের প্রচ্ছদে আবৃত একটা অর্থনৈতিক সমস্যা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ—মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা—ব্রিটিশ শাসকদের সুবর্ণ সুযোগ লাভ—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম ও বিস্তার—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্নোত্তর।]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'দশকে উদ্ভূত হিন্দু জাতীয়তাবাদ বহু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত করেছিল এবং তার প্রতিফলন দেখা যায় কংগ্রেসের তৎকালীন রাজনীতিতে। ১৮৯৭-এর কংগ্রেস অধিবেশনে শঙ্করণ নায়ার স্পষ্টই ঘোষণা করলেন যে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কংগ্রেসের কাম্য নয়। কারণ ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, 'We are also aware that with the decline of British supremacy, we shall have anarchy, war and rapine. The Mohamedans will try to recover their lost supremacy. The Hindu races and chiefs will fight amongst themselves. The lower castes who have come under the vivifying influence of Western civilisation are scarcely likely to yield without a struggle to the domination of the higher castes.' দু বছর পরে লখনৌ কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ চন্দ্র দত্ত যখন এদেশে ব্রিটিশ শোষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তখন কংগ্রেসের ভিতর থেকেই তাঁকে ব্রিটিশ বিরোধী বলে সমালোচনা করা হয় এবং তার উত্তরে তিনি স্বয়ং ঘোষণা করলেন, 'Nowhere in my speech have I proposed to substitute the present form of Government in India by a system of Government by the people.' এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কংগ্রেসের একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ ছিল, যে কোন কারণেই হোক, এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষণা। এমন কি ১৯১৫-র কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিনহা ঘোষণা করেন, 'My first duty is again to lay at the feet of our august and beloved sovereign, our unswerving fealty, our unshaken allegiance and our enthusiastic homage.'

(হিন্দু জাতীয়তাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-দশকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়, কিন্তু জন্মক্ষণে তার যথার্থ দূরপ্রসারী তাৎপর্য বোঝা যায় নি। ইণ্ডিয়ন ন্যাশনাল কংগ্রেস আর অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ দুটোই প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ প্ররোচনায় এবং এদিক থেকে দুটোরই জন্মের ইতিহাসে বিস্ময়কর সাদৃশ্য বর্তমান। তাই অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়া-স স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Like the Congress in 1885, it (the Muslim League) was thoroughly loyal ; its first activities were an almost literal repetition, along communal line of those of the early Congress.' কিন্তু প্রতিষ্ঠার অচিরকাল পরেই কংগ্রেসের কোন কোন নেতার কণ্ঠে উত্থিত হলো: ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা ও সে সঙ্গে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবি। এতেই সেকালে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠল এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ কূটনীতিবিদরা অগ্রসর হয়েছিলেন সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে এবার অগ্রসর হলেন মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠায়। অতঃপর কংগ্রেসের সমস্ত দাবির বিরোধিতা ধ্বনিত হলো লীগের নেতাদের কণ্ঠে ; কংগ্রেসের দাবির প্রতিবাদ করেই লীগ ক্ষান্ত হলো না, পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করল ব্রিটিশের প্রসারিত দু বাহুতে। একথা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার যে শুরুতে মুসলিগ লীগের যথার্থ রাজনীতি ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিরোধিতা করা নয়, ব্রিটিশ স্বার্থকে সর্বস্তরে পরিপুষ্ট করা, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বোঝানো যে ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের পথেই আছে তাদের গৌরবময় উত্থানের সংকেত) মুসলিম লীগের তৎকালীন কর্ম-তৎপরতা পর্যালোচনা করে 'ইণ্ডিয়ন আনরেস্ট' গ্রন্থে ভালেণ্টাইন কিরোল লেখেন, 'It may be confidently asserted that never before have the Muhammadans of India as a whole identified their interests and their aspiration so closely as at the present day with the consolidation and permanence of British rule.'

ফলে ১৮৫৭-র জনোত্থানের পরেও ইংরেজরা যাদেরকে মনে করত সব চাইতে সাংঘাতিক শত্রু তারাই আবার অর্ধ শতাব্দী পরে সাধারণভাবে পরিণত হলো ইংরেজদের সাম্রাজ্য রক্ষার সব চাইতে নির্ভরযোগ্য প্রহরীতে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যে ইংরেজরা দীর্ঘকাল ধরে আন্তরিক প্রযত্ন নিয়েছে এবং তাদের এই প্রযত্ন শেষ পর্যন্ত একটা সুস্পষ্ট সাফল্যের রূপ লাভ করল ১৯০৯-এর

ইণ্ডিয়ন কাউনসিলস অ্যাক্ট—ওই আইনের অন্তর্গত মর্লে-মিণ্টো রিফর্মস ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করে তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যকে রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে নীতিগত রূপে প্রতিষ্ঠিত করল। একদা স্যার জন লরেন্স লিখেছিলেন যে বেঙ্গল আর্মির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বোধই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু মর্লে ও মিণ্টোর সম্মিলিত সংস্কারে সে-শক্তি পুরোপরি অতীতের বিষয় হয়ে গেল এবং ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীর একাংশ লিপ্ত হলো অপরাংশের বিরুদ্ধ-রাজনীতিতে। কেননা দৃঢ় অর্থে মুসলিম লীগের রাজনীতি যদিও পৃথক ভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিরোধী ছিল না, কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির স্বপক্ষে তথা জাতীয়তাবাদীদের বিপক্ষে সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে কার্যত তা হিন্দু ধর্মাবলম্বী দেরই বিরোধী হয়ে উঠল। ব্রিটিশ রাজনীতির তাৎপর্যই ছিল জাতীয়তাবাদী-দের বিরোধিতা করা আর ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীদের দুই বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের রাজনীতি হলো ব্রিটিশ কূটনীতিবিদদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকা।

কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী যদি নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নয়ন কল্পে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহলেই তা দোষণীয় হয় না, তখনই দোষণীয় হয় যখন তা অন্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বিরোধিতায় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে লিপ্ত হয়। আলিগড় আন্দোলনের সূত্রপাতই হয়েছিল বিশেষত উত্তর ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যযুগীয় কূপমণ্ডুকতার থেকে উদ্ধার করার জন্যে এবং এদিক থেকে তার সূচনা ছিল নির্দোষ। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সংগঠনের মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ কূটনীতিবিদদের প্রভাবে অচিরে পরিবর্তিত হতে থাকে। এপ্রসঙ্গে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে জাতীয়তাবাদী আবদুল্লা সুরাবর্দীকে লেখা আলিগড়পন্থী জিয়াউদ্দিন আহমেদের একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য—দুজনেই তখন উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশপ্রবাসী। ওই চিঠিতে বন্ধু সুরাবর্দীকে ভৎর্সনা করে আহমেদ লেখেন, 'What I call the Aligarh policy is really the policy of all the Muhammedans generally—of the Muhammedans of Upper India particularly.' অর্থাৎ ভারতবর্ষের তাবৎ ইসলাম ধর্মা-বলম্বীদের উন্নয়ন-সাধক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবি করলেও আলিগড় আন্দোলন ছিল প্রথমত ও প্রধানত উত্তর ভারতবর্ষের মুসলিমদেরই প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ শাসকরাও সাধারণ ভাবে সমগ্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পরিতোষণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেনি, তারাও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিমদের পুরো-

পুরি বিশ্বাস করেনি, পক্ষান্তরে উত্তর ভারতীয় মুসলমানের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনে তারা ছিল অকুণ্ঠ। তাই তৎকালীন ব্রিটিশ শাসননীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত উইলিয়ম স্থামুয়েল লিলি আই. সি. এস. 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইটস প্রবলেমস' গ্রন্থে লেখেন, 'It appears to me that we should sedulously seek for those among them most fitted socially, morally and intellectually to rule, and associate them with Englishmen freely and liberelly, even in the highest offices —such are the Muhammedans of Northern India—one of the noblest races in the country.' ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তো বটেই, অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিমদেরও উপেক্ষা করে শুধু উত্তর ভারতীয় মুসলিমদের অতি আহমেদ ও লিলি সাহেব দুজনেরই পক্ষপাতমূলক মনোভাব কেমন একই খাতে প্রবাহিত সেটা লক্ষণীয়।

এ-জাতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণামে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ যে দ্রুত বিরোধের রূপ নিতে চলেছে এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে স্যার পার্সিভাল গ্রিফিথস লেখেন, 'The philosopher might deplore the fact that Hindus and Muslims thought of themselves as separate people, but the statesman had to accept it.' উল্লিখিত 'স্টেটসম্যান' বলতে যে ইংরেজকেই বোঝানো হয়েছে এবং দেশবাসীর মধ্যে স্বার্থঘটিত বিভেদ সম্পন্ন করতে পারলে যে ইংরেজদেরই সবচাইতে বেশি লাভ একথা খুলে বলার দরকার গ্রিফিথস সাহেব স্বাভাবিক কারণেই বোধ করেননি। তথাপি ঘটনা এরকমই থেকে যায় যে ওই বিরোধকে মূলধন করেই ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নিয়ে ব্রিটিশ রাজনীতি আবর্তিত ও বিবর্তিত হতে থাকে এবং যখনই এর পর থেকে জাতীয়তাবাদীরা তথা কংগ্রেস নেতারা কোনও দাবি উত্থাপন করেছে তখনই হিন্দু মুসলমানের বিরোধকে ব্রিটিশ কূটনীতিবিদরা সে-দাবি পূরণে তাদের অক্ষমতার জন্যে চমৎকার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে। সে কালে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ছিল—এসব প্রতিষ্ঠান মূলত ছিল সাংস্কৃতিক এবং তার মধ্যে আবার কয়েকটি ব্রিটিশদের বিরোধিতার প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বহু প্রতিষ্ঠানেরই সহযোগী ছিল—কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগ ব্যতীত ভারতীয় ইসলামধর্মাবলম্বীদের অন্যান্য সাংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানগুলিকে আদৌ গণনীয় মনে করেনি এবং এদেশে প্রকাশিত ব্রিটিশ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতেও ওইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর

কোনও উল্লেখ থাকত না। এক কথায় বলা যায়, ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যেসব প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিরোধিতাকেই মূল কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেনি সেগুলোকে সংবাদের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা নিমজ্জিত রাখল নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের গুরুত্বও দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকল, কারণ লীগের গুরুত্ব ও গৌরবের সদ্ব্যবহারে ব্রিটিশ সরকারও সর্বদাই ছিল অব্যর্থ রূপে তৎপর। তাই একদিকে যেমন মুসলিম লীগ ব্যতীত সাধারণ ভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উন্নতি সাধক অন্যান্য সংঘগুলি ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে তেমনই অন্যদিকে ব্রিটিশের সুপরিকল্পিত প্ররোচনায় লীগের রাজনীতি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতে করতে শেষ পর্যন্ত সাধারণ ভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরই বিরোধী হয়ে ওঠে, আবার তারই প্রতিক্রিয়ায় শুধু হিন্দুত্বের ভিত্তিতে আর এক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত হয় যা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে হিন্দু-ধর্ম-ও সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকেই সনাক্ত করে।

হিন্দু মহাসভার কখন ও কবে উৎপত্তি হয় তা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। যতদূর জানা যায়, ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু নেতারা এলাহাবাদে সম্মিলিত হয়ে স্থির করেন যে এলাহাবাদকে কেন্দ্র করে অল ইণ্ডিয়া হিন্দু মহাসভা নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সম্ভবত মর্লে মিণ্টোর উদ্যোগে ১৯০৯-এর ইণ্ডিয়ান কাউন-সিলস অ্যাক্টে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রথা নীতিগত ভাবে স্বীকার করে নেওয়ার একটা অনিবার্য ফল ছিল হিন্দু মহাসভা গঠনের পরিকল্পনা। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাব হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে অমৃতসরে এক হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত-ও হয়। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজনীতি-বিদরা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পারঙ্গমতা দেখাতে পারল না। ঐক্যের অভাবে হিন্দু মহাসভা বহুলাংশে একটি নিষ্ক্রিয় অথবা প্রায় নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকল।

কিন্তু ইতিমধ্যে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটল যা অচিরে প্রায় নিষ্ক্রিয় হিন্দু মহাসভাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। প্রথমত, মুসলিম লীগের প্রধানকেন্দ্র আলিগড় থেকে স্থানান্তরিত হলো লখনৌয়ে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বেক-আর্চবোল্ডদের ভাব-ধারা ও প্রভাব থেকে লীগ অনেকখানি মুক্ত হলো। দ্বিতীয়ত, মৌলানা মহম্মদ আলী ও শওকত আলী এবং জিন্না লীগের ভাবধারায় পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করতে লাগলেন—ব্রিটিশ শাসকদের নির্লজ্জ সেবক থেকে তাঁরা লীগকে এমন একটা রাজনৈতিক সংস্থার রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন যা শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে

কিছু রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে নিতে পারবে অর্থাৎ সেবককে তাঁরা রূপান্তরিত করতে চাইলেন সৈনিকে। তৃতীয়ত, সংগ্রামের পথে অধিকার আদায়ের কথা কল্পনা করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে নিজেদের অজ্ঞাতেই তাঁরা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের কাছাকাছি এসে পড়েছেন অর্থাৎ কংগ্রেস যেসব অধিকার আদায়ের জন্যে লড়ছে লীগও সেসব অধিকার আদায় করতে ব্যগ্র এবং এই অধিকারগুলো রয়েছে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে, সুতরাং এটা একটা সংগ্রাম আর এই সংগ্রামে উভয়েরই লক্ষ্য হলো ব্রিটিশ শাসকের হাত থেকে কিছু অধিকার কেড়ে নেওয়া। চতুর্থত, সমস্ত সংগ্রামের জন্যেই কিছু কৌশলের প্রশ্ন থাকে এবং এই সংগ্রামের কৌশল হলো সমান শত্রুর বিরুদ্ধে উভয়ের সহযোগিতার নীতি বা কৌশল। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে অনুষ্ঠীত মুসলিম লীগের লখনৌ অধিবেশনে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও জিন্নার চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট; এই অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়, ভারতের উপযুক্ত স্বায়ত্ত-শাসন পদ্ধতি অর্জন করতে হবে 'through constitutional means by promoting national unity, by fostering public spirit among the people of India, by co-operating with the other communities in the said purposes.' মুখ্যত জিন্নারই সযত্ন প্রয়াসে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং সর্ব ভারতীয় মুসলীম লীগ এই দুটো প্রতিষ্ঠানেরই বার্ষিক অধিবেশন বসল বোম্বাইয়ে। এই সুযোগে দুপক্ষের নেতাদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হলো যা ১৯১৬র কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট নামে পরিচিত।

যেসব হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে জন-স্বাতন্ত্র্য বা জাতি-স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে কংগ্রেসকে এই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে তাঁরা স্বভাবতই ওই চুক্তিতে হতাশ হলেন— বুঝলেন যে কংগ্রেসের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, পৃথক ভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের স্বার্থকেও সিদ্ধ করা যাবে না, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে হিন্দু মহাসভাকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে তাঁরা ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে তৎপর হলেন। ১৯১৮-র ডিসেম্বর মাসে অখিল ভারতীয় হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন বসল দিল্লীতে এবং সভাপতি হলেন স্যার রামপাল সিং। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে এই স্যার রামপাল সিং ছিলেন রাজা রামপাল সিং এবং দয়ানন্দের মৃত্যুর পরে ইনি-ই হন গো-রক্ষিণী সভা

আন্দোলনের পুরোহিত। এই সময় থেকেই মালাবার মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুদের অবস্থার প্রতি হিন্দু সম্মেলন দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। এর ফলে অনিবার্য ভাবেই দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রস্তাব করলেন এমন এক হিন্দু সংগঠন প্রতিষ্ঠার যার কাজ হবে হিন্দু চেতনাকে জাগ্রত করা ও রক্ষা করা। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তার নেতৃত্বে ইসলামে ধর্মান্তরিত মালাকানা রাজপুতদের ফিরিয়ে আনা হলো হিন্দু ধর্মের আওতায়। অতঃপর যখন ১৯২৪-এ বেলগাওয়ে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বসল তখন তিনি হলেন সভাপতি। ওই অধিবেশনে ডক্টর মুঞ্জে কর্তৃক আনীত প্রস্তাব অনুসারে স্থির হলো যে দেশের সর্বত্র হিন্দু মহাসভার শাখা খোলা হবে এবং এর লক্ষ্য হবে শুধু ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতি সাধন করা নয় হিন্দুদের রাজনৈতিক অধিকারগুলোরও রক্ষণাবেক্ষণ করা। সভাপতি মালব্য ঘোষণা করলেন, 'In this country they had more than one culture. Hindus must cherish their own and preserve it and spread it Hindus must preserve and popularise their culture as Muslims were doing'.

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই নিজেদের একটা পৃথক জাতি হিসেবে গৌরব বোধ করতে থাকে এবং সেই আত্মশ্লাঘাতেই তারা ঘোষণায় সোচ্চার হয়ে ওঠে যে পৃথিবীতে হিন্দু জাতি বলে বহু প্রাচীন গরিমায় দীপ্ত এক মহান স্বতন্ত্র জাতি আছে। তারা বিস্মৃত হয় যে দাবিটি ঘোষণার পরিণামে তাদের জাতি সম্পর্কিত ভাবসত্ত্বের থেকে ভারতবর্ষের মুসলিম খ্রীস্টান বৌদ্ধ ইহুদী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়— এটা দেশভাগের তুল্য না হলেও ভাবগত অর্থে এক প্রকারের জনভাগ বটে—এবং এই জনচ্ছেদকারীরা অত্যুৎসাহে একথাও বিস্মৃত হয় যে ধর্মকেই জাতির সংজ্ঞা সূত্র অথবা একমাত্র মানদণ্ড ধরলে নেপালীদের বৃহত্তর অংশই হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে আর তার তাৎপর্য দাঁড়াবে এই যে দেশ হিসেবে নেপালের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পাওয়া উচিত। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর জাতি-কল্পনার খাতেই জাগ্রত ভারতীয় নেতৃত্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রবাহিত হতে থাকে আর যেসব নেতা ওই পথে যাননি তাঁরা আবার পাশ্চাত্য শক্তি ও সংস্কৃতির এতই অনুগত ছিলেন যে তাঁদেরকে ইংরেজের দাস বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এমতাবস্থায় যাদেরকে পৃথক জাতি বলে হিন্দু জাতি-কল্পনার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো তাদের সামনে কোন্ পথ খোলা ছিল? কী বলে তারা আত্মপরিচয় দিত? যে অর্থে হিন্দুরা স্বদেশী সে-অর্থে তারা স্বদেশী নয়। যে অর্থে ইংরেজরা বিদেশী সে অর্থে তারা বিদেশী নয়। তাহলে তারা কতদিন ওইরকম আত্মপরিচয়হীন অবস্থাতে হিন্দু জাতি-কল্পনার বাইরে ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকত? হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা যাঁদেরকে পৃথক করে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বৃহত্তম অংশ ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। অতঃপর অনিবার্য ভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়রা নিজেদের একটা পৃথক জাতি বলে কল্পনা করতে শুরু করে। হিন্দু জাতিতত্ত্ববাদীরা একমাত্র ধর্মকেই জাতির ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলিম জাতিতত্ত্ববাদীরা ধর্মের সঙ্গে ভূগোলকেও যোগ করেছেন, তাঁরা বলেছেন যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অভি-ব্যাক্তির মধ্যে বসবাসকারী মুসলিমরা এক স্বতন্ত্র জাতি এবং পরে এরই ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপিত হয়। যুক্তি দিয়ে ঘটনার পরম্পরা বিচার করলে পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে ভারতীয় মুসলিমদের অবদান পরে যোজিত হয়, কেননা পাকিস্তানের প্রথম ভিত্তি রচিত হয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের হিন্দু জাতীয়তাবাদে। অস্বাভাবিক ক্রিয়ার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই অনিবার্য। এবং অস্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সদ্ব্যবহারে সুযোগ-সন্ধানী ইংরেজরা ত্রুটি রাখেনি। জহরলাল নেহরু তাঁর 'অটোবায়োগ্রাফি'-তেও লিখেছেন, 'Socially speaking, the revival of Indian nationalism in 1907 was definitely reactionary.' এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ শাসকের প্ররোচনাতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো, আবার তার প্রত্যুত্তরে প্রতিষ্ঠিত হলো, হিন্দু মহাসভা। এভাবে একটা ক্রিয়ার পরে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, পরে আবার তার প্রতি-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে আর ব্রিটিশ সরকার দেশবাসীর ধর্ম-ভিত্তিক বিরোধ নিজেদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাওয়ার স্বর্ণ সুযোগ পেয়েছে। যেটা বিস্ময়কর সেটা হলো এই যে, যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে পরিচয় দিয়েছে, যারা নিজেদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা দাবি করেছে তারাই ব্রিটিশ সরকারকে দেশবাসীর মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ ঘটিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ কায়েম রাখতে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি।

মানব সমাজে বিচ্ছেদ ও বিরোধ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মানুষ তো আর শিল-নোড়া নয় যে পাশাপাশি থাকবে অথচ কখনও ঠোকাঠুকি লাগবে না। উপলক্ষ্য যাই হোক-না কেন, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে রেষারেষি ও

মারামারি পৃথিবীর সব দেশেতেই এক প্রাচীন সত্য—তা একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও হতে পারে। ইয়োরোপে একটা পুরো শতাব্দী কেটেছে একই ধর্মাবলম্বীদের দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অকল্পনীয় রক্তপাতে। বিহারে দু বর্ণের মধ্যে দাঙ্গা মামুলি ঘটনা আর আসামে ভাষা নিয়ে দাঙ্গা সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক নতুন উপসর্গ। আবার ১৯৭২-এও ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের বান্দাতে প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণদের সশস্ত্র আক্রমণে সহস্রাধিক হরিজন ঘড়বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। সব দেশে সব কালে এরকম দৃষ্টান্ত প্রচুর।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, আরও যথাযথ ভাবে বলা যায় যে বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে, ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে কুমিল্লায় ও মৈমনসিংহে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে-ধরনের দাঙ্গা শুরু হয় তা চরিত্রে ও স্বরূপে ভারতীয় ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। এবারে অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত, জমিদার ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বা মুসলমান শ্রেণীর প্রচারে ও প্ররোচনায় এবং তাদেরই রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থে সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান অর্থাৎ যারা দৈহিক শ্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে তারা পরস্পরের চূড়ান্ত শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এজাতীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখনই এক-আধটা বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা হয়ে থাকতে পারে না। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে পেশোয়ারে, ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যায় ও ফৈজাবাদে, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে আগ্রায় অনুরূপ ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরম্পরায় সংঘটিত হয়। উল্লিখিত আগ্রায় দাঙ্গার সময় যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর ছিলেন স্যার জন হিউয়েট—বিগত সাইত্রিশ বছর ধরে তিনি এই অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে বহুবিধ সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং জনসাধারণের মনোভঙ্গি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। মহরমের সময় সংঘটিত আগ্রার দাঙ্গার পরে তিনি লক্ষ করেন যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অকস্মাৎ সম্পর্কের অবনতি হয়েছে এবং দু ধর্মাবলম্বীর মনোভঙ্গিতে উল্লেখ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। নৃশংসতায় বিহারের সাহাবাদে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত দাঙ্গা পূর্ববর্তী সমস্ত দাঙ্গাকে ছাড়িয়ে গেল; ৩০শে সেপ্টেম্বর হিন্দু ধর্মাবলম্বী হাজার হাজার দুর্বৃত্ত প্রায় একযোগে ইব্রাহিমপুর ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে আক্রমণ শুরু করে; ২রা অক্টোবর থেকে তা ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ে জেলার বিভিন্ন এলাকাতে এবং বহুখ্যাত ব্রিটিশ আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, ৯ই অক্টোবর তা ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী গয়া জেলাতেও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এর চাইতে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর হয়নি। পরের বছর হরিদ্বার থেকে ছ মাইল দূরে অবস্থিত কাটারপুরে যে-দাঙ্গা হয় তাতেও বহু মুসলিম রমণী আহত হয়।

আগে কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি এমন নয়। হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে প্রথম ব্যাপক ও সুপ্ররোচিত দাঙ্গা হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ বিষয়ে ডক্টর পি. সি. ঘোষ 'ইণ্ডিয়ন ন্যাশনল কংগ্রেস ১৮৯২-১৯০৯' নামক ইংরেজী গ্রন্থটিতে বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য মূল রচনাতে ও পাদটীকাতে দিয়েছেন। সেই দাঙ্গাগুলোর মধ্যে বোম্বাইয়ের দাঙ্গা সবচাইতে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসচিবকে সে বিষয়ে বোম্বাইয়ের গভর্ণর বহু চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন পাঠান—এগুলো 'রিলিজিয়স ডিস্টার্বেনসেস' নামে স্বতন্ত্র খণ্ডে পার্লামেণ্টারী পেপার্সের অন্তর্ভুক্ত। 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড স্টেটসম্যান' পত্রিকা ১৯৯৩-র সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এই তিন মাস ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে বহু সংবাদ এবং ২রা সেপ্টেম্বর 'দি রিসেণ্ট রায়টস' নামে একটি স্বতন্ত্র সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই দাঙ্গাগুলো সংঘটিত হয় শহরাঞ্চলে, যেমন গয়া, আজমগড়, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে। যেসব শহরে গোরক্ষিণী সভা সক্রিয় ছিল সেসব অঞ্চলেই এই দাঙ্গা-গুলো সংঘটিত হয়। মুসলিমদের ঈদ উৎসব পালনের দিন গো-রক্ষিণী সভার প্ররোচনা ও হস্তক্ষেপ-ই হলো সংঘর্ষের সূচনা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দ স্বরস্বতী গো-রক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন; পরের বছর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে রাজা রামপাল সিং নামে অযোধ্যার একজন তালুকদার গো-রক্ষণী সভার কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। একটু আগেই এই রামপাল সিঙের কথা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় হিন্দু সম্মেলনের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাতে গো-রক্ষিণী সভার ইঙ্গিতময় ভূমিকা অনস্বীকার্য। গোহত্যা নিরোধের জন্য নরহত্যার উপযুক্ত মানসিকতা সংগঠনের ব্যাপারটা একই সঙ্গে কৌতুককর ও মর্মান্তিক এবং ওই মানসিকতার উৎস হলো ধর্মান্ধতা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মান্ধতার সঙ্গে যুক্ত হলো রাজনীতি।

১৯১৭ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত বিহারে সংঘটিত দাঙ্গাগুলোর সূচনাকাল লক্ষ করলে দেখা যায় যে সেখানে বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই দাঙ্গা বেধেছে জুলাই-অগাস্ট মাসে এবং আরও ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে ধরা পড়বে যে দাঙ্গাগুলো রামনবমীর দিন বা তার অব্যবহিত পরে শুরু হয়েছে। বিহারে রামনবমী উদযাপনের একটা বিশেষ রীতি আছে—সে সময় তারা রাস্তায় রাস্তায় দল বেঁধে ও সশস্ত্র ভাবে রাবণকে হত্যার বা অনার্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের মহড়া দিয়ে থাকে আর ওই মহড়ার সময়েই কখনও কখনও অহিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায়, সেই সংঘর্ষই পরিণত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।

কেরলের মোপলা অভ্যুত্থানও শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয় যদিও শুরুতে এই অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকার। মোপলাদের উৎপত্তি ও পাশ্চাত্য শক্তির প্রতি বিরোধের বিষয়টি অষ্টম পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ব্রিটিশ আধিপত্যের পর্বেও মোপলারা কম করে পঁয়ত্রিশবার সরকারের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। তবে মোপলাদের সবচেয়ে অবিস্মরণীয় অভ্যুত্থান হলো ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের অভ্যুত্থান। অসহযোগ আন্দোলনের সমান্তরালে এই অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গান্ধীজীর আহ্বানেই সমস্ত ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অসহযোগিতার উদ্দীপনায় উত্তাল হয়ে ওঠে। 'Gandhi is India,—জহরলালের এই আপ্তবাক্য তখন যতখানি সত্য হয়ে উঠেছিল আর কখনও তা হয়নি। এই প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়া'স স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম' গ্রন্থে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'Gandhiji had awakened a sleeping giant, who shook his invincible locks in a manner which did not always fit iuto the pattern laid down by the alostle of non-violence in thought, word and deed. In Bengal, there was a no-tax campaign among the Peasantry of the Midnapore district , Sikh peasants in the Punjab rose against the luxury and corruption of their priests who were backed by the government , in South India there was the rebellion of the Moplahs of Malabar, a rebellion which took on a communal colouring, but was essentially aimed against the alien government and landlords and money-lenders who basked in its favour.'

'ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার ১৯২১-২২' থেকে রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম' গ্রন্থে মোপলা অভ্যুত্থান সম্বন্ধে সরকারী প্রতিবেদনের যে-দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় যে গান্ধীজী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক স্বরাজ আগমনের পুনঃপুনঃ আশ্বাস মোপলাদের উদ্দীপিত করে তোলে এবং ১৯২১-এর প্রথম থেকেই গ্রামে গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় কালিকটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করার ফলে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংঘর্ষ ভয়ঙ্কর রূপ নেয় এবং ইয়োরোপীয়রা পরিবারবর্গকে বাইরে প্রেরণ করে, আর কেউ কেউ ওই অঞ্চল পরিত্যাগ করে। মোপলারা পথ অবরোধ করে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয় এবং বহুস্থলে রেললাইন উপড়ে ফেলে। 'Such Europeans as did not succeed in escaping—and

they were fortunately few—were murdered with bestial savagery'. এর অব্যবহিত পরের বাক্যেই সরকারী প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, 'As soon as the administration had been paralysed, the Moplahs declared that Swaraj was established' কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে মোপলাদের স্বরাজ ছিল অত্যন্ত অল্পকাল স্থায়ী। মাদ্রাজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গুর্খাবাহিনীকেও মোপলা-উত্থান দমন করার জন্যে নিয়োগ করা হয়। সরকারী হিসাব অনুসারে সরকার পক্ষে ৪৩ জন নিহত এবং ১২৬ জন আহত হয়, কিন্তু ঘটনা ও সংঘর্ষের ভয়াবহতা থেকে এই সংখ্যা অনেক কম, কেননা সরকারী হিসাবেই শুধু গুর্খা নিহত হয়েছিল ৩১০ জন। মোপলাদের মৃত্যুও সব সময় সংঘর্ষকালে বীরের যোগ্য মৃত্যু হয়নি—১৯২১-এর ১৯শে নভেম্বর ৭০ জন মোপলাকে যখন বন্দী করে মালগাড়ী ট্রেনে চালান করা হয় তখন তারা ট্রেনের কামরার ভিতরে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। এটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে বন্দীদের এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী ব্যক্তিকে রক্ষার্থে ইংরেজরা একটা তহবিল গড়ে তুলেছিল।

যাহোক, এই মোপলা উত্থানের একটা বড়ো অংশ যে হিন্দু নিধনে নিযুক্ত হয়েছিল তা সর্বজন স্বীকৃত। এবং এর সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রচারে ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ সংবাদপত্র সমূহ ও ব্রিটিশের সমর্থক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রচণ্ড তৎপরতা দেখিয়েছে। গান্ধীজী যদিও মোপলাদের সম্বন্ধে "সাহসী" এবং "ঈশ্বরভীত" বিশেষণ দুটি ব্যবহার করেছেন তবু তিনিও মোপলা-উত্থানের সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে স্বীকার করেছেন। জামোরিনরা একদা মোপলাদের প্রতি কতখানি প্রশ্রয়-পরায়ণ ছিল তার কথাও অষ্টম পরিচ্ছেদে বলেছি, কিন্তু এবারে নারীর সম্মানহানি, শিশু-স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে হত্যা, গৃহে অগ্নি-সংযোগ ও লুণ্ঠন, বলপ্রয়োগে ইসলাম গ্রহণ প্রভৃতি কীর্তিকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভায় জামোরিন-ই সভাপতিত্ব করেন। মোপলারা উচ্চতর মানবিক আদর্শ কোনদিন পালন করেনি, সুসংস্কৃত জীবন কোনদিন যাপন করেনি, সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ হানবার সময় তারা যে নৃশংসতা ও বর্বরতার পন্থা নিয়েছিল এতে কারও অবিশ্বাস জাগার হেতু নেই। উপরন্তু তারা দেখেছিল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে হিন্দু ধর্মাবলী প্রতিবেশীরা তাদের সমর্থন করেনি, সাহায্য দেয়নি, এমন-কি নিরপেক্ষও থাকেনি, বরং সর্বপ্রকারে ইংরেজদেরই সাহায্য করেছে এবং যে পুলিশ-ও-সৈন্য-বাহিনী তাদের দমনে এগিয়ে এসেছিল তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। স্বাভাবিক কারণেই অশিক্ষিত দরিদ্র নিপীড়িত মোপলার এক

করে ফেলেছিল ইংরেজ ও হিন্দুকে। কিন্তু বস্তুগত বিচারে এর সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য বহুলাংশে অতিরঞ্জিত। তাই আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে এ প্রসঙ্গে যে-বিবৃতি গৃহীত হয় তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিবৃতিতে বলা হয়, 'The Congress expresses its firm conviction that the Moplah disturbance was not due to the Non-co-operation or the Khilafat Movement, specially as the Non-co-operation and Khilafat preachers were denied access to the affected parts by the District authorities for six months before the disturbance, but is due to causes wholly unconnected with the two movements, and that the outbreak would not have occurred had the message of non-violance been allowed to reach them. Nevertheless this Congress deplores the acts done by certain Moplahs by way of forcible conversions and destruction of life and property, and is of opinion that the prolongation of the disturbance in Malabar could have been prevented by the Government of Madras accepting the proffered assistance of Maulana Yakub Hassan and other Non-co-operators and allowing Mahatma Gaudhi to proceed to Malabar, and is further of opinion that the treatment of Moplah prisoners as evidenced by the asphyxiation incident was an act of inhumanity unheard of in modern times and unworthy of a Government that calls itself civilised'. সঙ্গত কারণেই গান্ধীজী প্রভাবিত ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস মোপলা-উত্থানের সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে উপেক্ষা করেছে, কারণ এই উত্থানের ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, তার উদয় হয় পরে এবং সেটাও বহুলাংশে আরোপিত।

কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে গৃহীত বিবৃতিতে যদিও বলা হয়েছে যে মোপলা উত্থানের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক ছিল না তবু এবিষয়ে অন্যরকম মতও আছে। ডব্লিউ ক্যাণ্টোয়েল স্মিথ তাঁর 'মডর্ণ ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন সে দেশ জুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের খবরাখবর মোপলাদের উদ্দীপিত করে। স্মিথ লিখেছেন, 'They attacked the police and the military who were there to keep them oppressed, they attacked their landlords and money-lenders, they attackad everyone in sight. For a short time they were in fiery possession of a considerable area. The Moplahs were

bitter, bitterly anti-Hindu, bitterly anti-British, bitter against the world that gave them only misery. Their ardour was the ardour of an opperessed class rising against its enemines, thc ardour of religious fanaticism destroying sin and establishing a kingdom of good.' এই নিপীড়িত শ্রেণীর কাছে হিন্দুরা একটা অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতিভূ—তাদের কাছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর তাৎপর্য ছিল পীড়নকারী ও শোষণকারী এবং ব্রিটিশদের সহযোগী।

কিন্তু যেভাবেই দেখা হোক-না কেন, প্রকৃত ব্যাপার এই যে এতদিনকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে জনসাধারণেরই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এ-জাতীয় দাঙ্গা অত্যন্ত বিরল ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এটা দেখা যাচ্ছে বিশেষ একটা পর্ব থেকেই এবং অনেকটা যেন সরকারী নীতি-রীতির প্রতিক্রিয়াতেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই নতুন বৈশিষ্ট্যের উদয়কে ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতিহীন লেখকরাও উপেক্ষা করতে পারেননি, তাই 'দি লাস্ট ইয়র্স অফ দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া'-র লেখক মাইকেল এডোয়ার্ডস-ও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 'from 1922 onwards bloody conflicts between Hindus and Muslims became a regular feature of Indian life.' এই নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেওয়ার প্রসঙ্গে কারা আক্রমণ শুরু করল আর কারা আহত বা নিহত হলো সেসব প্রশ্ন জরুরি নয়। সবচাইতে জরুরি প্রশ্ন হলো, মাত্র দশ বছরে হঠাৎ কেন এতগুলি দাঙ্গা ঘনঘন ঘটল? পরিস্থিতির এমন কী পরিবর্তন ঘটল যার ফলে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটা সম্ভব হলো? তবে কি ব্রিটিশ প্রশাসন এসময় দুর্বল ও জীর্ণ হয়ে পড়েছিল? তবে তারই সুযোগে হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণ বহু শতাব্দীর পুঞ্জিত আক্রোশে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? কিন্তু দুর্বল প্রশাসন, আধা-নৈরাজ্য, এমনকি পুরো নৈরাজ্যের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ আগেও বহুবার গেছে। তখন কেন হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধে নি? তবে কি সত্য এই যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনাগুলোকে বা পরিস্থিতিকে এমন ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল যে জনসাধারণের হিন্দু অংশ মুসলমানকে আর মুসলমান অংশ হিন্দুকে শত্রু ভাবতে শিখতে শুরু করল?

এসব প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিতে পারে অবিকৃত ইতিহাস—সাধারণ মানুষদের নিয়ে সমাজের প্রকৃত ইতিহাস। মুসলমান সুলতানের শাসনাধীন অঞ্চলে শ্রমজীবী বা কৃষক-কারিগর শ্রেণীর মুসলিমরা পায়ের উপর পা তুলে আরামে থেকেছে আর হিন্দুরা খেটে খেটে মুখের রক্ত তুলেছে এমন নজির আছে কি?

আবার হিন্দু রাজার অধীনে হিন্দু চাষাভুষোরা লাঠি ঘুরিয়েছে আর মুসলিমরা বুকে হেঁটে বেঁচেছে এমন দৃষ্টান্ত আছে কি? এমন নজির বা দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। বরং দেখা গেছে যে অবস্থাপন্ন হিন্দু সমাজ মুসলমান শাসকের অধীনেও অবস্থাপন্নই থেকেছে এবং অবস্থাপন্ন মুসলিম সমাজও হিন্দু শাসকের অধীনে সমান সৌভাগ্যবানই থেকেছে। অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে কোনও বিশেষ সমাজই নিজের নিজের শ্রেণিগত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়নি কিংবা শ্রেণিগত দুর্দশার থেকে মুক্তি পায়নি। সাম্প্রদায়িক বা পরধর্মদ্বেষী বলে যারা ভারতীয় ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েছে তারাও অবস্থাবান পরধর্মীদেরকে বেগার গতর খাটায়নি অথবা দুর্দশাগ্রস্ত স্বধর্মীদের অবস্থা পালটে দেয়নি। সোজা বাংলায় ব্যাপারটা এই যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভাগ্যবান শ্রেণী ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকের অধীনেও ভাগ্যবান শ্রেণী হিসেবেই থেকেছে ও শাসকের ধর্মাবলম্বী ভাগ্যহীন শ্রেণী কখনই রূপান্তরিত হয়নি ভাগ্যবান শ্রেণীতে—শ্রেণিগত অবস্থার যেখানে ধর্মীয় কারণে হেরফের হয়নি সেখানে ধর্মীয় উপকরণের তাৎপর্য নিঃসন্দেহে গৌণ।

অধিকৃত বা যথাযথ ইতিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপনের আরও কারণ আছে। প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি পড়লেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের ইতিহাস মুখ্যত আর্যাবর্তের বা উত্তর ভারতের ইতিহাস রূপে পরিবেশিত, ফলে সেখানে দাক্ষিণাত্যের তথা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস উপেক্ষিত, তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসও তাতে পেয়েছে গৌণ স্থান। মুঘল শাসনের দু শ বছর দিল্লী ছিল ভারতীয় ইতিহাসের কেন্দ্রে, কিন্তু ওই দু শ বছর ছাড়া আরও তিন হাজার বছরের যে ভারতীয় ইতিহাস তাতে দিল্লীর কোনও কেন্দ্রীয় গৌরব নেই। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এবং তাঁদের দেখাদেখি দেশীয় ঐতিহাসিকরাও যখন দিল্লী-কেন্দ্রিক ভারতীয় ইতিহাস প্রণয়ন করলেন তখন তা মুসলিম লীগেরই সহায়ক হলো, কেননা দিল্লী-কেন্দ্রিক ভারতীয় ইতিহাস থেকে উদ্ভূত যুক্তিধারা অনুসরণে মুসলিম লীগ দাবি তুলল যে যেহেতু মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজরা ভারতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল তাই ব্রিটিশ ভারতের আইন সভাতে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা অর্জনে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক আসন চাই। মুসলমানদের রাজত্ব ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছে বলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দিতে হবে এটা কী ধরনের যুক্তি তা নিয়ে তর্ক তোলা বৃথা, তবে ক্ষতিপূরণের বা রাজন্যদের ভাতা দেওয়ার প্রথা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ধারণাসম্মত এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতও এই প্রথাকে সম্মান দেখিয়েছে।

আসল কথা এই যে আইনসভাতে অধিক সংখ্যক আসনের যে-দাবি মুসলিম লীগ তুলেছিল সে-দাবিকে দাঁড় করানো হয়েছিল যে ঐতিহাসিক সত্যের উপরে সেটা আদৌ সত্য নয়, কেননা আকবর থেকে ঔরঙ্গজেবের আমল ছাড়া ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশ কখনই দিল্লীর মসনদের অধীনে আসেনি। তাছাড়া ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করে তার অব্যবহতি আগে ভারতবর্ষের প্রধান তিনটি শক্তি ছিল, হিন্দুস্তানী শক্তি, মারাঠা শক্তি এবং ইরানী-তুরানী শক্তি; লক্ষণীয় যে হিন্দুস্তানী শক্তি বলতে সেকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শক্তিকে বোঝান হতো না, তাই ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল শক্তিকে হিন্দুস্তানী শক্তি বলে গণ্য করা হতো এবং মুঘল বাদশাহরাই নেতৃত্ব দিতেন হিন্দুস্তানী শক্তিকে যেমন ইরাণী-তুরাণী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন নিজাম আর মারাঠা শক্তির নায়ক হতেন পেশোয়া। স্পষ্টতই এখানে হিন্দুস্থানী শব্দটা মৃত্তিকার সঙ্গে সম্বন্ধের দ্যোতক, তাই উনবিংশ শতাব্দীতে নামেমাত্র মুঘল বাদশাহ-ও হিন্দুস্থানী গোষ্ঠীর-ই নায়ক।

হিন্দু শব্দটা প্রথমে ছিল ভৌগোলিক পরিচয়-জ্ঞাপক, এদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আগমনের ফলে আর্যাবর্ত-চেতনা পরিণত হয় হিন্দু-চেতনায় এবং আস্তে আস্তে হিন্দু শব্দটা হয়ে ওঠে ধর্মীয় পরিচয়ের বাহক, কিন্তু হিন্দুস্তান শব্দটি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভৌগোলিক সংজ্ঞা-জ্ঞাপক থেকেই যায় এবং প্রধানত আর্যাবর্তই অভিহিত হতে থাকে হিন্দুস্তান বলে, তাই কবি ইকবালও হিন্দুস্তানকে ভারতবর্ষের সমার্থক জ্ঞান করে লিখেছেন, 'সারা জহানসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হমারা।' উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই হিন্দু জাতি বলে এক পৃথক জাতি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তার বিপরীতে মুসলিম জাতির ধারণা জন্ম লাভ করে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুস্তানের ক্ষমতা ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছিল এ-তথ্য আংশিক সত্য হলেও মনে রাখা উচিত যে সে সময়ে হিন্দুস্তানে শিখদের প্রবল কর্তৃত্ব ছিল এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ছিল মারাঠাদের পরাক্রান্ত গৌরব—মারাঠা ও শিখদের পরাস্ত করেই ইংরেজরা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রকৃত কর্তৃত্ব অধিকার করে। মুসলীম লীগ যে এসব ঐতিহাসিক সত্যকে গণনা করেনি তার কারণ এতে তাদের দাবি দুর্বল তথা ভিত্তিহীন হয়ে যায় আর ইংরেজরাও এমন ভাবে ভারতীয় ইতিহাস রচনা করেছিল যাতে মুসলিম লীগের দাবি যথার্থ বলে প্রতিভাত হয়।

সম্ভবত একই কারণে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রাচীন যুগের বদলে হিন্দু যুগ বলে আর মধ্যযুগের বদলে মুসলিম যুগ বলে

বিভক্ত করেছিল, কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে প্রাচীন যুগে হিন্দুত্বের চেতনা জাগেইনি আর মধ্যযুগের উত্তর ভারতে মুসলিমরা প্রবল পরাক্রান্ত হলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরই কর্তৃত্ব ছিল অব্যাহত। আরও একটি কথা এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে মধ্যযুগে যদিও উত্তর ভারতে মুখ্যত ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই রাজত্ব করেছে তবু তারা তুর্কী, আফগান, পাঠান, মুঘল প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত ছিল এবং সেই অনুসারে তারা ভিন্ন ভিন্ন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তার বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়নি। দুঃখের বিষয় এই যে পরবর্তী কালে যেসব ভারতীয় ঐতিহাসিক ইতিহাস প্রণয়নে অগ্রসর হলেন তাঁরা ইংরেজ ঐতিহাসিকদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন ফলে শিক্ষিত সমাজ আরও বিভ্রান্ত হয়। এটা কি একটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার নয় যে, বর্গীদের অকল্পনীয় অত্যাচারের কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক স্মৃতি থেকেও লুপ্ত হয়ে গেল অথচ ইংরেজদের দ্বারা নির্বিচার লুণ্ঠন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'আনন্দমঠে' মুসলিম বিতাড়নের আহ্বান জানানো হলো এবং 'পলাশীর যুদ্ধে' দেশপ্রেমিক নবাবকে বহু মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত করা হলো?

ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসকে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করলে যেসব সাধারণ সত্য নির্গত হয় সেগুলোকে সরলীকৃত করলে কী দেখতে পাওয়া যায়?

ভারতবর্ষে ইসলাম আগমনের আগে বহু শোণিতের ধারা এসেছে এবং তার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে ভারতীয় জীবন, ইসলামের আগমনের পরে শুরু হয় বিদেশাগত ধর্ম ও সে ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া। কিন্তু সে-প্রক্রিয়ার সাফল্য কোনও স্থায়ী রূপ পাওয়ার আগেই ঘটে ইংরেজের আগমন। ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সাধনাতে ভারতীয় জীবন ধারা এক নতুন ও সমৃদ্ধ সম্ভাবনার পথে এগিয়ে গিয়েছিল এবং তার সন্তোষ-জনক প্রমাণ পাওয়া যায় সাহিত্যে পাঁচালীতে সংগীতে চিত্রকলায় স্থাপত্যে ও শিল্পের অন্যান্য শাখাতে। লক্ষণীয় যে অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক স্তরে নিম্ন শ্রেণীর জীবন ছিল একই সূত্রে বাঁধা—মুসলিম শাসনের আমলে মুসলিম কৃষক বাস করত হিন্দু কৃষকের মতো একই দুর্দশায় এবং হিন্দু শাসকের অধীনে হিন্দু কৃষকের দুর্দশাও কিছু লঘু হতো না, তা থাকত মুসলিম কৃষকেরই সমান এবং বহু সময়ে কায়িক শ্রমজীবী গ্রামীণ জনসাধারণ জানতেই পারত না যে কখন কোন ধর্মাবলম্বী শাসকের অধীনে তারা বাস করছে, কেননা শাসকের ধর্মের প্রভাব সাধারণত নিম্নশ্রেণীর জীবন পর্যন্ত পৌঁছতই না। তদুপরি নিম্নশ্রেণীর

জীবনে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ছিল যেমন জীবন্ত তেমনই ধারণশীল— সেখানে হিন্দু ধর্ম প্রভাবিত করে মুসলমান ধর্মকে আর মুসলমান ধর্ম করে হিন্দু ধর্মকে এবং প্রভাব গ্রহণে দু ধর্মাবলম্বীরাই সমান পারঙ্গম ছিল আর দু ধর্মাবলম্বীরাই ছিল শাস্ত্রাদি বিষয়ে একই সঙ্গে অজ্ঞ ও ত্রস্ত, ফলে জীবন-জগৎ সম্বন্ধীয় গভীরতর ধারণাগুলিতে দু ধর্মাবলম্বীরাই আসলে ছিল পরস্পরের সহধর্মী এবং এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দু ধর্মের সমন্বয়ে ভারতীয় লোকসত্য প্রকৃতই এক অজ্ঞাতপূর্ব রূপ ও স্বরূপ অর্জন করে।

অবশ্য উত্তর ও পূর্ব ভারতে যারা কায়িক শ্রম করে না, নিজের কর্মক্ষমতার চাইতে যারা বর্ণ বা বংশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করে, যাদেরকে উচ্চ বর্ণ বা শ্রেণীর মানুষ বলা যায় তারা ধর্মীয় প্রসঙ্গে বহুলাংশে ও মূলত রক্ষণশীলই থেকে যায়। উচ্চ হিন্দুরা আরবী ফার্সী প্রভৃতি ভাষা রপ্ত করে মুসলমান শাসকদের বিভিন্ন দপ্তরে কাজকর্ম করতে থাকে, উচ্চপদস্থ ও অবস্থাপন্ন মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে, পোশাক-পরিচ্ছদ আসবাব-পত্র ও আদব-কায়দার মতো বাহ্য ব্যাপারগুলোতে মুসলমানদের অনুকরণ করতে থাকে, কিন্তু ধর্মীয় আচারে তারা ব্রাহ্মণ্য ও শাস্ত্রীয় প্রাধান্যকেই গৌরবময় হিন্দু লক্ষণ বলে পালন করতে থাকে; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উত্তর ভারতে, বিশেষত পাঞ্জাবে, উচ্চ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটা অংশ এখনও উর্দুভাষী সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে আছে, পক্ষান্তরে অবস্থাপন্ন ও অভিজাত মুসলমানরা দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণায় ও চর্চায়, সামাজিক আদান-প্রদানে উদার হলেও শাস্ত্রানুগ ধর্মাচরণকেই পরম আদর্শ রূপে গ্রহণ করে। ফলে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আপাত মিলনের ফাঁকে ফাঁকে উভয় ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই থেকে যায় দুরতিক্রম্য স্বাতন্ত্র্যের দম্ভ।

একথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে এখানে বৃহত্তর জনসাধারণের তথা কায়িক শ্রমজীবীদের জীবনে ধর্মীয় প্রসঙ্গে চলছিল সমন্বয়ের প্রক্রিয়া, পক্ষান্তরে অগ্রসর ও অবস্থাপন্ন শ্রেণীতে যারা আধুনিক যুগে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয় মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তে, তাদের জীবনের যে প্রক্রিয়া চলছিল তাকে বলা উচিত সমবায়ের প্রক্রিয়া অর্থাৎ শেষোক্ত স্তর ধর্মীয় প্রসঙ্গে একটা স্থূল স্বাতন্ত্র্যবোধকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ব্রিটিশ আগমনের পরে যে-হিন্দুরা এতকাল আরবী ফার্সী শিক্ষা করে সুলতানী ও নবাবী দপ্তরে জীবিকা নির্বাহ করত তারাই আবার ইংরেজী শিক্ষা করে নতুন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকে এবং অচিরেই পরিণত হয় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রধান অবলম্বনে, কিন্তু একই স্তরের মুসলমানরা উক্ত সুযোগ গ্রহণে দ্বিধান্বিত থাকল,

ফলে তারা পেছিয়ে থাকল আধুনিকতার আলোক সন্ধানে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই—কিছু হিন্দু ইংরেজী শিক্ষা করে যেমন একদিকে ধর্মের ক্ষেত্রে মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তেমনই অন্যদিকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের থেকে-ও এবং জনসাধারণের থেকে এই বিচ্ছেদকেই রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধটিতে নির্ণয় করেছেন জাতীয় ব্যাধি বলে। এই অবস্থায় দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের স্বরূপ থাকল কী রকম? তা বোঝা যায় ব্রিটিশদের নিযুক্ত সিপাহী সমাজের উপকরণ বিশ্লেষণে, কেননা এই সিপাহীদের অধিকাংশই এসেছিল উল্লিখিত জনসাধারণের থেকে, এপ্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত স্যার জন লরেন্সের উক্তি স্মরণীয়, যিনি লক্ষ করেছিলেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সিপাহীদের মধ্যে গভীর ভ্রার্তত্ববোধ ও সমন্বিত সত্তা। পক্ষান্তরে ইংরেজী শিক্ষিত ও ইংরেজের সংস্রবে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায় গড়ে তুলতে থাকল নিজেদের সৌভাগ্য ও তাদের মানসেই প্রথম জাগল হিন্দু জাতির চেতনা যার উত্তরে অচিরে ভারতীয় মুসলমানরাও উদ্বুদ্ধ হলো পৃথক জাতির চেতনাতে এবং তারা বুঝল যে ইংরেজদের সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতীত ওই মুসলিম জাতির চেতনাকে প্রবল ও বিপুল হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমান্তরালে ও সমকক্ষ রূপে বিকশিত করে তোলা সম্ভব নয়। ইংরেজরা শুধু যে এরূপ একটা পরিস্থিতির প্রতীক্ষাতেই ছিল তা নয়, তারা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত রূপে এই পরিস্থিতিকে সুদীর্ঘ ও সুনিষ্ঠ প্রযত্নে গড়ে তুলেছিল, কেননা তারা হৃদয়ঙ্গম করেছিল, দেশবাসীর অগ্রসর সমাজকে পরস্পর বিরোধী দুটি শিবিরে বিভক্ত করতে না পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হবে। লক্ষণীয় যে দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তারাই স্বাতন্ত্র্যে, গৌরবে ও জাতীয় চেতনায় সর্বাগ্রে আক্রান্ত হলো যারা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সমাজে ভাগ্যবান, শ্রদ্ধেয় ও সম্ভ্রান্ত রূপে গণ্য, কায়িক শ্রমে যারা বিমুখ শুধু নয়, লজ্জিত ও বটে অর্থাৎ যারা কায়িক শ্রমকে মনে করে হীনতা-সূচক, নিজেদের স্তরে যারা বাইরে মিলিত হয়েও ভিতরে ছিল বিভক্ত, যারা ছিল আদর্শের প্রচারে মুখর ও নতুন নতুন পরিস্থিতির সুযোগ সন্ধানে তৎপর।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শুরু হবার আগেই ভারতীয় শিক্ষিত মানসে এ-ধারণা জন্মে গেছে যে ভারতবর্ষে হিন্দু জাতি আর মুসলমান জাতি দুটি পৃথক জাতি বাস করে এবং এই দুটি জাতির মধ্যে বৈপরীত্যই প্রধান। শিক্ষিত সমাজে উদ্ভূত এই ধারণার সমর্থনে ইংরেজরা কথায় ও লেখায় সক্রিয় হয়ে উঠল এবং শিক্ষিত ভারতীয়রা ভাবল যে যা ইংরেজ পণ্ডিতদের দ্বারা সমর্থিত

তা অকাট্য না হয়েই যায় না। যাকে শিক্ষিত সমাজ বলেছি তাকে সুবিধাভোগী ও সুযোগসন্ধানী শ্রেণীও বলা যায় আর সুবিধা ও সুযোগের অধিকাংশই চাকুরির তাৎপর্যে বিধৃত। উক্ত শ্রেণীর মধ্যে দুটো পৃথক জাতি সম্পর্কিত ধারণা জন্মানোর মূলে, চাকুরিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও কিছু বাস্তব কারণ ছিল, এবং সেই কারণগুলোর কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল'। তাঁর উক্তির ব্যঞ্জনা এই যে, সাধারণ ভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এক শ্রেণীর হিন্দুদের অপমান ও ঘৃণাসূচক আচরণ ও মনোভঙ্গি দু ধর্মাবলম্বীদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে রাখে, ইংরেজ সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়ে দু পক্ষের মধ্যে বিরোধের বিষ ঢুকিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু পাপের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, 'রাজপ্রজা', 'সমূহ', 'পরিচয়', 'কালান্তর', প্রভৃতি গ্রন্থে এই পাপের রূপও বর্ণনা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। মনে রাখা ভালো, কেমন করে ও কেন বিশেষত বঙ্গবিভাগের সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভদ্র-শ্রেণীর সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কৃষক-শ্রেণীর, মুষ্টিমেয়র সঙ্গে বৃহত্তরের বিভেদ প্রকটতর থেকে বিরোধে রূপান্তরিত হয় সে-সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষদর্শীর বা সমকালীন সাক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'ব্যাধি ও ও প্রতিকার' প্রবন্ধে যা বলেছেন তার কথা আগে বলেছি। এখানে তিনি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শীর্ষক প্রবন্ধে যা লিখেছেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধার করছি: 'ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তাহলে বড়োই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়।' একই অনুচ্ছেদ থেকে আর একটা উদ্ধৃতি তোলার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন। 'এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে—সেইখানেই যে ছিদ্র—ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ।, এর পরের অনুচ্ছেদে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, 'আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি. বিরুদ্ধে ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি ওর

যোগ দেয়নি। কিন্তু কেন দেয়নি।' এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। একই অনুচ্ছেদে—কৌতূহলী পাঠক 'কালান্তর' গ্রন্থটি থেকে তা পড়ে নেবেন। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে রবীন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারে মুসলিম সমাজের আচরণের কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেননি এবং বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে এর মূলে আছে হিন্দু সমাজ কর্তৃক সযত্নে ও সভয়ে লালিত দুর্মর পাপ। একই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দুসমাজের কোথায় কোন্ ছিদ্র, কোন্ পাপ আছে, অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই।'

বাংলায় বিভেদটা স্পষ্ট ভাবেই ছিল মূলত বাবু শ্রেণী ও চাষা শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ দ্বন্দ্বটা ছিল শ্রেণিগত—সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মুসলমান ও সংখ্যালঘু শ্রমজীবী হিন্দুর মধ্যে ধর্মাচরণের পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে স্বার্থের পার্থক্য ছিল নগণ্য বা অনুপস্থিত, পক্ষান্তরে ভদ্রলোক শ্রেণীর ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যটা শুধু ধর্মীয় প্রশ্নের সীমাবদ্ধ ছিল না, স্বার্থের প্রশ্নও সেখানে ছিল অবধারিত ভাবে প্রধান : ইংরেজী শিক্ষা সে-প্রশ্নকে মসৃণ তো করেই নি, বরং আরও কঠিন ও কর্কশ করে তোলে। যখন বঙ্গভঙ্গের কালে জাতীয়তাবাদী ভদ্রলোকশ্রেণী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সূত্রে কৃষক সমাজের দ্বারে উপস্থিত হয় তখন ওই ভদ্রলোক শ্রেণী প্রকৃতই কোন্ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কৃষকদের সংগঠনে ও পরিচালনায় উদ্যোগী হয় তা রবীন্দ্রনাথের একাধিক প্রবন্ধে ও চিঠি-পত্রে উন্মোচিত, তাঁর সে-সময়কার যন্ত্রণা ও হতাশা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সে সময়কার সাহিত্যে এবং এ-সাহিত্যের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখ্য কীর্তি হলো 'গোরা' যার কাহিনী বিকশিত হয়েছে ভদ্রশ্রেণীর হিন্দুসত্যের থেকে ভারতীয় লোকসত্যের পথে উত্তরণের সাধনায় আর পরবর্তীকালে তিনি যাকে 'মানুষের ধর্ম' বলে আবিষ্কার করেন তা হলো ওই ভারতীয় লোকসত্যেরই বিশ্বজনীন সংস্করণ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[মধ্যবিত্ত মানসিকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশক শরৎচন্দ্র—শরৎচন্দ্রের বক্তব্য ও ভাব-বিচার—সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ও রাজনৈতিক শরৎচন্দ্র—ব্রিটিশ স্বার্থের অভীষ্ট সিদ্ধকারী শরৎচন্দ্র—নবীন সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি।]

রবীন্দ্রনাথের জীবনে বা উপলব্ধিতে বা সত্য তা তাঁর মতো উচ্চস্তরের বা উৎকৃষ্ট চিত্রের ক্ষেত্রে সত্য। এখানে 'উৎকৃষ্ট চিত্তে'র কথা ভেবেচিন্তে প্রয়োগ করেছি. কেননা গান্ধী, জহরলাল বা সুভাষচন্দ্রের মতো সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তাধারাতেও হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন একটা আশু মীমাংসা সাধনের বিষয়। আবার এটাও দেখা যায় যে খুব বিখ্যাত উচ্চস্তরের মানুষের কাছে যা সত্য একেবারে সাধারণ লোকজীবনের স্তরেও তা সমান সত্য—অন্তত তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢোকাবার আগে ব্যাপক ভাবেই তা সত্য এবং সামগ্রিক ভাবে তা দেশীয় লোকসত্যের অন্তঃসারগত অঙ্গ ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত চিত্তের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রসঙ্গে সত্যের স্বরূপ অন্যরকম। মধ্যবিত্তের প্রথাসিদ্ধ স্তরে হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কের সত্য কী তার প্রতিফলন দেখা যাবে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যে। ভারতবর্ষে বিদেশী ধর্মের ও পরে বিদেশী রাজনীতির প্রবেশে উদ্ভূত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ঐতিহাসিক সমীক্ষায় বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পীর প্রসঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে উত্থাপন করা কেন? কারণ মধ্যবিত্তের আবেগ ও অধ্যাস, সংস্কার ও সমাজ শরৎচন্দ্রের রচনাতে অমোঘরূপে প্রতিবিম্বিত। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে যা বলেছেন তা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃতি সহযোগে বিবৃত হয়েছে। ওই একই বছরে একই বিষয়ে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য তাঁর-ই ভাষাতে উদ্ধার করি: 'বস্তুতঃ মুসলমান যদি বলে—হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে. প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে। বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সংকোচ মানে নাই।' এখানেই শরৎচন্দ্র ক্ষান্ত হননি, তিনি আরও বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান মিলন একটা গালভরা শব্দ। এ আকাশকুসুমের লোভে আত্মবঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই'

এখানে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো শরৎচন্দ্রের অকুণ্ঠ আপোসহীন সাম্প্রদায়িক চরিত্র, কিন্তু আরও তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তাঁর সাম্প্রদায়িক চরিত্রকেও ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক—হিন্দু ধর্ম ও সমাজের উদারতা প্রচার করে যারা নিজেদের প্রকৃত মনোবৃত্তিকে গোপন রাখে আর অন্যকে প্রতারণা করে, যারা নিজেরা ধর্মান্ধতায় ও কুসংস্কারে, অন্য ধর্মের প্রতি বিরাগে ও বিদ্বেষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অথচ অন্যকে পরমত-সহিষ্ণুতার বাণী শোনায় তাদের থেকে তিনি স্বচ্ছন্দে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন শুধু আন্তরিক আবেগ প্রকাশের নিরাভরণ অপকপটতায়। আমরা জানি একটা বিশেষ সমাজের, বাঙালী বর্ণ হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের, জীবন ও চিন্তাধারা শরৎচন্দ্রের কথাশিল্পে অনবদ্য রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানেও তিনি সেই একই সমাজের মনের কথাটাকে বিনা আড়ম্বরে, বিনা প্রচ্ছদে, সহজ ও সরল রূপে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোক বা বাবু বা শিক্ষিত শ্রেণীর মনের কথা হলেই তা সমগ্র দেশের সমগ্র জনসাধারণের মনের কথা হবে এমন ধারণা করা ভুল আর আজ যদি সেটা সমগ্র দেশবাসীর মনের কথা হয়েও থাকে তাহলেই যে তা ইতিহাসের সত্য হয়ে যাবে এটা ভাবাও ভুল। মনের কথা বা কারও বিশ্বাস দিয়ে ইতিহাসের সত্যাসত্য বিচার হয় না। ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা বিশ্বাস কতটুকু বা কতখানি সত্য, ইতিহাসের সত্য, এবং কতটুকু বা কতখানি তার সামগ্রিক যাথার্থ্য সেটা অবশ্যই বিচার সাপেক্ষ।

প্রথমেই বলা ভালো, শরৎচন্দ্রের উক্তির মধ্যে যেসব ঘটনার উল্লেখ আছে সেগুলো সত্য। কিন্তু ওইসব ঘটনায় কারা অংশ নিয়েছিল? তারা আসলে সৈন্যবাহিনী। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে সমস্ত সৈন্যবাহিনী যেরূপ আচরণ করেছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী সৈন্যবাহিনীও সেই একই রূপ আচরণ করেছিল। এখানে পেশা ও বৃত্তির প্রসঙ্গটাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। পেশা ও বৃত্তির বশে তারা যা করেছে তার জন্যে সমস্ত মুসলমানদের দায়ী করা কেন? একই রূপ আচরণ হিন্দু সৈন্য করেছে, খ্রীস্টান সৈন্যও করেছে, অন্যান্য সব ধর্মাবলম্বী সৈন্যরাই করেছে। তাই এখানে একমাত্র মুসলমানদের উল্লেখ সত্যের এক ক্ষুদ্র অংশের উল্লেখ, সত্যের বৃহৎ অংশকেই এখানে গোপন করা হয়েছে এবং তা না হলে বলতে হয় যে উদ্ধৃত বাক্য উচ্চারণকারী প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ।

দ্বিতীয়ত, যে মুসলমান ভারতবর্ষে রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করে লুণ্ঠনের সন্ত্রাস প্রথম জাগিয়েছিলেন সেই গজনীর মাহমুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজারা কী রকম ব্যবহার করেছিলেন, শুধু তাঁর সঙ্গে নয়—তাঁর বাবার সঙ্গেও, সে-ইতিহাস দ্বিতীয়

পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে এলিয়ট ও ডোসোন সম্পাদিত [illegible] 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিসটোরিয়ান্স' গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'মাহমুদ'স একসপেডিশন ইন ইণ্ডিয়া' শীর্ষক পরিশিষ্টটি জিজ্ঞাসু পাঠকদের অবশ্য পাঠ্য। এখানে শুধু এটুকু পুনরাবৃত্তি করাই যথেষ্ট যে মাহমুদের ভারতাভিযানের আগে তাঁর বাবা সবুক্তিগীনের আমলেই পাঞ্জাব, কালিঞ্জর প্রভৃতি রাজ্যের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী গজনী আক্রমণ করতে গিয়েছিল এবং অতঃপর আক্রান্ত সবুক্তিগীন তাদের ঠেলে নিয়ে এসেছিলেন পাঞ্জাব পর্যন্ত—এভাবেই গজনীর সৈন্যবাহিনী ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রথম প্রবেশ করে। একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে মাহমুদ প্রথমে পিতার রাজ্য আক্রমণকারীদের ও পিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক দের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ভারতাভিযান শুরু করেছিলেন। এটা ছিল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া—শুধু প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা এখানে অন্ধ সাম্প্রদায়িকতারই পরিচায়ক। এখানে একথাটাও মনে করিয়ে দিতে চাই যে পণ্ডিত, শিল্পী ও নারীর উপর হাত দেওয়ার ব্যাপারে মাহমুদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। বুঝুক না-বুঝুক ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকরা সাধারণভাবে ধর্মশাস্ত্রবিদ ও সংস্কৃতে পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা করত, এটা লক্ষণীয় ঘটনা যে যারা জিজিয়া কর প্রচলন রেখেছিল তাদের মধ্যে ফিরোজ শাহ তুঘলক ও ঔরঙ্গজেব ব্যতীত অন্যান্য সুলতান বা বাদশাহ জিজিয়া কর দেওয়ার দায় থেকে ধর্ম-ও শাস্ত্র চর্চাকারী রূপে ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়েছিল।

তৃতীয়ত, ধর্মস্থান ধ্বংস করা আর পরধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচারের প্রশ্ন। প্রথম পরিচ্ছেদেই বলেছি, এ ব্যাপারে বৈদিক আর্যরা খুবই তৎপর ছিল। এবং ভারতবর্ষের প্রাচীনতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসে তারা যতখানি সাফল্য লাভ করে তা পরবর্তী কোনও অভিযাত্রী বাহিনী করেনি। পরবর্তীকালেও বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস ও লুঠ করেছে হিন্দুরা। তবে প্রচলিত অর্থে যাদের হিন্দু বলে অভিহিত করছি তাদের মধ্যে ইতিহাস বা ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ধারা ছিল না, সেজন্যে তাদের সমস্ত কীর্তিকাণ্ডের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈনদের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের যে অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে তার পরিমাণ নগণ্য নয়, পরবর্তীকালে অবশ্য হিন্দুরা অত্যাচারের ধারা পালটায়—শূলে হত্যা ও দৈহিক নির্যাতন না করে বহুতর পদ্ধতিতে অপমান ও মানসিক পীড়নের ধারা নেয়—এবং নিষ্ঠুরতার দিক থেকে সেগুলোও অতুলনীয়। আর হিন্দুরাই হিন্দুদের ধর্মস্থান ধ্বংস বা লুঠ করছে এরকম দৃষ্টান্তও কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের কীর্তিকলাপে প্রচুর। অন্যান্য স্থানের হিন্দু রাজারা যখন

অন্য রাজত্ব জয় করত তখন তারাও একাজ করত বলে মনে হয় এবং এর পরোক্ষ প্রমাণ হলো দুর্গের মতো সুরক্ষিত করে নির্মিত দক্ষিণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দির। এবিষয়েও আগে আলোচনা করেছি। মন্দির ধ্বংস ও নারীর সতীত্ব হানির দৃষ্টান্তের জন্যে বেশি দূরে বা বেশি দিন আগের প্রসঙ্গে যেতে হবে না, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাদের বাংলা অভিযানগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আদর্শ হিন্দু রাজ্যের সৈন্যরা প্রধানত রঘুজী ভোঁসলে ও ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে এবং একাধিকবার স্বয়ং পেশোয়া বালাজী বাজী রাওয়ের পরিচালনায় বাংলায় আসত নিছক অস্ত্রবলে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করতে—এটাকে নবাব আলীবর্দী খানের উপর হামলা বলে যদি না উপেক্ষার চেষ্টা করি তাহলেও দেশের সাধারণ মানুষদের উপর তাদের অকথ্য অত্যাচারকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলবে না। অধ্যাপক কালীকিঙ্কর দত্ত 'আলীবর্দী অ্যাণ্ড হিজ টাইমস' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ওই মারাঠা সৈন্যরা জগৎশেঠ, নওয়াজিস মুহম্মদ প্রমুখ ধনবানদের সুরক্ষিত প্রাসাদগুলি লুণ্ঠনের চেষ্টা করত না, যেসব স্থানে কোনরূপ বাধার সম্ভাবনা ছিল না সেসব স্থানেই অর্থাৎ সাধারণ মানুষের উপরেই তারা হামলা করত। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি গঙ্গারামের লেখা 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' প্রকাশিত হয়—তখন অবশ্য শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে সাহিত্যচর্চা করছিলেন—কিন্তু 'মহারাষ্ট্র-পুরাণে'র পাঠকমাত্রেরই মনে হবে যে মারাঠার সরকারী সৈন্যবাহিনী, যাদের বারগীর বলা হতো, মাত্র দশ বছরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে যে-হামলা চালিয়েছে তার তুল্য কোনও হামলা বাংলার সমগ্র ইতিহাসে আর হয়নি। এমন কোনও অপরাধের কথা কল্পনা করা কঠিন যা মারাঠা রাজ্যের এই সরকারী সৈন্যরা বাংলার সাধারণ গ্রাম-জীবনের উপর করেনি। মন্দির ধ্বংস-ও-লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ-ও-লুণ্ঠন, গ্রামে গ্রামে অগ্নি-সংযোগ এবং হত্যার বহু বিচিত্র নৃশংস পদ্ধতি। মনে রাখা ভালো যে ধর্মের দিক থেকে ধরলে এরা হিন্দু-ই ছিল। একথা ভাবাও ভুল হবে যে শিবাজীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই মরাঠার সরকারী সৈন্যবাহিনী বর্বরতার প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর প্রবৃত্তি-প্রবণতা সম্বন্ধে শিবাজী ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে স্ত্রী-লোক ও ব্রাহ্মণদের গায়ে হাত দেওয়া এবং ধন-রত্ন লুণ্ঠন সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ জারি করেছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে স্বয়ং যদুনাথ সরকার 'শিবাজী অ্যাণ্ড হিজ টাইমস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'So much for Shivaji's regulations in theory. But in practice they were often violated except when he was personally

present.' শিবাজীর জীবদ্দশাতে শুধু তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই যারা ওইরকম আচরণ করত তারা তাঁর মৃত্যুর পরে কী রকম আচরণ করত তা কল্পনা করা কঠিন নয়। মাত্র দশ বছরে এই সৈন্যবাহিনী বাংলায় পাশবিকতার যে-দৃষ্টান্ত রেখে গেছে তার তুলনা সমগ্র ইতিহাসেই দুর্লভ। তারা আদর্শ হিন্দু রাজ্যের গৈরিক পতাকা বহন করত বটে, কিন্তু ধর্ম দিয়ে তাদের পরিচয় বিচার করা ভুল হবে, তাদের আচরণের বিচার করা হবে তাদের পেশা বা বৃত্তির তৎকালীন আচরণ বিধি অনুসারে।

চতুর্থত, অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে আঘাত ও অপমান করার বিষয়ে যখন স্বয়ং শরৎচন্দ্র সাধারণ ভাবে মুসলিমদের অভিযুক্ত করেন তখন ব্যাপারটা শুধু বিস্মিত করে না, বিমূঢ়ও করে। কারণ এই বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু সমাজের উদ্ভাবনী প্রতিভা যেরকম বিকাশ লাভ করেছে তেমনটি আর কোনও ক্ষেত্রে করেনি—দেহ স্পর্শ না করে শুধুমাত্র আচার-আচরণ দিয়ে কেমন করে অন্য ধর্মাবলম্বীর হৃদয় চূর্ণ করা যায় তা বোধ করি পৃথিবীর সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই এই বর্ণহিন্দুদের পদতলে বসে শিক্ষা করতে পারে। শুধু মুসলিম বা অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি নয়, একই ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নিম্নবর্ণ ও শ্রমজীবীদের প্রতি তাদের আচার আচরণ একই রকম অমানুষিকতার পরিচায়ক এবং এজন্যেই অনুন্নত শ্রেণী পরবর্তীকালে ডক্টর আমবেদকারের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ শুরু করে—বৌদ্ধধর্মের প্রতি এই শ্রেণীর বিশেষ কোনও আগ্রহ বা আধ্যাত্মিক আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু যে-ধর্ম আঘাত ও অপমান ছাড়া কিছু দেয়নি সেই ধর্মের থেকে তারা শুধু দূরে সরে যেতে চেয়েছে। প্রকৃত-পক্ষে শরৎচন্দ্র যেকালে ওই ভাষণ দেন সেই একই কালে বর্ণহিন্দুদের আঘাতে ও অপমানে জর্জরিত অনুন্নত শ্রেণীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও দুঃখ ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন এক জটিলতা সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। আর বাংলায় বর্ণহিন্দু সমাজের স্বভাব চরিত্রকে স্বয়ং শরৎচন্দ্র-ই 'পল্লীসমাজ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ' প্রভৃতি রচনায় যেভাবে প্রকাশ করেছেন তারপর তাঁরই মুখে একই অপরাধে মুসলমানকে অভিযুক্ত শুনে কৌতুক বোধ হয়। কিন্তু আবার বলি, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাঙালী সমাজ বলতে যা বোঝায় তার প্রকৃত মনোবৃত্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনে শরৎচন্দ্র অপরাজেয় এবং এখানেও তিনি তাঁর অকপট প্রতিভারই সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এরই পাশাপাশি দেখা যাক 'পল্লীসমাজ'-র হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজের চিত্র, দেখা যাক 'মহেশ' গল্পে বর্ণিত কৃষক ও জমিদারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ, দেখা

যাক 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে ফকিরসাহেবের চরিত্র। বিশেষ করে যে তিনটি দৃষ্টান্তের কথা বললাম সেগুলোর থেকে এই সরল সিদ্ধান্তে, এবং অবশ্যই সরল ও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে, অনায়াসে উপনীত হওয়া যায় যে মুসলমান সমাজে ও মুসলমান চরিত্রে মহত্তর উপকরণের পরিমাণ হিন্দু সমাজ ও হিন্দু চরিত্রের থেকে বেশি এবং 'পল্লীসমাজে'র বেণী ঘোষাল, 'মহেশে'র বাবুমশায়-তর্করত্ন প্রভৃতির সম্প্রদায় দুর্জন ও শোষক, তারা কায়েমী স্বার্থের রক্ষক, পক্ষান্তরে আকবর, গফুর প্রভৃতির সম্প্রদায় অসহায় ও নিপীড়িত, তারা কায়েমী স্বার্থের শিকার। যে কোনও সরল সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অনিবার্য ভাবেই ভ্রান্ত, বিশেষত সৃজনমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু ভ্রান্ত হলেও এরকম সিদ্ধান্তের কিছু অবকাশ তো শরৎচন্দ্র নিজেই রেখে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। অবশ্য 'শ্রীকান্ত'র প্রথম পর্বের শুরুতে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে সেদিন বাঙালী ও মুসলমান ছেলেদের ফুটবল খেলা কেন্দ্র করে একটা অশান্তি দেখা দিয়েছিল —এখানে 'বাঙালী' ও 'মুসলমান' শব্দ দুটো এমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলে সে আর বাঙালী বলে পরিচিত হতে পারে না, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে তিনি বাঙালী অথবা মুসলমান ছেলে হিসেবে কোনও চরিত্র উপস্থাপন করেননি। যেখানে চরিত্র সৃষ্টির প্রশ্ন এসেছে সেখানে তিনি ধর্মের জন্যে কোনও চরিত্রকে হীন করে আঁকেননি। এখানেই কথাশিল্পী এবং রাজনীতিবিদের মধ্যে মৌল পার্থক্য।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মুসলমান প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে এই প্রশ্নের স্বরূপকে উন্মোচিত করে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং রাজনীতিবিদ শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা রয়েছে, কারণ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যেখানে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত সেখানে রাজনীতিবিদ শরৎচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাতে রুদ্ধ। তদুপরি আরও দেখা যায় যে, আকবর বা গফুর একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষই শুধু নয়, অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাসেও তারা একই স্তরভুক্ত—রাজনীতিবিদ শরৎচন্দ্র যে সত্য দেখতে পাননি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সেই শ্রেণী-সমস্যাকে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। এটাও লক্ষণীয় যে, যেসব রচনাবলী তাঁকে কথাশিল্পীর আসনে বসিয়েছে সেসব রচনাগুলো তিনি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে প্রত্যক্ষ-ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগেই লিখেছেন। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে সাম্প্রদায়িকতা তাঁর শিল্পী সত্তাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলে। তিনি উচ্চস্তরের শিল্পী বটে, কিন্তু উচ্চস্তরের রাজনীতিবিদ নন।

এই পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে তাঁর যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা তাঁর সাহিত্যিক সত্তার অভিব্যক্তি নয়, প্রকৃষ্টরূপে ওই উদ্ধৃতি তাঁর রাজনৈতিক সত্তার অভিব্যক্তি। উল্লিখিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে ঐতিহাসিক সত্যের সমর্থন নেই। এখানে ঐতিহাসিক সত্য বলতে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ সত্যকেই বুঝতে হবে অর্থাৎ যে সত্যের কোনও অংশ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে গোপন করা হয়নি অথবা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'-র মতো যে-সত্যকে বিকৃত করা হয়নি। অবশ্য এটা হওয়াও সম্ভব যে ঐতিহাসিক সত্যের সমর্থনশূন্য শরৎচন্দ্রের উক্তি ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত, আবার এটাও হতে পারে যে তা ছিল একান্তভাবেই তৎকালীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রভাবিত কিংবা নিতান্তই প্রচলিত মধ্যবিত্ত আবেগ সঞ্জাত অথবা তিনটেই অংশত সম্ভব হতে পারে এবং এর ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই রকম—যাদের আচরণ দিয়ে কোনও ধর্মেরই বিচার হতে পারে না তাদের আচরণ নিয়ে তিনি একটা ধর্মের বিচার করেছেন; ক্রিয়া দিয়ে নয়, প্রতিক্রিয়া দিয়ে ইতিহাসের বিচার করেছেন, তাঁর কৃত প্রতিক্রিয়ার বিচারেও ধর্ম, বিদ্যা ও শিল্পের সাধকদের প্রতি যে মনোভাব তথাকথিত আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল তার কথা অনুক্ত থেকেছে; যে কর্মকাণ্ড একদা বৈদিক আর্যরা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে সেই একই রকম কর্মকাণ্ডের জন্য শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই অভিযুক্ত হয়েছে এবং এটা পক্ষ অনুসারে বিচারের দুরকম মানদণ্ড প্রয়োগের জলন্ত নিদর্শন।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অভিযুক্ত করার পরে শরৎচন্দ্র আরও বলেছেন যে 'হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ'। এ জাতীয় ঘোষণা ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও জনতাত্ত্বিক প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকেই যে কতখানি ভ্রান্ত তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অজ্ঞতা বা আবেগের কিংবা একসঙ্গে দুটোরই বশবর্তী হয়ে এখানে শরৎচন্দ্র সেই ভুল কথাটাই উচ্চারণ করেছেন যেটা ব্রিটিশ শাসকরা বিশেষত বেক ও আর্চবোল্ডের ভাবধারায় পুষ্ট ব্রিটিশরা এদেশের মানুষকে দিয়ে বলাতে চাইছিল। জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক শরৎচন্দ্র প্রকৃষ্টরূপে ব্রিটিশ-স্বার্থের অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছেন। ও-ই কথা বলার সময় তিনি একটুও ভেবে দেখেননি যে তাঁর কথাটাকে সত্য বলে ধরলে শুধু মুসলিমদের নয়, ভারতীয়ের সংজ্ঞা থেকে শিখ ধর্মাবলম্বী পাঞ্জাবীদের এক বৃহৎ অংশকে, খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী দক্ষিণ ভারতীয়দের আর পূর্ব ভারতের উপজাতিদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে, জরথুস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী পারসিকদের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশকে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের ভারতব্যাপী এক প্রভাবশালী অংশকে এবং এভাবে

আরও বহু অংশকে বাদ দিতে হয়। তাছাড়া গান্ধীজী কর্তৃক হরিজন নামে অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তর অর্থে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত নিম্নবর্ণীয়রাও আর হিন্দু বলে পরিচিত হতে চাইছিল না, তারা হিন্দু মণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠছিল এবং সত্য সত্যই তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে; তার মানে শরৎচন্দ্রের ধারণা অনুসারে গান্ধীজীর হরিজনরাও ভারতীয়ের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যায়। হিন্দু আর ভারতীয়—এই দুটি শব্দকে শরৎচন্দ্র সমার্থক মনে করেছিলেন বলে সন্দেহ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি শব্দকে সমার্থক মনে করার মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকে কায়েম করার উপায় বা পথ আবিষ্কার করেছিল। উক্ত পথেই সম্পাদিত হয় ১৯১৯-এর মণ্টেগু-চেমসফোর্ড অ্যাক্ট। দশ বছর আগে মর্লে-মিণ্টোর আমলে যে আইন প্রণীত হয় মণ্টেগু-চেমসফোর্ড অ্যাক্ট তারই সম্প্রসারণ।

মণ্টেগু চেমসফোর্ডের প্রস্তাব ও ব্যবস্থা, তার ইতিবৃত্ত ও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তার দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের পাশাপাশি আর একজন সাহিত্যিকের প্রসঙ্গে এখানে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করি, কেননা এই সাহিত্যিক বয়সে নবীন এবং তাঁর উক্তির মধ্যে অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ দেখি।

এই সাহিত্যিকের নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'কালি-কলম' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক রূপে 'অসংলগ্ন' বিভাগটি তিনি স্বয়ং লিখতেন শ্রীকৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্মনামে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি ওই ১৩৩৩ বঙ্গাব্দেই মাঘ সংখ্যাতে লেখেন, 'দেশের নেতা উন্মাদের অস্ত্রাঘাতে শহীদের স্বর্গে গেছেন। এই ভয়ঙ্কর হত্যার সংবাদে সারা ভারতবর্ষের গায়ে কাঁটা দিয়েছে কিন্তু খবরের কাগজে মারাত্মক ছাপার ভুল দেখে বিস্মিত হলাম। পড়লাম—মুসলমান হত্যাকারীর দ্বারা হিন্দু নেতা নিহত। তারপর মনে হল এ ছাপার ভুল নয়—এ ভুল সম্পাদকের। শেষে বুঝলাম—এ ভ্রম সর্বসাধারণের এবং এই ভুলই সমস্ত সর্বনাশের মূল। অকারণ বিশেষণের বিষে আমরা জাতিকে বিপন্ন করে তুলেছি।' তারপরে লিখেছেন, 'পুলিশ কোর্টের সংবাদে আমরা কখন লিখি না কর্তাভজা বৈষ্ণব ভিখারীর দ্বারা হনুমান-ভক্ত দরোয়ানের ঘটি চুরি। ঘটি চুরি সামান্য ব্যাপার এবং কর্তাভজা বৈষ্ণব ও হনুমান ভক্ত দরোয়ানের সংখ্যা নগণ্য বলেই বোধহয় লিখি না। অথবা সত্যই আমাদের এ জ্ঞানটুকু হয়ত থাকে

যে, ঘটি চুরির কাহিনীতে বৈষ্ণব ধর্ম ও হনুমান-ভক্তির কোন সংস্রব নেই। কিন্তু আমরা ফরমাসী বড় হরপে সংবাদ পত্রের সমস্ত ললাট জুড়ে লিখি—মুসলমান গুণ্ডার ছুরিতে হিন্দু কুলির মৃত্যু।'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই রচনাটি এমন সরল ভাবে এত গভীর সত্যকে অমোঘ রূপে প্রকাশ করেছে যে সমস্ত রচনাটিই আগাগোড়া উদ্ধার করার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন। এখানে একই রচনার থেকে আর দুটি একটি উদ্ধৃতি দিই: 'কথা নিয়ে যাদের কারবার কথার শক্তি সম্বন্ধে তারাই সবচেয়ে অজ্ঞ—এই বিশৃঙ্খল যুগের এইটিই একটি বিশেষত্ব। বেপরোয়া ভাবে বিশেষণ ব্যবহার করতে আজ কোথাও বাধে না। যে গুণ্ডা মানুষ খুন করে সেও সংবাদপত্রের দৌলতে ধর্মের শিরোপা পেয়ে হিন্দু বা মুসলমান হয়ে ধন্য হয়। যে খুনে, সে যে শুধু খুনে—এই কথা ভাববার অবসর আমাদের নেই। আমরা বিশেষণ প্রয়োগ করি। এবং সেই হেলায় ছড়ানো বিশেষণকে কেন্দ্র করে মানুষের অন্তরের যে পশু এখনও মরেনি আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় হিংস্র নখর শানিয়ে সে শক্তি সঞ্চয় করে। মানুষের অন্তরের হিংস্র পশু এখনও মরেনি এ কথা সত্য—কিন্তু আমাদের নির্বোধ ভাবে নিক্ষিপ্ত বাক্যের আশ্রয়ে সে আপনাকে সংগ্রহ করবার ছুতো পায় নাকি? দাঙ্গাকারীর দাঙ্গাকে নামের বিশেষণ দিয়ে আমরা বিস্তৃত হবার পথ করে দিই। গুণ্ডাকে হিন্দু বা মুসলমান বলে আমরা হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়-ভুক্ত যে কোন ব্যক্তির সুপ্ত গুণ্ডামির প্রবৃত্তিকে জাগ্রত হবার সুযোগ দিই।' এই প্রবন্ধটিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখিয়েছেন যে দুর্বৃত্তরা, যারা ঘৃণ্য, সর্বতো রূপে আমাদের ধিক্কারের যোগ্য, তারা কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান পরিচয়ের অধিকারী নয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির সুযোগ নিয়ে তারা ধার্মিকের ছদ্মবেশে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে।

একই কালের দুজন সাহিত্যিক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র—একজন প্রতিষ্ঠিত ও অপরজন উদীয়মান—একই প্রসঙ্গে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারায় যে-পরিচয় দিয়েছেন তা লক্ষণীয়। এখানে বোধহয় 'চিন্তাধারা' শব্দটির প্রয়োগ যথাযথ হলো না। অগ্রজের কাছ থেকে সত্যের প্রতি অভিনিবেশ, তথা উত্তেজনা ও ভাবপ্রবণতার আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি আশা করি; কিন্তু এখানে ভারসাম্যবোধ, বিচক্ষণতা ও সত্যান্বেষণ-বৃত্তির প্রকাশ অনুজের মধ্যেই দেখতে পাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধির নামে যে-আন্দোলন শুরু করলেন তার উল্লেখ ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের বিশ্লেষণ প্রেমেন্দ্র মিত্র করেছেন তাঁর 'মিছিল' নামক উপন্যাসে। এই উপন্যাসের তথাকথিত

বিপ্লবীদের জীবনের বাস্তবানুগ আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে এবং সেই সূত্রেই শুদ্ধি আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে—এখানেও প্রেমেন্দ্র মিত্রর সাহিত্যিক দৃষ্টি ভ্রান্ত আদর্শ বা ভাবালুতার আবরণ সরিয়ে অপ্রিয় সত্যকে উন্মোচন করেছে অব্যর্থ ভাবে। কিন্তু তৎকালীন মধ্যবিত্ত মানসিকতার সাহিত্যিক প্রতিফলন নিয়ে বিশদতর আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, সুতরাং ১৯১৯ এর পরে হিন্দু ও মুসলমান প্রশ্ন কী করে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে সেই প্রসঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[কংগ্রেস-লীগের চুক্তি—মণ্টফোর্ড রিপোর্ট ও বিভেদের বিস্তার—সাধারণ মানুষের জাগরণ—অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার—সাইমন কমিশন—সর্বদলীয় সম্মেলন—হিন্দু নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি—মুসলিম নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি—শিখলীগের উৎপত্তি ও শিখ নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি—অনুন্নত শ্রেণীর জাগরণ ও অনুন্নত শ্রেণীর নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি—প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স—সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ—তৃতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স ও শ্বেতপত্র—১৯৩৫-এর আইন।]

প্রথম দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বায়ত্ত শাসনের পরিবর্তে স্বরাজ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজী স্বরাজের অর্থ ব্যাখ্যা করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর স্বায়ত্ত শাসন। তখন থেকে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ অধিবেশন পর্যন্ত অধিকতর দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত শাসন-ই ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য। এদিকে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে লখনৌয়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়, লীগের লক্ষ্য হলো ভারতবর্ষের উপযুক্ত স্বায়ত্ত শাসন। এখন থেকে কংগ্রেস আর মুসলীম লীগ উভয় দলেরই লক্ষ্য হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্ত শাসন অর্জন করা। বালগঙ্গাধর টিলক এবং মহম্মদ আলী জিন্না উপলব্ধি করলেন যে দুপক্ষের লক্ষ্যই যখন এক তখন দুপক্ষের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যে একটা সমঝোতা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজন বোধ থেকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে লখনৌয়ে এক চুক্তি সম্পাদিত হলো।

হিন্দু গৌরব, হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দু দেশ প্রভৃতি শুনে শুনে জিন্নার মতো প্রগতিশীল নেতাদের মনেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে ভীতি বা শঙ্কা জেগেছিল। আর টিলকের মনে বদ্ধমূল সংস্কার ছিল যে ধর্ম-ই হলো জাতি গঠনের ভিত্তি সুতরাং হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতি। জিন্নার ভীতি বা শঙ্কা আর টিলকের সংস্কার বা বিশ্বাসের ফলে লখনৌ চুক্তি প্রভাব ও সংখ্যা অনুসারে পৃথক নির্বাচনের নীতিকে গ্রহণ করল। মনে রাখা ভালো, হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলিম সমাজের সাযুজ্য সন্ধান করা লখনৌ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল স্বায়ত্ত শাসনের দাবিকে দুটি রাজনৈতিক সংগঠনের

পারস্পরিক সমর্থনে ও সহযোগিতাতে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করে তোলা। গান্ধীজী এই চুক্তিকে বর্ণনা করেছেন, 'ক্ষমতার জন্য শিক্ষিত ও বিত্তবান হিন্দুদের সঙ্গে শিক্ষিত ও বিত্তবান মুসলিমদের চুক্তি।' প্রকৃত পক্ষে সেই পর্যায়ে ভারতীয় নেতারা যেরকম স্বায়ত্ত শাসন দাবি করছিলেন তাতে দরিদ্র জনসাধারণের কোন ভূমিকার কথা কল্পনা করা হয়নি, সেই স্বায়ত্ত শাসনে শুধু ভারতবর্ষের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী-ই লাভবান হতো।

যা হোক, স্বায়ত্ত শাসনের এই ক্রমবর্ধমান দাবিকে ব্রিটিশ সরকার অগ্রাহ্য করল না। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসচিব মিস্টার মণ্টেগু এবং গভর্ণর-জেনারল লর্ড চেমসফোর্ড সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন। ১৯১৮র ৮ই জুলাই মণ্টেগু চেমসফোর্ডের যৌথ প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো মণ্টফোর্ড রিপোর্ট নামে। এতে বলা হয়, স্থানীয় পর্ষদ ও সমিতিগুলোকে যথাসম্ভব বহিঃপ্রভাবমুক্ত ও জনপ্রিয় করা হবে ; প্রাদেশিক স্তরে আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৃহত্তর স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দেওয়া হবে ; কিন্তু কেন্দ্রীয় ভারতসরকার সম্পূর্ণত দায়ী থাকবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে। লক্ষণীয় এই যে রিপোর্টটিতে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে পৃথক নির্বাচন নীতি স্বীকৃত হওয়ার দরুন নানা স্থানে উদ্ভূত বিভেদমূলক সাম্প্রদায়িক প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হয় এবং এটাও বলা হয় যে পৃথকীকরণের ভিত্তি ইতিহাস-সম্মত নয়। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সম্পন্ন লখনৌ চুক্তিতে পৃথক নির্বাচনের নীতি স্বীকৃত হয়েছে এই যুক্তিতে মণ্টফোর্ড রিপোর্ট পৃথক নির্বাচন প্রথা সুপারিশ করে।

লখনৌ চুক্তির ভিত্তিতে না হয় মণ্টফোর্ড রিপোর্টে হিন্দু মুসলিমের পৃথক নির্বাচন প্রথার সুপারিশ করা হয়, কিন্তু শিখদেরও পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় কোন্ ভিত্তিতে? শিখরা সৈন্য বাহিনীতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সামরিক জাতি হিসেবে তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রাপ্য—এই যুক্তিতে মণ্টফোর্ড রিপোর্ট শিখেদরও পৃথক নির্বাচনের অধিকার সুপারিশ করে।

মণ্টফোর্ড আইন কার্যকর করার জন্যে গঠিত হয় ফাংশনস কমিটি। এই কমিটি শুধু হিন্দু, মুসলিম ও শিখদের পৃথক পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করার ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট হলো না, ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদকে তা আরও বিস্তৃত করতে চাইল—এবং এই উদ্দেশ্যে উক্ত কমিটি ইয়োরোপীয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ন আর ভারতীয় খ্রীস্টানদেরও পৃথক নির্বাচনের অধিকার দান করল।

শুধু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতেই নয়, অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতেও পৃথক

নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলো—এভাবে দেশীয় ভূস্বামীদের শ্রেণী আর দেশীয় বণিকদের শ্রেণীর জন্যেও পৃথক পৃথক ভাবে বিশেষ কেন্দ্র সৃষ্টি করা হলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এসময় ব্রিটিশ রাজনীতি স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার নামে বহু রকম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও বৈষয়িক স্বার্থ জাগিয়ে তুলে সামগ্রিক ভারতীয় স্বার্থকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেওয়ার কৌশল্ অবলম্বন করেছিল। এইসব বিভেদমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও ১৯১৯-এর অমৃতসর অধিবেশনে কংগ্রেস ঘোষণা করল যে 'so as to secure the earliest establishment of responsible government' আইনটিকে কংগ্রেস স্বীকার করে নেবে। প্রকাশ থাকে যে স্বায়ত্ত শাসন লাভের আশাতে কংগ্রেসের এই সহযোগিতামূলক মনোভাব গঠনের পেছনে গান্ধীজীর বিশেষ অবদান ছিল।

গান্ধীজী তখন ভারতবর্ষের উদীয়মান নেতা। প্রথম দিকে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রৌলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের পরে ইংরেজদের মনোভাব দেখে তিনি ব্রিটিশের সহযোগী থেকে ব্রিটিশের বিরোধীতে রূপান্তরিত হন। ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্যে তাঁর প্রথম কর্মসূচী হলো অসহযোগ আন্দোলনের জন্যে আহ্বান। ইংরেজদের সঙ্গে কোনও সুরেই কোনও রকম সহযোগিতা করা হবে না ; এমনকি তাদের রচিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাদের চাকুরি করার নামেও—তাদের সাহায্য করা হবে না ; ব্রিটিশদের আইনবলে গঠিত প্রশাসনে অংশ নেওয়ার জন্যে তাদের কাউনসিলে প্রবেশ করা-ও হবে না – এ-ই হলো অসহযোগ আন্দোলনের সরল উদ্দেশ্য। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে কতখানি যুক্তি ছিল তা বলা মুশকিল, কিন্তু নবীন নেতারা তাঁর কর্মসূচীর অভিনবত্বে রোমাঞ্চিত হলেন। জহরলাল নেহেরু 'অটোবায়োগ্রাফি'-তে স্বীকার করেছেন, 'we did not quite know what to make of it, but we were thrilled.' সেই রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দেশে—শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, দূর গ্রামাঞ্চলেও, শুধু শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্তদের মধ্যে নয়, কলকারখানার শ্রমিক থেকে শুরু করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যেও, শুধু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশ সরকার কায়েম রাখতে যে জমিদার-তন্ত্র-ও-বণিকমণ্ডল সাহায্য করছে তাদের বিরুদ্ধেও।

এখানে অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস রচনার অবকাশ নেই। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই প্রথম একটা আন্দোলন গড়ে উঠল

যা সমস্ত দেশটার সমস্ত স্তরের মানুষকে স্পর্শ করল, যা ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দূরতম গ্রামের নিম্নতম মানুষটিকেও সচকিত করে তুলল, যা প্রথমবার অশিক্ষিত ও বিদেশী শাসন সম্বন্ধে অচেতন তথা রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন মানুষকেও কোন-না-কোন ভাবে আন্দোলিত করল। এই প্রবল জন-জাগরণের প্রকাশ নানা দিকে নানা ভাবে হলো। উদাহরণ হিসেবে তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট—রায়-বেরিলী ও ফৈজাবাদে যখন অবৈধ সেস বা স্থানীয় কর প্রদান বন্ধ করা হলো তখন সেখানকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে জমিদার-পুলিশ পক্ষের সংঘর্ষ; ছোটনাগপুরে তনা ভগত আন্দোলনের আহ্বানে সরকারী কর প্রদান বন্ধ করা নিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে জমিদার-পুলিশ পক্ষের সংঘর্ষ; ওড়িশাতে কণিকা রাজ্যের প্রজাদের সঙ্গে আবওয়াব কর প্রদান বন্ধ করা নিয়ে জমিদার-পুলিশ পক্ষের সংঘর্ষ।

সাধারণ মানুষের জাগরণের আর একটি ফল হলো এই যে তারা জানল, অন্যায় অন্যায়, যে-ই অন্যায়কারী হোক না কেন, অন্যায়কারীকে বাধা দিতে হবে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের চাপে অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে হবে। এই বোধ থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের যে অংশ গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তারা খিলাফৎ আন্দোলনের শামিল হলো। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দেওয়ার অপরাধে তুরস্কের খলিফাকে ইংরেজরা পদচ্যুত করে এবং খলিফার প্রতি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ-মূলক ভারতীয় আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত। খিলাফৎ আন্দোলন সর্বতোরূপে মুসলিম আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আন্দোলন বলে গান্ধীজী মনে করেছিলেন, তাই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে তিনি লিখলেন 'it is my duty to help him (Mohamedan) in his hour of peril to the best of my ability, if his cause commends itself to me as just.' স্পষ্টতই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার নীতি অসহযোগ আন্দোলনের গতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামের আর একটি দৃষ্টান্ত হলো পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে আকালি আন্দোলন। ব্রিটিশ সরকারের প্রশ্রয়ে শিখ গুরুদ্বার-গুলো হয়ে উঠেছিল মোহন্তদের দুর্নীতি ও ব্যাভিচারের কেন্দ্র। গুরুদ্বারে মোহন্তদের আচার ও ক্ষমতাকে সংযত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আকালি বলে পরিচিত রক্ষণশীল শিখরা ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে গুরুদ্বার প্রবন্ধক নামে একটি সমিতি গঠন করে। অনেকগুলো গুরুদ্বারের কর্তৃপক্ষ মন্দির পরিচালনার অধিকার

বিনা বাধাতে প্রবন্ধক সমিতির হাতে অর্পণ করে, কোথাও কোথাও প্রবন্ধক সমিতির সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধ সংঘর্ষের রূপ্ নেয়, কিন্তু প্রবন্ধক সমিতির সঙ্গে কর্তৃপক্ষের এই বিরোধ চরম নৃশংসতার আকার লাভ করে নানকানা গুরুদ্বারে। প্রথমবার অল্প সংখ্যক আকালি নানকানা গুরুদ্বারে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়—অতঃপর দেড় শ আকালির একটি দল গুরুদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হলো, গুরুদ্বারের বিশাল দ্বার খুলে গেল, দলটি ভিতরে প্রবেশ করল, পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল দ্বার। ওই দেড় শ জন আকালি আর ফিরে আসেনি। ভস্মবিশেষ এবং কিছু খণ্ড খণ্ড মাংস থেকে অনুমান করা হয় যে ওই হতভাগ্য সংস্কারকদের হত্যা করে দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাঠ ও কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দুষ্কর্মের চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা হয়। একই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটেছিল বলে একে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাই বলে ধর্মীয় প্রসঙ্গে ঘটনার নৃশংসতা ও বীভৎসতা উপেক্ষণীয় নয়। গুরুকাবাগে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত পুলিশরা নিযুক্ত হলো মন্দিরে প্রবেশে উদ্যত শিখদের বাধা দেওয়ার কাজে—একদিকে ইংরেজ পুলিশরা বেপরোয়া প্রহারে স্বেচ্ছাসেবকদের অচৈতন্য করে ফেলছে আর অন্যদিকে সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হতে হতে স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে চলছে—এই অভূতপূর্ব দৃশ্যের প্রসঙ্গে দীনবন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ লিখেছেন, 'I could not help thinking of the shadow of the cross.'

অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িতের সংগ্রামের অন্যতর রূপ দেখা যায় মোপলা অভ্যুত্থানে। এখানে অন্যায়কারী মহাজন ও জমিদাররা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী আর নিপীড়িত ও শোষিত মোপলারা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী—দুটি পক্ষের দুটি পৃথক ধর্ম থাকার দরুন মোপলা অভ্যুত্থান কী করে সাম্প্রদায়িক রূপ পায় সেকথা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে একবার বলেছি, তবু একথা পুনরাবৃত্তি করা ভালো যে এখানে বিরোধটা সাম্প্রদায়িক ছিল না, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল অর্থনৈতিক। গান্ধীজী বলেছেন যে তিনি যদি মালাবার উপকূলে মোপলাদের মধ্যে যাওয়ার সুযোগ পেতেন তাহলে মোপলাদের ধ্বংস ও হিংসার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন।

কিন্তু যেসব স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে গান্ধীজী সরকারী বাধা পাননি তেমন অনেক স্থানেও ধ্বংস ও হিংসার প্রকাশ হয়েছে। আন্দোলনকারীদের হিংস্রতা ও নৃশংসতার চরম প্রকাশ ঘটে গোরখপুরের চৌরিচৌরা নামক স্থানে—এখানে আন্দোলনকারীরা ভয়ঙ্কর আক্রোশে একুশ জন পুলিশকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।

এই ঘটনাটা এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত বহন করছিল—হাজার হাজার বছরের ঘুম থেকে রাতারাতি জেগে ওঠা জনসাধারণের আবেগ ও চাঞ্চল্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব, তাছাড়া বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি উত্তেজনা জাগলে তা হিংস্রতার পথ নেয় এবং এই ইঙ্গিতের থেকেই শঙ্কিত গান্ধীজী আন্দোলনটি প্রত্যাহার করলেন।

এক হিসেবে এটা হলো অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা। আগেই বলেছি এই আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ ছিল কাউনসিলে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকা। যাঁরা কাউনসিলে প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁদের নেতা রূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৯২০-র সেপ্টেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে বলেছিলেন, 'I want to make the councils an instrument for the attainment of Swaraj and to use the weapon which is in the hallow of your hands to bring about the full complete Swaraj.' অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে কংগ্রেস লেজিসলেটিভ কাউনসিল অর্থাৎ আইন প্রণয়নের সভাতে প্রবেশের নীতি পুনরায় গ্রহণ করল, কিন্তু রাজাগোপালচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতারা ১৯২৩-এর পরেও কাউনসিল বর্জনের নীতিকে দৃঢ় ভাবে অনুসরণ করতে লাগলেন। আইনসভাতে প্রবেশ করতে হলে নির্বাচনে অংশ নিতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনিবার্য ভাবেই বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নগুলিকে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপন করতে লাগলেন এবং এভাবে সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা দেশের মধ্যে দ্রুত বিস্তৃত হতে লাগল।

দেশবন্ধুর দল পরিচিত ছিল স্বরাজ দল নামে—এই দল অবশ্য সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইন সভাতে নরমপন্থী কংগ্রেস নেতা ও উদার মুসলিম সভ্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ন্যাশনালিস্ট পার্টি নামে একটি যুক্তদল গঠন করে। তথাপি নির্বাচক মণ্ডলীর শিক্ষিত ও বিত্তবানদের স্তরে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ ব্যাপক ও গভীর হতে থাকে। কেননা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার, প্রশ্নটাই প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল—বিত্ত ও শিক্ষার মানদণ্ডেই তখন নির্বাচক মণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুত করা হতো এবং এর থেকেই বোঝা যাবে যে জনসাধারণের কোন্ স্তরে সাম্প্রদায়িকতা প্রবল আকার পেয়েছিল ও চালিকা বৃত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। আগেই বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি শিক্ষিত সমাজে এই ধারণা জন্মায় যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এক স্বতন্ত্র জাতি—এই ধারণা টিলকের মতো অনেক কংগ্রেস নেতার মানসেও একটা প্রবল প্রত্যয়ের আকার

লাভ করে। স্বভাবতই হিন্দু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের নেতারাও স্বতন্ত্র জাতি রূপে হিন্দু স্বার্থ বিবেচনার সমস্যাটাকে আপন আপন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন যার প্রমাণ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শরৎচন্দ্রের উক্তিতে পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায়। 'হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ'—এই কথা উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বলেননি, কিন্তু পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রতিষ্ঠার পর কংগ্রেসের মতো সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতাদের মুখেও কথাটা শোনা যেতে লাগল।

ভারতীয়দের মধ্যে আরও একটা উপকরণ ছিল যেটাকে বিশুদ্ধ হিন্দু সাম্প্রদায়িক উপকরণ বলতে পারি। ১৯১৬-তে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কংগ্রেস সম্বন্ধে হতাশ হলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করলেন যে কংগ্রেসকে দিয়ে বিশেষ ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থগুলো সিদ্ধ করা যাবে না। এই রকম পরিস্থিতিতে স্যার রামপাল সিংকে সভাপতি করে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম অখিল ভারতীয় হিন্দু সম্মেলন। রামপাল সিংকেই সভাপতি পদে বরণ করার ব্যাপারটা লক্ষণীয়—গোমাংস ভক্ষণকারীদের প্রতি তাঁর বিরূপতা সেই ১৮৯৩ থেকেই সর্বজনবিদিত; ভারতবর্ষে সেই প্রথম হিন্দু মুসলিমের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর সময় ইনি ছিলেন গো-রক্ষিণী সভার নেতা এবং এটা স্বতঃপ্রকাশিত যে ওই দাঙ্গাগুলোর মূলে উক্ত সভার প্ররোচনা ও তৎপরতা ছিল; আরও লক্ষণীয় যে রাজা রামপাল সিং গোমাংস-ভক্ষণকারী রূপে মুসলমানদের প্রতি বিরূপ ছিলেন বটে কিন্তু ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ছিলেন না, বরং ইংরেজদের সেবক ছিলেন এবং তাঁর সেবাতে প্রীত হয়ে-ই ইংরেজরা তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করে। সুতরাং হিন্দু সঙ্ঘের সঙ্গে রামপাল সিংয়ের যোগাযোগ অপরিকল্পিত নয়, আকস্মিকও নয়, উপরন্তু এই যোগাযোগের প্রভাব ও ব্যঞ্জনা গভীর ভাবে অনুধাবনের বিষয়। হিন্দু সঙ্ঘের থেকে হিন্দু মহাসভার উৎপত্তি হলো এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভার লক্ষ্য হলো, স্বায়ত্ত শাসনের পরিকল্পনার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যে অধিকতর ক্ষমতা অর্জন করা। একই সঙ্গে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের স্বতন্ত্র জাতি রূপে সংঘঠিত করার জন্যে সংগঠন আন্দোলন এবং যেসব ভারতীয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদেরকে সনাতন হিন্দু সমাজের ফিরিয়ে আনার জন্যে শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন। পৃথক নির্বাচন প্রথাতে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে ভোটের সংখ্যাই যেখানে ক্ষমতা লাভের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ সেখানে সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝা খুবই সোজা। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বাণী

শোনবার জন্যে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বশে মুসলমানরা এক সময় তাঁকে দিল্লীর জামা মসজিদে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দই যখন সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করলেন তখন তার উত্তরে সফিউদ্দিন কিচলুর মতো অবিসংবাদিত দেশপ্রেমিক ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তঞ্জিম ও তবলিঘ আন্দোলন শুরু করলেন। পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ক্ষমতার জন্যে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলনে এবং পাল্টা-আন্দোলন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘর্ষে জোগাল অমোঘ প্ররোচনা।

উপরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ধারার প্রভাব ও প্রসার সম্বন্ধে যা বলেছি তা স্পষ্টতই শিক্ষিত ও সম্পন্ন স্তরে তথা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে সত্য ; কিন্তু এই সত্য শুধু উল্লিখিত শ্রেণীতেই আবদ্ধ থাকেনি, তা সাধারণ মানুষের তথা অশিক্ষিত ও দরিদ্র স্তরেও প্রবল পরাক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে-ধরনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তার ফলে এখন থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা দ্রুত বেগে ও সরাসরি নিম্নবিত্ত শ্রেণীতেও সংক্রমিত হয়। তাছাড়া অসহযোগ অন্দোলনকে অবলম্বন করে যে-উন্মাদনা, যে-উদ্দীপনা জেগেছিল আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পরে সেই অকস্মাৎ নিরবলম্ব উন্মাদনা ও উদ্দীপনা কোন্ ভাবধারাকে অবলম্বন করবে ? অসহযোগিতার আদর্শ সরে গেল, সাধারণ মানুষের জীবনে সৃষ্টি হলো একটা শূন্যতার এবং সম্ভবত সেই শূন্যতাকেই পূর্ণ করল সাম্প্র-দায়িকতার আদর্শ। অর্থাৎ একথা সন্দেহ করার সঙ্গত কারণ আছে যে অসহযোগ আন্দোলনের পথ আকস্মিক ভাবে রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে জাগ্রত জনসাধারণের চাঞ্চল্য সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরল। 'It is possible that sudden bottling up of a great movement contributed to a tragic devlopment in the country,' জহরলাল নেহেরু 'অটোবায়ো-গ্রাফি'-তে লিখেছেন, 'the suppressed violence had to find a way out and the following years this perhapas aggravated the communal trouble.'

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো প্রথমে কলকাতা, দিল্লী, লখনৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ, কানপুর, জব্বলপুর, নাগপুর প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে শুরু হলো এবং তারপর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে। গ্রামের দিকে দাঙ্গার প্রসার প্রমাণ করে যে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত

শহরগুলো থেকে দেশের গভীর অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল অর্থাৎ পল্লবগ্রাহী স্তর থেকে প্রবেশ করছিল শিকড়াশ্রয়ী লোকজীবনে। সাইমন পরিচালিত স্ট্যাটুটারী কমিশন এবিষয়ে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে লিপিবদ্ধ করে, 'Every year since 1923 has witnessed communal rioting on an extensive, and, in fact, on an increasing scale which has as yet shown no sign of abating. The attached list, which excludes minor occurances, records no less than 112 communal riots within the last five years, of which 31 have occurred during 1927.' অবশ্য ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকোপ সাময়িক ভাবে হ্রাস পায়, কারণ সাইমন কমিশন প্রেরণের প্রস্তাবটাই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্ররোচনা জোগায়। সাইমন কমিশনের সকল সদস্যই ছিলেন ইংরেজ বংশোদ্ভূত। কিন্তু ভারতবাসীদের নিজস্ব সমস্যা ইংলণ্ডের খাস ইংরেজরা বুঝবে কী করে? তাই সাইমন কমিশনের থেকে ভারতীয়দের পুরোপুরি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ব্রিটিশ বংশোদ্ভূতদের নিয়ে কমিশন গঠনের প্রতিবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় গোষ্ঠী-ই ঐক্যবদ্ধ হলো। মুসলিম লীগের কোন কোন প্রবীণ নেতা অবশ্য সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু জিন্নাপন্থী লীগ-সদস্যরা তাঁদের প্রতিবাদ জ্ঞাপনে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালেন। 'Jalinwalla Bagh was physical butchery,' জিন্না বললেন, 'the Simon Commission is the butchery of our soul.'

কালো চামড়ার প্রতি শাদা চামড়ার অপমান দ্বিগুণ হয়েছিল ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসচিব লর্ড বর্কেনহেডের বিদ্রূপে—এই রাষ্ট্রসচিব একাধিকবার বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে যারা শাদা চামড়ার কমিশনের বিরুদ্ধে এত চেঁচামেচি করছে তারা নিজেরাই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধ ভাবে একটা শাসনতন্ত্র রচনা করতেও অক্ষম। বর্কেনহেডের বিদ্রূপের উত্তর দেওয়ার জন্যে ভারতবাসীরা এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। ১৯২৮-এর ৭ই ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করল—সেদিন সারা দেশ জুড়ে পালিত হলো এক অভূতপূর্ব হরতাল—এই উপলক্ষ্যে বাহ্যত ও সাময়িকভাবে হলেও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতবাসীদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির এক নতুন প্রমাণ পাওয়া গেল। একই ঐক্য ও সংহতির অন্যতর প্রকাশ দেখা গেল ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অল-পার্টিজ কনফারেন্সে। মোট উনত্রিশটি

দল এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ফলে সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিপুল আকার ধারণ করে যে ওই সম্মেলনে কোনও বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সর্ব-দলীয় সম্মেলন কর্তৃক মনোনীত ৯ জনের এক প্রতিনিধি-সভা ১৯ শে মে মিলিত হলো বোম্বাইয়ে এবং কম করে পঁচিশটি বৈঠকের পরে একটি খশড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। অল্প রদবদল করে শাসনতন্ত্রটি অগস্ট মাসে লখনৌয়ে অনুষ্ঠিত সর্ব-দলীয় সম্মেলনে গৃহীত হয়। অতঃপর প্রত্যেক দল যাতে পৃথক পৃথক ভাবে শাসনতন্ত্রটির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি প্রসঙ্গকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করতে পারে সেজন্যে সেইটের নকল প্রত্যেকটি দলকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রেরণ করা হয়।

এই শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের মৌল অধিকারের প্রসঙ্গটি যথাসম্ভব বিনীতভাবে উত্থাপিত হয়; জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয় বটে, কিন্তু নাগরিকের কর্তব্য প্রসঙ্গে শাসনতন্ত্রটি নীরব, অনুন্নত শ্রেণী, নারী ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়; সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা জাগানোর জন্যে তাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস-ও দেওয়া হয়; পৃথক নির্বাচন প্রথাকে ক্ষতিকর বিবেচনা করে বর্জন করা হয় বটে, কিন্তু শুধু মুসলিমদের জন্যে প্রদেশগুলোতে সংখ্যালঘুর নামে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়; উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশকে একটি পূর্ণ প্রদেশ রূপে গণ্য করার এবং সিন্ধু-প্রদেশ নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। যেসব প্রশ্ন পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে জটিলতা সৃষ্টি করে তার অনেকগুলোর সূত্র প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের উল্লিখিত ধারাগুলোতে বিদ্যমান। বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের প্রশ্নটা বিগত দু দশক থেকেই একটা গুরুতর সমস্যার আকার লাভ করেছিল। যে তিনটে সম্প্রদায় বা শ্রেণী নিয়ে সমস্যা সবচেয়ে প্রকট রূপ পায় সে-তিনটে হলো ইসলাম ধর্মাবলম্বী, শিখ ধর্মাবলম্বী এবং অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যা। খ্রীস্টানরা সাধারণ ভাবে শাসনতন্ত্রটিতে সম্মতি জানালেও এই মন্তব্য করে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ তাতে যথোচিত বিচার ও বিবেচনা লাভ করেনি (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)।

যা হোক, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান-ই প্রথমে আলোচনা করা সমীচীন। ডক্টর আনসারি, স্যার আলী ইমাম, রাজা অব মাহমুদাবাদ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা শাসনতন্ত্রটিকে সমর্থন করলেও ৩১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলন শাসনতন্ত্রটিকে বাতিল করল। এই সম্মেলনেই ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সব চাইতে জনপ্রিয় নেতা রূপে মহম্মদ

আলী জিন্নার উত্থান হয়—১৯২০-২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী এবং মুসলিম লীগের অন্যতম প্রধান নেতা—কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে গান্ধীজীর আদর্শবাদ তাঁর পক্ষে অতিরিক্ত রহস্যময়, তবে তখনও তিনি রক্ষণশীল মুসলিম নেতাদের সঙ্গে সাযুজ্য বোধ করেননি। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠতে শুরু করে এবং সেই বিরোধের আবহে লাহোরে অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে যুক্ত সংবিধান ও অবিলম্বে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবি জানানো হয়, প্রচলিত পৃথক নির্বাচন প্রথার যৌক্তিকতা নির্দেশ করা হয় এবং এই আশ্বাস চাওয়া হয় যে কোনও বিল বা প্রস্তাব সম্প্রদায় বিশেষের তিন-চতুর্থ অংশের আপত্তি থাকলে গৃহীত হবে না। সাম্প্রদায়িক বিরোধের নিন্দা করে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর জন্যে প্রদেশে প্রদেশে সংস্থা প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব স্বয়ং জিন্না উত্থাপন করেন এবং প্রস্তাবটি তাঁরই প্রভাবে গৃহীত হয়—উক্ত প্রস্তাব জিন্নার তৎকালীন মনোভাবের পরিচায়ক।

পরবর্তী চার বছরের মধ্যে জিন্নার চিন্তাধারাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। আগেই বলেছি, এই সময়টাতে হিন্দু মহাসভার তৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে শাসনতন্ত্রের খশড়া রচনাকালে জিন্না তিনটি সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন—প্রথমত, কেন্দ্রীয় আইন সভাতে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব থাকবে; দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাব ও বাংলার আইনসভার ক্ষেত্রে পূর্ণ বয়ঃ প্রাপ্তির ভিত্তিতে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা অনুমোদিত না হলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে, এবং তৃতীয়ত, অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রদেশে ন্যস্ত করা হবে। স্পষ্টতই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় রূপে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাসন সম্বন্ধে জিন্নার মনে গভীর শঙ্কা জেগেছিল এবং সেই শঙ্কা নিরাকরণের জন্যে তিনি তখন পথ খোঁজা শুরু করেছেন। তাঁর প্রস্তাবগুলি যখন প্রত্যাখ্যাত হলো তখন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর শঙ্কা দৃঢ়তর হলো। শঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ চিত্তে প্রত্যাখ্যাত জিন্না অতঃপর সর্ব-দলীয় সম্মেলন ত্যাগ করে যোগ দিলেন আগা খান, স্যার মুহম্মদ শাফি প্রভৃতির ইংরেজ-ভক্ত গোষ্ঠীতে।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে জিন্না উপস্থাপন করলেন তাঁর চোদ্দ দফা প্রস্তাব। সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভাব প্রতিরোধ ও প্রতিপত্তি খর্ব করার সমস্ত ব্যবস্থাই নিম্নলিখিত চোদ্দটি দাবীতে তিনি রাখলেন—১। ভবিষ্যৎ সংবিধান ফেডারল বা যুক্ত

সংবিধান হবে আর অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলোও দেওয়া হবে প্রাদেশিক সরকারকে ; ২। সবগুলো প্রদেশকে সমপরিমাণ আত্মকর্তৃত্ব দিতে হবে ; ৩। দেশের সমস্ত আইনসভা এবং অন্যান্য নির্বাচন-ভিত্তিক সংস্থাগুলো সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত ও কার্যকর প্রতিনিধিত্বের নীতিতে গঠিত হবে ; ৪। কেন্দ্রীয় আইনসভাতে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশের কম করা চলবে না ; ৫। প্রচলিত পৃথক নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে, কিন্তু যে কোনও সম্প্রদায়-ই যে কোন সময়-ই যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার সামিল হতে পারবে ; ৬। পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে এমন ভাবে কোনও অঞ্চল বা প্রদেশ পুনর্গঠন করা চলবে না ; ৭। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে ; ৮। কোনও আইনসভা বা নির্বাচন-ভিত্তিক সংস্থার একই সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের তিন চতুর্থাংশ সদস্য-সংখ্যা যদি কোনও বিল বা প্রস্তাব বা তার অংশ বিশেষকে আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী রূপে গণ্য করে তাহলে সমগ্র সভা বা সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন সত্ত্বেও তা অনুমোদন বা গ্রহণ করা চলবে না ; ৯। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে সিন্ধুকে পৃথক করতে হবে ; ১০। অন্যান্য প্রদেশে যেসব নীতিতে সংস্কার সাধন করা হয়েছে বা হচ্ছে সেই একই নীতিতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও বালুচিস্তানেও সংস্কার সাধন করতে হবে ; ১১। সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সরকারের উচ্চতর পদগুলিতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে মুসলিমরা উপযুক্ত অংশ লাভ করতে পারে ; ১২। মুসলিম সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, আইন এবং বিনামূল্যে যেসব মুসলিম প্রতিষ্ঠান জনসেবা করে সেগুলোকে রক্ষার ব্যবস্থা সংবিধানে থাকা চাই এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে সরকারী দান, অনুদান ও ঋণ বিষয়ক সুবিধাগুলো প্রযোজ্য হওয়া চাই ; ১৩। অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম প্রতিনিধি ব্যতীত কেন্দ্রের বা প্রদেশের ক্যাবিনেট গঠন করা চলবে না ; এবং ১৪। ইণ্ডিয়ন ফেডেরশনের কাঠামোর মধ্যে রাজ্যের সম্মতি ব্যতীত কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক সংবিধানের সংশোধন করা চলবে না।

জিন্নার চিন্তাধারা যে-পথে বিবর্তিত হয়েছে তার চিহ্ন অনুসরণে এটা খুব সহজেই বোঝা যাবে, মাত্র ছ-বছরের মধ্যে তাঁর নীতিতে ও লক্ষ্যে মৌল পরিবর্তন ঘটে গেছে—সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রভাব ও পেষণ সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা আশঙ্কা ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে এবং সেই প্রভাব ও পেষণকে প্রতিরোধ করার জন্যে বহুবিধ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ও শর্ত দিয়ে আপন সম্প্রদায়ের

অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করতে তিনি ক্রমশ অধিকতর যত্নশীল ও সচেষ্ট হয়েছেন। গণতান্ত্রিক বা প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠেরই শাসন। ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে—যেখানে ধর্মীয় বিচার-বিশ্বাসের ভিত্তির উপরে রাজনৈতিক উপায়-উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের সহজ ও সরল অর্থ-ই হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাসন। উক্ত প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী সংগ্রামে সংখ্যার প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রশ্ন একটা নতুন মাত্রা লাভ করল একদিকে সংগঠন শুদ্ধি অন্যদিকে তঞ্জিম-তবলিঘ আন্দোলন দুটির ফলে। কারণ আদিতে ওই দুটি আন্দোলনের আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক যে-তাৎপর্যই থাকুক-না কেন, দুটোই অন্তিম তাৎপর্যে আপন আপন সম্প্রদায়ের পক্ষে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানোর আন্দোলন। সাম্প্রদায়িকতার পাপ দূর করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে গান্ধীজীর অনশনের কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া জাতীয় জীবনে দেখা যায়নি আর রবীন্দ্রনাথের যুক্তি অনুধাবনের ক্ষমতা আরও দুর্লভ বস্তু। যেখানে সাধারণ ভাবে গান্ধীজী বা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার কোন ছাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর পড়ছে না, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ রূপে ওই সম্প্রদায়ের চাপ সম্বন্ধে জিন্নার আশঙ্কাকে অমূলক বলে কোনও মতেই উপেক্ষা করা যায় না।

শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই পৃথক সম্প্রদায়ের বোধে আক্রান্ত হয়নি, শিখ ধর্মাবলম্বীরাও হয়েছে। আগেই বলেছি যে মণ্টফোর্ড রিপোর্টে শিখদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার সুপারিশ করা হয়। কোন্ যুক্তিতে শিখদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়? মণ্টফোর্ড রিপোর্টে প্রদর্শিত যুক্তি ছিল যে শিখরা সৈন্যবাহিনীতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সামরিক জাতি হিসেবে স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা ও পৃথক নির্বাচনের অধিকার তাদের প্রাপ্য। সাধারণভাবে শিখরাও হিন্দু ভাবসত্ত্ব ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে মনে হয়, কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির স্বার্থ তাদের ব্যাপক হিন্দু আদর্শের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত উক্ত মণ্টফোর্ড রিপোর্টে শিখরা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে যে সত্তা অনুভব করে তার ফলশ্রুতি দেখা যায় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে যখন অমৃতসরে 'with the avowed object of safeguarding the political and religious interests of the Sikh people' প্রতিষ্ঠিত হয় সেণ্ট্রাল শিখ লীগ। পরের বছর ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে শিখ সম্প্রদায়ের ভিতরে, বিশেষ করে গুরুদ্বারগুলোতে, সরকারী আইনকানুনের রক্ষাকবচে যেসব দুর্নীতি ও ব্যভিচার চলছিল সেসব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গুরুদ্বার প্রবন্ধক সমিতি গঠিত হয় এবং এর

ফলে শিখদের মধ্যে একটা গভীর ঐক্য ও সংহতি সাধনের আন্দোলন শুরু হয়। অথচ সংখ্যার দিক থেকে শিখ একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়—৪৫ লক্ষের বেশী ছিল না এবং ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের আদমসুমারীতে তাদের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ৪,৩৩৫,৭৭১ জন —কিন্তু পাঞ্জাবে তাদের পূর্বতন গৌরব এবং সামরিক সম্প্রদায় হিসেবে ঐতিহ্য তাদেরকে যে গুরুত্ব দিয়েছে তার চতুর ব্যবহারে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্যময় বিভেদমূলক উপকরণ হিসেবে শিখদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে গড়ে তুলতে চেয়েছে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে সর্বদলীয় অধিবেশনের সময় একা জিন্নাই অধিবেশন ত্যাগ করেননি, খসড়া শাসনতন্ত্র রচনাকালে ওই নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে শিখদের দাবি গ্রাহ্য করছেন না বলে শিখরাও অধিবেশনটি বর্জন করেন। স্পষ্টতই ভারতবাসীদের মধ্যে বহুবিধ রাজনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের প্রক্রিয়া ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছিল এবং নিজের নিজের স্বার্থ বিপন্ন অনুভব করে সংখ্যালঘুরা সকলেই কমবেশি উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

এই বিভেদের অন্যতর প্রকাশ ঘটে অনুন্নত শ্রেণীর ক্ষেত্রে, তবে এখানে বিভেদের প্রসঙ্গটা অপেক্ষাকৃত জটিল, কারণ ধর্মের বিচারে অনুন্নত শ্রেণী হিন্দু ধর্মাবলম্বী অথচ জাতীয়তাবাদী বর্ণহিন্দু শ্রেণীর থেকে অনুন্নত শ্রেণীর সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এত প্রকট যে দুটো শ্রেণীকে স্বতন্ত্র দুটি সম্প্রদায় বলে মনে হয় এবং অনুন্নত শ্রেণী সাধারণত যেরূপ অপমানকর ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার বর্ণহিন্দু শ্রেণীর কাছ থেকে পেয়েছে তাতে স্বাভাবিক ভাবেই অনুন্নত শ্রেণী নিজেদেরকে একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে অনুভব করেছে, পক্ষান্তরে উন্নত শ্রেণীও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে অনুন্নত শ্রেণীকে একই উৎসজাত, একই সমাজভুক্ত, একই জাতিগত মানুষ বলে মনে করেনি—একাসনে উপবেশন, এক পংক্তিতে আহার, এক শিক্ষালয়ে শিক্ষা, এমন-কি এক মন্দিরে প্রার্থনা করার অধিকার থেকেও অনুন্নতদের বঞ্চিত রেখেছে। অনুন্নতদের কোন্ পর্যায়ের জীব বলে বর্ণহিন্দুরা মনে করে তার জ্বলন্ত নিদর্শন অবশ্য বাংলাভাষীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে অনুন্নতদের মানুষ বলে গণ্য করা হতো না বললে অত্যুক্তি হয় না। বিহারে এরকম এক অনুন্নত ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছি যে বছর চল্লিশেক আগে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে, গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন শুরু করার প্রায় বিশ বছর পরে, ওই ব্যক্তির বাবা একদিন হাঁটুর নিচে ধুতি পরেছিল আর হাঁটুর উপরে না পরে হাঁটুর নিচে ধুতি পরার অপরাধে তাকে জমিদার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছিল।

অনুন্নত শ্রেণীর একজন ব্যক্তির পক্ষে বর্ণহিন্দুদের মতো হাঁটুর নিচে ধুতি পরিধান এটা ছিল একটা সামাজিক অপরাধ। কেরলে নিম্নবর্ণদের কোন চোখে দেখা হতো সেকথা আগেই বলেছি। রাজস্থানে প্রত্যেক বর্ণের পৃথক পৃথক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার আছে এবং সেগুলো দেখে এক নজরেই বলা যায় যে কে কোন বর্ণের লোক। সেদিন খুব বেশী আগের কথা নয় যেদিন নিম্নবর্ণদের পক্ষে বর্ণহিন্দুদের মতো পোষাক পরাও সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল। নিজেদের আচরণ ও অনুশাসন দিয়ে বর্ণহিন্দুরা এমনভাবে অনুন্নত শ্রেণীকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল যার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে প্রকৃষ্টভাবে দেখা দিতে শুরু করে এবং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সেই প্রতিক্রিয়া ক্রমশ মিশে যেতে থাকে।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলো, আর তার দু বছর পরে যে আদমসুমারি হলো তাতে অনুন্নত শ্রেণী একটি পৃথক সাম্প্রদায়িক সত্তা হিসেবে রূপ লাভ করতে শুরু করল। নির্বাচনী সংগ্রামে ভোটের সংখ্যাগত মূল্য অপরিসীম, সুতরাং হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতাগণ স্বভাবতই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে নিজেদের চাপ বজায় রাখার জন্যে অনুন্নত শ্রেণীর সমর্থনলাভে সচেষ্ট হলেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করা হলো, 'This Congress urges upon the people of India the necessity, justice and righteousness of removing all disabilities imposed by custom upon the depressed classes, the disabilities being of a most vexatious and opressive character, subjecting those classes to considerable hardship and inconvenience.' স্পষ্টতই কোনও সামাজিক ন্যায়বোধের তাড়নাতে নয়, নিতান্তই নির্বাচনী নীতিভিত্তিক রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের উপায় হিসেবেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় —এর পেছনে ছিল সর্বপ্রকারে অনুন্নত শ্রেণীর মনোরঞ্জন করার অভিপ্রায়। সমাজের কাজের চাইতে স্বরাজের কাজ যে বেশী জরুরি তা ১৯২৪-এ অনুষ্ঠিত বেলগাঁও কংগ্রেসে গান্ধীজী কর্তৃক প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ থেকেও বোঝা যায়। তিনি খোলাখুলি ঘোষণা করেন, 'everything that is absolutely essential for *Swaraj* is more than merely social work, and must be taken by the Congress.' অনুন্নত শ্রেণীর হিতার্থে গান্ধীজী কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনে অনুন্নতদের জন্য মন্দিরে প্রবেশাধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এই অধিকারের সামাজিক তাৎপর্য

ছিল অনুন্নত শ্রেণীকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে টেনে আনা এবং ভোটের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার পর তাঁরাও আমবেদকার প্রমুখ অনুন্নত শ্রেণীর নেতারা ওই অধিকার দেওয়ার জন্যে অগ্রসর হিন্দু সমাজের ব্যগ্রতাকে সরল মনে গ্রহণ করতে পারেননি। 'হোয়াট কংগ্রেস অ্যাণ্ড গান্ধী হ্যাভ ডান টু দি আনটাচেবেলস' গ্রন্থে আমবেদকার লিখেছেন, 'Not very long ago there used to be boards on club doors and other social resorts maintained by Europeans in India, which said 'Dogs and Indians' not allowed. The temples of Hindus carry similar boards today, the only difference is that the boards on the Hindu temples practically say 'All Hindus and all animals including dogs are admitted, only Untouchables not admitted.' The situation in both cases is on a parity. But Hindus never begged for admission in those places from which the Europeans in their arrogance had excluded them. Why should an Untouchable beg for admission in a place which he has been excluded by the arrogance of the Hindus ?' আমবেদকার মনে করতেন যে যেসব স্থানে অনুন্নতরা অবাঞ্ছিত সেসব স্থানে প্রবেশাধিকারের অনুগ্রহ পাওয়ার চাইতে উচ্চতর শিক্ষার অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা লাভ করাটাই সবচাইতে জরুরি জিনিস।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে সর্ব-দলীয় সম্মেলনের পক্ষ থেকে রচিত সংবিধানে অনুন্নত শ্রেণীর নেতারা সন্তুষ্ট হতে পারেননি, তাঁরা বলেন যে এতে তাঁদের শ্রেণীর প্রশ্নটাকে ভালো করে তুলে ধরা হয়নি এবং কোন রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্বভাবতই এর ফলে রাও বাহাদুর এস. সি. রাজা, আমবেদকার প্রমুখ নেতাদের মনে ধারণা জন্মায় যে অনুন্নত শ্রেণীকে উক্ত সংবিধান-রচয়িতাগণ অবহেলা ও উপেক্ষা করেছেন। অগ্রসর হিন্দু সমাজের মনোভাব, কংগ্রেসের লোক-দেখানো আন্দোলন, সেনসাস কমিশনর এডোয়ার্ড গেইট কর্তৃক অনুন্নত শ্রেণীকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রূপে গুরুত্ব দানের নির্দেশ—এইসব মিলে আলোচ্য শ্রেণীর মনে গভীর চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে। হিন্দু মহাসভা সম্বন্ধে তো বটেই, দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের উপায় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও অনুন্নত শ্রেণীর নেতৃমহলে জাগে অপ্রতিকার্য অবিশ্বাস ও আশঙ্কা। অনুন্নত শ্রেণীর উল্লিখিত মনোভঙ্গি ও মনোভাব প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে-ই কঠিন জটিলতার সৃষ্টি

করে। প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের মাইনোরিটিস সাবকমিটি সর্বসম্মতি ক্রমে এই নীতি গ্রহণ করে যে 'the new constitution should contain provisions designed to assure communities that their interests would not be prejudiced.' ড. আমবেদকার দাবি করলেন যে নির্বাচনের জন্যে অনুন্নত শ্রেণীকে একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করতে হবে। এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে কোনও শাসনতন্ত্রই সফল হবে না। তবে তেজবাহাদুর সপরু এবং এন. আর. জয়কার আশা প্রকাশ করলেন, স্বদেশের সেবার জন্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে মিলে-মিশে কাজ করার সুযোগ দিলে তারা নিজেরাই নিজেদের ভেদাভেদের সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারবে।

দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স-এর সময় সংখ্যালঘুদের প্রশ্নটাই সবচাইতে বেশি জটিলতা সৃষ্টি করল। মুসলিম, অনুন্নত শ্রেণী, ইঙ্গ-ভারতীয় ও দেশীয় খ্রীস্টান এবং ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিগণ যা স্থির করলেন তা হিন্দু ও শিখদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না। তার উপরে ড. আমবেদকার প্রস্তাব করলেন যে অনুন্নতদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই শ্রেণীর জন্যে যুক্ত নির্বাচনের কাঠামোর মধ্যে আইনসভাতে সংরক্ষিত আসন চাই। এই প্রস্তাব গান্ধীজী অগ্রাহ্য করলে আমবেদকার অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইংলণ্ডে এবার গান্ধীজীর সঙ্গে বর্নার্ড শ ও আরও অনেক মনীষীদের সাক্ষাৎ হয়; লেডী মিণ্টোর সঙ্গে দেখা হলে গান্ধীজী তাঁকে বলেন, 'আপনার স্বামী ভারতবর্ষে পৃথক নির্বাচন প্রথার মতো একটা ক্ষতিকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন।'

দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স শেষ হলো, কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে সমস্যার মীমাংসা করতে পারলেন না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড বললেন যে সম্প্রদায়গুলো যখন সামাধানের সূত্র দিতে পারল না তখন সেই সূত্র ব্রিটিশ সরকারকেই দিতে হবে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অগস্ট ম্যাকডোনাল্ড যে-সূত্র ঘোষণা করলেন তা কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বলে পরিচিত। এটাকে অবশ্য দৃঢ় অর্থে অ্যাওয়ার্ড বলা ভুল, কারণ অ্যাওয়ার্ড হলো দুটি পক্ষের মধ্যে বিতর্কের প্রসঙ্গে এমন একটা বিচার যা উভয় পক্ষেরই সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কংগ্রেসের সম্মতি লাভ করা দূরে থাক, কংগ্রেসের কোনরকম মতামত-ই জানতে চাওয়া হয়নি অর্থাৎ রোয়েদাদটা ছিল কার্যত প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি সম্বন্ধে

একটা সরকারী আদেশ। এক হিসেবে এটা সীমাবদ্ধ রোয়েদাদ ছিল, কারণ প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন বণ্টনের ব্যাপারটাই এই রোয়েদাদে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু যেখানে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদেরও আসন দেওয়ার কথা সেই কেন্দ্রীয় আইনসভার কথা আদৌ উল্লেখ করা হয়নি। মুসলিম, শিখ, ভারতীয় খ্রীস্টান, ইঙ্গ-ভারতীয় এবং মহিলাদের জন্যে পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী দেওয়া হলো। শ্রম, বাণিজ্য, শিল্প, ভূস্বামী এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর জন্যে তৈরি করা হলো পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্র ও নির্দিষ্ট-আসন। সাধারণ যুক্ত-আসনগুলোর থেকে বোম্বাইয়ে মারাঠাদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হলো সাতটি আসন। অনুন্নত শ্রেণীর ভোটদাতারা সাধারণ নির্বাচন-ক্ষেত্রগুলোতে ভোটদানের অধিকার লাভ করল; তাছাড়া এমন কিছু সংখ্যক আসন তাদেরকে দেওয়া হলো যেগুলো বিশেষ কতকগুলো নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে শুধু অনুন্নত শ্রেণীর ভোটেই পূরণ করা হবে। অর্থাৎ অনুন্নত শ্রেণীর ভোটদাতারা প্রত্যেকে দুটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করল—একটি সাধারণ নির্বাচন-ক্ষেত্রে এবং অপরটি তাদের জন্যে উল্লিখিত বিশেষ নির্বাচন-ক্ষেত্রে। একথাও ঘোষিত হলো যে অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে বিশেষ নির্বাচন-ক্ষেত্রগুলো কুড়ি বছর পরে লোপ পাবে।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড' গ্রন্থে রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন যে হিন্দুদের প্রতি এই ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা চরম অবিচার করেছে, মুসলিমদের প্রায় সমস্ত দাবি-ই মেনে নিয়েছে আর অযৌক্তিক উদারতা দেখিয়েছে ইয়োরোপীয়দের প্রতি। 'In Bengal, the Hindus were in the minority of 44·8 per cent of the total population, but they were given only 32 per cent of the total seats. The Mussalmans who were 54·8% of the population were given 47·6% seats of the total. The Europeans who were ·01 per cent of the population were given 10 per cent of the total seats. It will, thus, appear that the Muslims who were in a majority were deprived even of their due proportion in order to give very heavy weightage to the Europeans. What is noteworthy is that although the representation of the both Muslims and Hindus was reduced, the cut was greater in the case of Hindus. In the Punjab, Muslims and Hindus were similarly

treated to give weightage to the Sikhs.' শুধু সুবিচার অবিচারের প্রশ্ন নয়, এখানে উদ্দেশ্যের প্রশ্নটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় জনসাধারণকে এই রোয়েদাদ সতেরোটি খণ্ড খণ্ড স্বার্থে বিভক্ত করল কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে? বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিই বা কী ছিল? ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসীকে দেশীয় জনসমষ্টি আর বিদেশীয় জনসমষ্টি হিসেবে দুটো খণ্ডে ভাগ করা চলত, কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীস্টান প্রভৃতি খণ্ডেও ভাগ করা চলত; অথবা আর্থিক শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী, ভূস্বামী, কৃষক প্রভৃতি খণ্ডেও ভাগ করা চলত। কিন্তু যেভাবে ভাগাভাগি করা হলো তাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জীবিকা, শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি সব কিছুকেই এক-একটি স্বার্থ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে ভারতবর্ষের অধিবাসিসমষ্টিকে।

মুসলিম লীগ ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেনি, কিন্তু মন্দের ভালো হিসেবে এটাকে স্বাগত জানিয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিক্রিয়া হলো বেশ বিচিত্র, ঘোষণা করল 'it would neither accept nor reject the Award.' এই মনোভঙ্গির জন্যে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের মতো হিন্দু স্বার্থের রক্ষাকর্তাগণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তীব্র সমালোচনা করলেন। আর গান্ধীজী বললেন, অনুন্নত শ্রেণীকে পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্র দিয়ে হিন্দু সমাজকে দ্বিখণ্ড করা হচ্ছে ও অস্পৃশ্যতাতে ইন্ধন জোগানো হচ্ছে, কেননা এর ফলে বর্ণ হিন্দু শ্রেণী ও অনুন্নত শ্রেণীর পক্ষে পরস্পরের বিরোধিতামূলক আচরণে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। রোয়েদাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্যে গান্ধীজী পেষণ সৃষ্টি করলেন ১৯৩৩-এর ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার জন্যে একদিকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতাগণ আর অন্যদিকে ভীমরাও আমবেদকার, এম. সি. রাজা প্রমুখ নেতাগণ মিলে পুনা প্যাক্ট নামে এক বন্দোবস্তে এলেন। এই পুনা প্যাক্টে স্থির হলো যে অনুন্নত শ্রেণী হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলীতেই থাকবে এবং তার পরিবর্তে প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে অনুন্নত শ্রেণী ১৪৮টি আসন পাবে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী ধরা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদেরকে আইনসভাগুলোতে দেওয়া হয়েছিল ৭১টি আসন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর বিনিময়ে অনুন্নতরা পেল দ্বিগুণেরও বেশি আসন।

অতঃপর তৃতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স। ভারতীয়দের সঙ্গে একত্রে

বসে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ শাসনের সিদ্ধান্ত নেবে এটা কোনও সময়েই রক্ষণশীল ইংরেজদের মনঃপূত ছিল না ; সুতরাং গভীর অনিচ্ছার সঙ্গে তৃতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স আহুত হলো। এই বৈঠকে শুধু তাঁরাই আমন্ত্রিত হলেন যারা রক্ষণশীলদের বন্ধু বলে গণ্য হতেন এবং ব্রিটিশের বিরোধী হিসাবে কংগ্রেসের নেতারা একেবারে বাদ গেলেন। ১৯৩২-এর ডিসেম্বরে তৃতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বসল এবং ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে প্রকাশিত হলো ব্রিটিশ সরকারের শ্বেত পত্র। (পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য)। এপ্রিল মাসে শ্বেত পত্রটি আলোচনা করার জন্য একটি পার্লামেণ্টারি সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত হলো। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন লর্ড লিনলিথগো ; ব্রিটিশ পার্লমেণ্টের উভয় কক্ষ থেকে মোট ১৬ জন সদস্যকে কমিটিতে গ্রহণ করা হলো এবং এঁরা অধিকংশই ছিলেন রক্ষণশীল দলভুক্ত। কমিটির কার্যধারার সাক্ষী হিসেবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিদের আমন্ত্রন জানানো হয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসচিব হিসাবে স্যার স্যামুয়েল হোর হলেন সরকার পক্ষের প্রধান প্রতিনিধি। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ ই নভেম্বর। শ্বেত পত্রটি কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্যে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা সুপারিশ করেছিল, কিন্তু ওই কমিটি সুপারিশ করল পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা। দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিদের নির্বাচন করার ক্ষমতা জনসাধারণের থাকবে না, তা থাকবে শুধু রাজন্যবর্গের। শ্বেত পত্রটি প্রদেশের দ্বিতীয় কক্ষ বিলোপের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে দেওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু ওই কমিটি ক্ষমতাটি অর্পণ করল বৃটিশ পার্লামেণ্টের হাতে। ফেডারল কোর্টের উপর ওই কমিটি এমন কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করল যার ফলে ভারতবর্ষে আপীল জানাবার সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে তা থাকতে না পারে এবং যাতে কোনও ভাবে প্রিভি কাউনসিলের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা কণামাত্র ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। কমিটির সুপারিশগুলোর ভিত্তিতে প্রবর্তিত হলো ১৯৩৫ ভারত-শাসন আইন। এই আইন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বহুবিধ স্বার্থকে সুপ্রষ্ঠিত করে সেগুলোকে নির্বাচনী সংগ্রামের ভিত্তিতে পরস্পরের বিরোধী শক্তি রূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিল (পরিশিষ্ট গ, ঘ ঙ এবং চ দ্রষ্টব্য)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[ভারতীয় ইতিহাসের পর্ব বিভাগ—ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ—ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদের বিভিন্ন রূপ—বিভেদের প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—লোকসত্য হলো বিভেদকে স্বীকার করে সমন্বয়ের সাধনা—বিদেশী রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা—লোকসত্যের বিপরীতে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম ও বৃদ্ধি—বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশ ও আনুষ্ঠানিক অংশ—আধুনিকতার বিপরীতে বৈষয়িক ও রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে আনুষ্ঠানিক ধর্মের নতুন গুরুত্ব ও মাত্রা লাভ—লোকসত্যের থেকে বিচ্ছেদ এবং বিভেদের থেকে বিরোধের উৎপত্তি।]

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাধারণত হিন্দু পর্ব, মুসলিম পর্ব ও ব্রিটিশ পর্ব হিসেবে ভাগ করা হয়। প্রথম দুটি পর্ব, সুস্পষ্ট রূপে ধর্ম-ভিত্তিক আর শেষোক্ত পর্বটি জাতি-ভিত্তিক। অনেকের ধারণা হিন্দু পর্ব ও মুসলিম পর্ব রূপে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ভাগ করাটাও জাতি-ভিত্তিক। কিন্তু যে-কালকে হিন্দু পর্ব রূপে চিহ্নিত করা হয় সেই কালে হিন্দু জাতি নামে কোনও জাতির উদ্ভব হয়নি, এমন কি এমন কোনও ধর্মের উদ্ভব হয়নি যাকে তৎকালীন ভারতবাসী হিন্দু ধর্ম নামে চিহ্নিত করত—করে থাকলেও তার কোনও তৎকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই—সেকালে হিন্দু বলতে এক বিশেষ ভৌগোলিক অভিব্যক্তির মধ্যে বহুকাল ধরে বসবাসকারীদেরই বোঝানো হতো। ধর্ম-জ্ঞাপক হিন্দু শব্দের ব্যবহার হয় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন-কালকে হিন্দু পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয় মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে এবং সেটাও হয় সম্ভবত ইয়োরোপীয় বংশোদ্ভূত ঐতিহাসিকদের হাতে; সম্ভবত একই জাতিভুক্ত ঐতিহাসিকরাই এদেশে ব্রিটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠার আগের কয়েক শ বছরের ইতিহাসকে মুসলিম পর্ব বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলিম জাতির কল্পনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাগে এবং সেটাও জাগে হিন্দু জাতির কল্পনা জাগার পরে। এতকাল যে মুসলিম জাতির কল্পনা জাগেনি তার কারণ সৈন্যবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে ইসলাম ধর্মের নামে প্রেরণা জাগাবার চেষ্টা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই তুর্কী, আরব, ইরান, আফগানী প্রভৃতিতে ভেদাভেদ ছিল. এই ভেদাভেদ বহুলাংশে জাতি-ভিত্তিক ছিল—তুর্কী আরব প্রভৃতি জাতির পৃথক পৃথক নিজস্ব জীবনের ধারা, ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং বহুস্থলে ওই বিভেদের সঙ্গে বিরোধ-ও ছিল। অবশ্যই এদের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসের একটা ঐক্য ছিল কিন্তু সে-ঐক্যের বশে তারা আপন আপন

স্বার্থ ত্যাগ করে ইসলামের পতাকাতলে এক ও অখণ্ড বিশাল ভারতব্যাপী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেনি—সেরূপ কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় স্বধর্মীদের উদাত্ত আহ্বান জানায়নি এবং পরবর্তী কালেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায় কোনও সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়াস পায়নি। ধর্মীয় ঐক্য যে মুসলিমদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক ঐক্য জাগায়নি এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সামগ্রিক ভাবে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম ঐকের কোন ভিত্তি উনবিংশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়নি—তার জন্যে অনুকূল বাস্তব পরিস্থিতি-ও ছিল না। ব্রিটিশ পর্বের ভারতীয় ইতিহাসের পেছনে জাতি-ভিত্তিক সুসংহত, সুসজ্যবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চেতনার যে-ক্রিয়া দেখতে পাই তার তুল্য কোনও ক্রিয়া হিন্দু পর্ব বা মুসলিম পর্বের পেছনে ছিল না। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু ও মুসলিমের নামে বিভক্ত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু পর্ব, মুসলিম পর্ব জাতীয় নাম দিয়ে চিহ্নিত-করণের প্রয়াস যেমন ভ্রান্তিযুক্ত তেমনই ভ্রান্তিযুক্ত হলো এই ইতিহাসে বর্ণিত বিষয়বস্তু। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধার করাই সমীচীন: 'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটা-কাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি যায় কোথা হইতে আর এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

'কিন্তু এই রক্তবর্ণ রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্ন-দৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনোখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে। তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি খুনোখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না। সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলি-জালই তাহার চক্ষে আর সমস্ত গ্রাস করে; কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই, সে

ঘরের বাহিরে। সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা, ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না।' ফলে বিদেশীদের লেখা ইতিহাস পড়ে কিংবা বিদেশী ঐতিহাসিকদের শিক্ষাতে শিক্ষিত দেশীয় ঐতিহাসিকদের রচনা পড়ে আমরা যখন দেশের পরিচয় জানবার চেষ্টা করি তখন আমাদের সমস্ত জানাটাই বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আমরা রাশি রাশি আপাত সত্যের বোঝা বহন করতেই শিখি এবং প্রকৃত সত্যের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ি। প্রকৃত সত্যকে বাদ দিয়ে আপাত সত্যে মজে গেলে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয় এবং সেই বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে প্রকৃত সত্যের তাৎপর্য-ও বিকৃত হয়, তখন ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো বরেণ্য ঐতিহাসিকও মুকুন্দরামের গৃহত্যাগের কারণ দেখাতে গিয়ে ভুল করে বসেন, তখন এসত্যও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় যে কেন তথাকথিত মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্র থেকে বহুদূরে বাংলাতেই মুসলিমদের সংখ্যা বেশি, কেন-ই বা যে-অংশের অধিবাসীরা সবচাইতে বেশি ইসলাম ধর্মান্তরিত হয়েছে সেই পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে অত্যাচারীরূপে মুসলিম চিত্রের অভাব আর কেন-ই বা বাঙালীদের বিরাট অংশ মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অত্যল্প কালের মধ্যে বাংলাতে মুসলিম সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করে।

এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য ঐতিহাসিক সমীক্ষার মধ্যে অন্বেষণ করা অনুচিত, তবে একথা বলতে পারি যে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি মনে রাখলে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের ফলে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়াগুলো বর্ণনা করা ও অনুধাবন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। উল্লিখিত প্রতিক্রিয়ার ধারা অনুসরণে এটা নিশ্চিতভাবে দেখা যায় যে আলোচ্য পর্বে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীদের মধ্যে একটা বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবাসীদের মধ্যে বিভেদ যে শুধু ধর্মের প্রশ্নেই এসেছে একথা ভাবা ভুল। ভারতবর্ষের বিশাল ও বিচিত্র ভৌগোলিক বিস্তৃতির মধ্যেও বিভেদ আছে, এখানকার জনোপকরণের মধ্যেও বিভেদ আছে আর তাছাড়া আর্থিক বিন্যাসের দরুন অনিবার্যভাবেই শ্রেণিগত বিভেদও বর্তমান।

ভৌগোলিক প্রসঙ্গে দেখা যায়, ভারতবর্ষের এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের বিচ্ছেদ এত দুস্তর যে তা স্বভাবতই বিভিন্ন প্রান্তবাসীদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিভেদ ঘটিয়েছে। সংস্কৃতভাষীরা যখন ভারতবর্ষে এল তখন ভারতবর্ষের আদিবাসীরা উত্তর ভারত ত্যাগ করে সংস্কৃতভাষীদের পক্ষে দুর্গম অঞ্চলগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরে দক্ষিণ ভারত হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের

সংস্কৃতি চর্চার প্রধান আশ্রয়স্থল এবং এর ফলে দাক্ষিণাত্য চেতনা আর আর্যাবর্ত চেতনা হিসেবে দুটি পৃথক চেতনা গড়ে ওঠে। এদিকে উত্তর ভারতে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে যে-ধর্মবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে তার পেষণে বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ব ভারতে এসে আশ্রয় সন্ধান করে। এর পর যখন ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দিল্লীতে সুলতানশাহী প্রতিষ্ঠা করে তখন সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির প্রধান ক্ষেত্র পরিণত হলো দক্ষিণ ভারত। আধুনিক কালে হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো দেখতে হলে যেমন দক্ষিণ ভারতে যেতে হয় তেমনই মুসলিম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো উত্তর ভারতেই প্রাপ্তব্য। নরতাত্ত্বিক বিভেদের প্রসঙ্গটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের উপজাতিদের, যাদের প্রচলিত অর্থে সাধারণত আদিবাসী বলা হয়, তাদের নিজস্ব ধর্মবোধ ও ধর্ম-বিশ্বাস আছে এবং সেই বোধ ও বিশ্বাসগুলো হিন্দু ধর্মের থেকে পৃথক, তবু উপজাতির আচার-বিশ্বাস থেকে হিন্দু ধর্মের বহু আচার-বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে বলে উপজাতিদের সামগ্রিকভাবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু হিন্দু সমাজের গঠন বিন্যাসে তাদের স্থান নিম্নে। এই গঠন বিন্যাস মূলত বর্ণভেদ প্রথার উপর রচিত। বর্ণভেদ প্রথা একটা অত্যন্ত জটিল বিষয় এবং সে-জটিলতার মধ্যে প্রবেশের অবকাশ এখানে নেই। শুধু এটুকু বলা যায় যে বর্ণভেদ প্রথা শুরু থেকেই হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছে, ফলে আধুনিক কালে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নিজেদের একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলে দাবি করে আর সে-দাবি আদমসুমারিতে ও পৃথক নির্বাচন প্রথাতে ক্রমশ স্বীকৃতি পায়। কিন্তু শুধু সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ক্ষোভ মেটেনি, বহু বছর ধরে বর্ণহিন্দুরা তাদের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে এসেছে তার প্রতি-ক্রিয়াতে তারা পুরোপুরি হিন্দু ধর্মের কবল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পৃথক ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। মনে রাখা ভালো যে একদা বর্ণহিন্দুদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়াতে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের একটা বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়ে যায়। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের মধ্যেই এমন কিছু আছে যা শুধু আকর্ষণ করে না, বিকর্ষণও করে যা কায়িক শ্রমজীবীদের অশুচি মনে করে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখে, যা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কলুষিত মনে করে বলে ইসলামে ধর্মান্তরিতদের হিন্দুকরণকে শুদ্ধি আন্দোলন নাম দিয়ে শ্লাঘা বোধ করে, যা ঔদ্ধত্যে স্ফীত ঘৃণায় পুষ্ট এবং হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এই প্রবল বিভেদকারী শক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া আছে শ্রেণিগত বিভেদের প্রশ্ন—এই প্রশ্নটা অবশ্য ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল সম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু

বর্তমান ভারতের যে-দুটি রাজ্যে মুসলিমদের সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেই কেরলা ও পশ্চিমবঙ্গে উক্ত শ্রেণী বিভেদের প্রশ্ন বিশেষ বিবেচ্য, কেননা বাংলা-ভাষী ও মালয়ালমভাষী ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আর্থিক শ্রেণী বিন্যাসে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রেণী বিভেদের প্রসঙ্গকে নিচে থেকে উপরে নিয়ে এলে দেখা যায়, সেখানে ধর্মের প্রশ্ন সর্বদা সমান গুরুত্ব লাভ করেনি—তাই দক্ষিণ ভারতের মুসলিম রাজ্যগুলো উত্তর ভারতের মুসলিম রাজ্যগুলোর কোনও রূপ নৈতিক বা ধর্মীয় বা রাষ্ট্রনৈতিক সমর্থন ও সাহায্য পায়নি, উপরন্তু বিরুদ্ধতা ও শত্রুতাই পেয়েছে এবং বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা এই দুটি মুসলিম শাসিত রাজ্য মারাঠাদের হাতে নয়, ধ্বংস হয়েছে স্বয়ং ঔরঙ্গজেবের হাতে, আবার পূর্ব ভারতে দেখি যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বাদশাহের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ঈশা খান হিন্দু ধর্মাবলম্বী কেদার রায়কে সাহায্য করেছেন। আবার দেখা যায়, শাসকের ধর্ম অনুসারে শাসিত সমাজের দারিদ্র্য ঘোচেনি বা নিম্নশ্রেণী কোনও উল্লেখযোগ্য স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হয়নি—ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রকট হওয়া সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে বিত্তবানরা বিত্তবানদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, আর বিত্তহীনরা মেলামেশা করেছে বিত্তহীনদের সঙ্গে এবং ধর্ম এখানে সামাজিকতার কোনও নতুন পথ খুলে দেয়নি দুটি অসম শ্রেণীতে। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে বিভেদের প্রশ্নে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব প্রয়োগের অবকাশ বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ।

আলোচ্য বিভেদের প্রশ্নে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অভিব্যক্তির প্রশ্ন অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। ভারতবর্ষের হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের অবলম্বনকারীরা আপন আপন ধর্মকে একান্তরূপে দেশজ সত্য বলে মনে করেছে এবং ওইসব ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা ভারতবর্ষের মৃত্তিকাজাত—ওইসব ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি একান্তরূপে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অভিব্যক্তির মধ্যে অমোঘ রূপে প্রোথিত, তাদের ভাষা, গল্পপুরাণ, সামাজিক আচারপ্রথা, নামকরণের প্রথা, খাদ্যাভ্যাস, রন্ধনপ্রণালী, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন অনুশাসনাদি, সম্পত্তিবিভাগের আইনকানুন পরস্পরকে সম্ভাষণের রীতি একান্তরূপই ভারতীয় এবং ভারতবর্ষের এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারা বহু শতাব্দী থেকে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের লোকজীবনে অনুসৃত হয়ে আসছে। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি আরব দেশে এবং সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে পারস্যে, আর তার ফলে ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আরব্য পারস্য

অভিমুখী থেকে গেছে—জীবনে একবার অন্তত হজ করা ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য, নমাজ পড়ার সময় কাবামুখী হয়ে নমাজ পড়া মুসলমানের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য, আরব-সন্তান মহম্মদকে নবী ও রসুল বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য, তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরানের ভাষা আরব্য ভাষা, তাদের গল্প-পুরাণের উৎস আরব্য-পারস্য গল্প-পুরাণ, তাদের নামকরণের ধারা আরব্য-পারস্য থেকে উৎসারিত, তাদের পারিবারিক অনুশাসনাদি, সম্পত্তি বণ্টনের রীতি ইত্যাদি সমস্তই আরব্য-পারস্য ঐতিহ্যের অনুসৃতি এবং সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির সম্বন্ধে তাদের উত্তরাধিকার-বোধ প্রধানত আরব ও ইরানের ঐতিহ্যেই সমৃদ্ধ। ভারতীয় মুসলিমদের সংস্কৃতি বিশেষভাবে বিদেশী সংস্কৃতি কর্তৃক প্রভাবিত এবং তার ফলে হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ-শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক চেতনার থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক চেতনা বহুলাংশেই পৃথক। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই দু ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা বিভেদ থেকে গেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অপেক্ষাকৃত নিম্নসমাজে বিভেদটা ততখানি প্রকট না হলেও তা যে অনেকখানি অনতিক্রম্য সেকথা সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়াই সমীচীন। এর ফলে মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক আনুগত্য কখনও কখনও দ্বিধাধিভক্ত, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা একান্তই আরব-ইরান প্রভৃতি বহির্ভারতীয় দেশের প্রতি অকুণ্ঠ ভাবে ধাবিত। তবে দু ধর্মাবলম্বীর এই সাংস্কৃতিক বিভেদ যে শুধু হিন্দু ও মুসলিমের ক্ষেত্রেই অনন্য তা মনে করার কারণ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের একটা প্রভাবশালী অংশ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যাভিমুখী হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ শাসনের থেকে স্বাধীনতা লাভের পরে উল্লিখিত পাশ্চাত্যাভিমুখিনতার প্রবণতা বেড়েছে বৈ কমেনি—তাই দেখা যায় এদেশের প্রাগ্রসর সমাজ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সন্তানসন্ততিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আগের চাইতে অনেক বেশি ব্যাকুল, এ সমাজ নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সময় ইংরেজী ভাষার ব্যবহারে অনেক বেশি তৎপর, এমনকি নিজেদের বর্ণদ্যোতক পদবীর শুদ্ধ উচ্চারণকে বিকৃত করে চ্যাটার্জি, মুখার্জি, বাসু, মিটার প্রভৃতি উচ্চারণদানে ক্রমশ অধিকতর অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বিদেশাভিমুখিনতা যে দেশ-বাসীর অংশ বিশেষের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং সেই অংশ বিশেষের পক্ষে প্রবণতাটি যে স্বাতন্ত্র্যের গৌরব লাভ করার একটা উপায়—এই সত্যটাকে স্বীকার করে নেওয়া ভালো। মনে রাখা ভালো যে এখানেও লোকসমাজের সঙ্গে প্রাগ্রসর সমাজের বিভেদের বীজ গোপনে অঙ্কুরিত হতে পারে। কিন্তু যে

বিভেদের ধারা দেশবাসীর একটা অংশ বিশেষের ক্ষেত্রে অকাট্য রূপে সত্য সেই ধারার অনুসরণের জন্যে একা মুসলিম সমাজকে অভিযুক্ত করাটাও অযৌক্তিক। তথাপি যে ভাবেই দেখা যাক, হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদ উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের অন্যতম কারণ হিসেবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে কাজ করেছে—এই অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করতেই হবে। সে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতেই হবে যে প্রভাবশালী তথা অপেক্ষাকৃত উচ্চ সমাজের আদর্শ শেষ পর্যন্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরে এবং নিম্নস্তরের একটা স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো সমাজের ভাগ্যবান শ্রেণীকে অনুকরণ করা, অনুকরণ করেই নিজেদের ভাগ্যবান শ্রেণীতে পরিণত করার প্রয়াস পাওয়া। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ভাগ্যহীন শ্রেণীর স্তরে ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয় ধর্মাবলম্বীর মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং সে-বিভেদের মূলকে রক্ষা করলে তা ক্রমশ উভয়ের মধ্যে বিভেদ ব্যবধানকে বিস্তৃত করে।

অর্থাৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিভেদ ছিল এবং আছে। কিন্তু একথাটা যেমন সত্য তেমনই এই কথাটাও অভ্রান্ত রূপে সত্য যে এই দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সমন্বয়ের সাধনা ছিল এবং যে পরিমাণেই হোক, সে সাধনা আছে। প্রকৃতপক্ষে সমন্বয়ের সাধনাটাই বিভেদের সবচাইতে বড়ো প্রমাণ, কারণ বিভেদের অস্তিত্ব আছে বলেই সমন্বয়ের প্রশ্নটা আসছে, বিভেদের ক্রিয়া রয়েছে বলে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে এবং যেখানে বিভেদ নেই সেখানে সমন্বয়ের প্রশ্নটাই তাৎপর্যহীন—একই বস্তুতে বস্তুতে সমন্বয় হয় না, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতেই সমন্বয় হয়। আর বিভেদ যেখানে স্বাভাবিক সেখানে স্বভাবের কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণের মধ্যে কোনও মহিমা নেই, সেখানেই মানুষের মহিমা যেখানে সে স্বভাবকে অতিক্রম করতে প্রয়াস পায়, যেখানে সে স্বভাবের বশে চালিত না হয়ে স্বভাবের ঊর্ধ্বে ওঠার জন্যে সাধনা করে। মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে ওই প্রয়াস ও সাধনা মানুষের এক মহিমান্বিত অনন্য রূপকে প্রকাশ করেছে। উচ্চতর সমাজে নানারূপ স্বার্থের সংঘাতে মানুষের ওই রূপ অনেকখানি ক্লিষ্ট, কিন্তু সাধারণ মানুষের সমাজে ধর্মে ধর্মে সমন্বয়ের সাধনা এমন এক শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল যা মানুষের অগ্রগতির সম্বন্ধে এক অপার সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। সাধারণ মানুষের স্তরে সমন্বয়ের এই সাধনা ভারতীয় লোকসত্যের এক অপরিহার্য ও প্রধান অঙ্গ। ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের শুরু থেকেই লোকসত্যের অন্তর্গত সমন্বয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দিল্লীতে রাজনৈতিক শক্তি

প্রতিষ্ঠার কাল থেকে প্রক্রিয়াটি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিভেদকে অস্বীকার করে নয়, বিভেদকে স্বীকার করেই সমন্বয়ের সাধনা। মনে রাখা উচিত যে বিভেদ সর্বদা বিরোধের সমার্থক নয় এবং এক্ষেত্রে তো নয়ই। এ গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া বিবৃত হয়েছে, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

এই সমন্বয় চলা কালেই বিদেশী রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্রিটিশের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা। দুটি পক্ষের সমন্বয় সাধনের পথে তৃতীয় পক্ষের আগমন পরিস্থিতির মৌল পরিবর্তন ঘটায় এবং ধীরে ধীরে সমন্বয়ের প্রক্রিয়াকেই স্তব্ধ করে দিতে থাকে। শুধু তাই নয়, এটাও দেখেছি যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে হিন্দু ও মুসলমান দলবদ্ধ ভাবে ধর্মীয় প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে হিংসা ও হত্যার পথ নেয়। প্রশ্নটা ছিল গো-রক্ষা সম্পর্কিত এবং গোরক্ষিণী সভার দাবি ছিল গো-হত্যা নিবারণ করা। তার ফল বর্ণনা করতে গিয়ে ১৮৯৩-র ২রা সেপ্টেম্বরের 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড স্টেটসম্যান'-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'monstrous vegetarian crusade, which sheds a great deal of blood in order that blood may not be shed.'

গো-হত্যা বন্ধ করার জন্যে নর-হত্যা দিয়েই ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা। আগেই বলেছি, এই দাঙ্গার পেছনে ছিল গোরক্ষিণী সভার আন্দোলন আর এই সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামী দয়ানন্দ যিনি স্বয়ং 'সত্যার্থ প্রকাশে'র ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে গোমাংস ভক্ষণের অভ্যাসের কথা লিখেছিলেন ও সেই অভ্যাসকে অনুমোদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংগ্রামশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে সংগঠন আন্দোলন শুরু করেন এবং যারা ইসলাম ধর্মান্তরিত হয়েছিল তাদেরকে শুদ্ধ করে হিন্দু সমাজের শামিল করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যায় গরিষ্ঠতর করার জন্যে শুরু করেছিলেন শুদ্ধি আন্দোলন, অথচ একদা যাঁর ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে এতটা মানবিকতা ছিল যে জামা মসজিদ থেকে তাঁর বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—এই দুজনেই স্পষ্টতই মানবিকতাবাদের পথ থেকে সরে এসে সাম্প্রদায়িকতাবাদের পথ নিয়েছিলেন এবং দুজনেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ একই প্রকৃতির।

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি বিভেদ নয়, তার ভিত্তি হলো বিরোধ, অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা-জাত বিরোধ। হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে বিরোধের

সম্পর্ক ক্রমশ সুস্পষ্ট ভাবে গড়ে উঠতে শুরু ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের পর থেকে। অচিরে তা প্রবল গতি ও শক্তি অর্জন করতে থাকে এবং দেশের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দাঙ্গা, ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী, হিংসা ও হত্যার আকার লাভ করতে থাকে। নিঃসন্দেহে ১৯০৯-এর পৃথক নির্বাচন প্রথা উক্ত উত্তেজনায় প্রচুর ইন্ধন যুগিয়েছে। এটা লক্ষণীয় যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তখনকার কালে ছিল শহর-কেন্দ্রিক অর্থাৎ যেখানে পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন শ্রেণীর প্রভাব অধিকতর সক্রিয় ছিল। দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধের প্রমাণ যখন অশিক্ষিত ও দরিদ্র শ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে অপেক্ষাকৃত কম তখন শহরাঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপ কেন বেশি সেটা ভেবে দেখা দরকার। বিভেদ তো ছিলই, সেই বিভেদ এমন ন্যক্কারজনক যে রবীন্দ্রনাথ তাকে একাধিকবার 'পাপ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গোহত্যার কথা শুনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা জিঘাংসায় উন্মত্ত হচ্ছে অথবা মসজিদের সামনে বাজনা শুনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা জিঘাংসায় উন্মত্ত হচ্ছে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি, এখন হঠাৎ কেন ঘটতে শুরু করল? কোন্ উপকরণের উপস্থিতিতে অথবা প্ররোচনায় বিভেদ রূপান্তরিত হলো বিরোধে? তবে কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জাগরণ প্রকৃতপক্ষে অসহিষ্ণুতা ও অসামঞ্জস্যের, বিদ্বেষের ও বিরোধের এক কথায় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জাগরণ? তাহলে আর কেন বলি যে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যথার্থ আধুনিক চিন্তাধারার জগতে প্রবেশ করল? এর অর্থ তো এই যে আধুনিক চিন্তাধারা সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক? তলিয়ে দেখলে মানতেই হবে, প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো উনবিংশ শতাব্দীর মহান জাগরণের নেপথ্যে অপরিসীম গ্লানির ও লজ্জার এক নাটকের মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং তার প্রকাশ দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই। নিরপেক্ষ আত্মসমীক্ষা করে এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে হবে যে কেন ওই জাগরণের কালেই বাঙালীদের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে পরিণত হলো সংখ্যালঘিষ্ঠে আর ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হলো (এই গ্রন্থের পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য)। সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র অবিকল বাংলার অনুরূপ না হলেও বাংলার দৃষ্টান্ত ভারতীয় জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর ইঙ্গিতবহ।

উনবিংশ শতাব্দীতে মহড়া দেওয়া নাটক প্রকাশ্যে মধ্যস্থ হলো বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু প্রথম দু দশকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেশের গভীরে বিশেষ

প্রবেশ করতে পারেনি তবে প্রবেশের প্রক্রিয়া যে শুরু হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ গয়ার দাঙ্গা। এর পরে দাঙ্গার প্রকোপ কমে যায় এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আদর্শও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন কায়েমী স্বার্থের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিহত হতে হতে ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছিল এবং চৌরিচৌরার ঘটনা সেই হিংস্রতার একটা চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। অতঃপর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বহুকাল ধরে চাপা পড়ে থাকা হিংস্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পথে। ইতিমধ্যে ১৯১৯-এর আইন বিভেদের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করে তুলেছিল। ১৯২২-এর পর থেকে জনসাধারণের স্তরেও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে যায়। দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক জিঘাংসাতে গান্ধীজী আপ্লুত হলেন গভীর পাপবোধে এবং সাম্প্রদায়িকতার পাপ-স্খালনের জন্যে এক আত্মশুদ্ধিমূলক অনশন পালন করলেন। এটা লক্ষণীয় যে—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ দুই পুরুষই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এক দুর্মর পাপের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজীর অনশনের ফল হলো খুবই সাময়িক এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শহর ও কায়েমী স্বার্থের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক আকারে বিস্তৃত হলো। একদিকে দেশের মধ্যে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধাবার ব্রিটিশ রাজনীতি অন্যদিকে মুসলিম লীগ ও হিন্দু-মহাসভার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ইন্ধন জোগাতে লাগল জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাতে। পৃথক নির্বাচন নীতির আবহে সংখ্যালঘুদের মনে জাগল গভীর শঙ্কা ও সন্দেহ। জিন্নার মতো অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন মুসলিম নেতারাও উল্লিখিত শঙ্কা ও সন্দেহের বশে ক্রমশ আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে সাম্প্রদায়িক দাবিদাওয়াকে কঠোর থেকে কঠোরতর করে তুললেন। রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজীর মতো পুরুষদের যুক্তি, বিচার ও বিবেচনাগুলো ভেসে যেতে লাগল সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের বন্যায়। রাজপক্ষ ও প্রজাপক্ষ সম্মিলিত ভাবে দেশের শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে—এই তত্ত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম উত্থাপন করেছিলেন রামমোহন রায় এবং উক্ত তত্ত্বের স্বীকৃতিতেই রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স আহূত হয়। কিন্তু রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স বিশ্ববাসীর সম্মুখে ভারতবাসীর কোন্ চিত্র তুলে ধরল? বিশ্ববাসী দেখল যে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্তির জন্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা ভারতবাসীর নেই, ভারতবর্ষের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিরোধ করতেই ব্যস্ত। বিশ্ববাসীর কাছে ভারতবাসীর আত্মকলহপরায়ণ চরিত্র

প্রদর্শনের পরে ব্রিটিশ রাজনীতি তাদের স্বার্থসম্মত রূপেই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করল, শ্বেত পত্র রচনা করল, ১৯৩৫-এর আইন প্রণয়ন করল এবং এভাবে ভারতবর্ষের অত্যন্ত অর্বাচীন সাম্প্রদায়িক সত্যকে একটা অনতিক্রম্য অমোঘ সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা করল।

ভূমিভিত্তিক কৃষিকেন্দ্রিক তথা গতিহীন মধ্যযুগীয় জীবনে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় ধর্মের যে বিপুল মূল্য ছিল সেটা কার্যকারণের স্বরূপ অন্বেষণে নিত্য উদ্যত আধুনিক জীবনে নিশ্চিতভাবে বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে; তদুপরি জড়-জগৎ ও জীব-জগৎ সম্বন্ধে যেসব তথ্য ধর্মশাস্ত্রগুলিতে দেওয়া হয়েছে একালের বিজ্ঞান সেসবগুলোকে কাল্পনিক বলে প্রমাণ করেছে এবং সৃষ্টি রহস্যের ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ টলিয়ে দিয়েছে; বিজ্ঞান যেভাবে এই যুগে ধর্মের মূলে আঘাত করেছে তাতে ধর্মের আনুষ্ঠানিক অংশ অর্থহীন হয়ে গেছে, যে অংশের যাথার্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে সেটা হলো আধ্যাত্মিক অংশ। প্রকৃতপক্ষে জাতিগত বা সমাজগত ভাবে ধর্মীয় প্রসঙ্গের মূল্যলোপ আধুনিকতার অন্যতম অব্যর্থ লক্ষণ। কিন্তু লক্ষণীয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘোর পরস্পর বিরোধী সত্য ও দ্বন্দ্বের মতো উপস্থিত, তাই তার যে পর্যায়টা মানবিকতাবাদে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায়, প্রাতিস্বিকতার উন্মেষে গৌরবান্বিত সেই পর্যায়ই আবার আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত আনুষ্ঠানিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় তৎপরতায় জর্জরিত; যেই যুগে বলা হয়েছে যে যত মত তত পথ সেই যুগেই এক ধর্মাবলম্বীরা অপর ধর্মাবলম্বীর খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের দাবিতে রক্তপাতে কুণ্ঠিত হয়নি এবং আর এক ধর্মাবলম্বীর রক্ত অপর ধর্মাবলম্বীর বাদ্যধ্বনিতে ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে হিংস্রতায়: এক ধর্মাবলম্বীদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে অন্য ধর্মাবলম্বীর অসহিষ্ণুতা ও স্পর্শকাতরতা অকস্মাৎ এই পর্যায়েই উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা লক্ষণীয় যে হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মাবলম্বীরাই এই পর্যায়ে ধর্মকে করে তুলেছে বৈষয়িক ও রাষ্ট্রনৈতিক অভিসন্ধি পূরণের প্রধান মূলধন আর এর জন্যে নানারূপ সংস্কারে জড়িত অনুষ্ঠানগুলিকে অধিকতর আড়ম্বরপূর্ণ করে সম্প্রদায় বিশেষের গৌরব বর্ধনের প্রয়োজন হয়েছে এবং, এর ফলে, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে, উদ্ভূত ঘটনাবলীতে ধর্মীয় প্রশ্ন যেমন একদিকে অস্বাভাবিক গুরুত্ব তেমনই অন্যদিকে অভিনব মাত্রা লাভ করেছে আর উক্ত গুরুত্ব ও মাত্রা লাভ করেছে আধুনিকতারই বিপরীতে।

কেমন করে এটা সম্ভব হলো?

নরতত্ত্ব ও সামাজিক বিন্যাস, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি

ক্ষেত্রে কমবেশি বিভেদ ভারতবর্ষের ইতিহাসের শুরু থেকেই ছিল বটে, তবে বিভেদকে সমন্বিত করার সাধনাই ছিল ভারতবর্ষের লোকসত্য, কিন্তু লোক-জীবনের উর্ধ্বে সম্মানিত মুষ্টিমেয়র স্তরে বিভেদের প্রবণতাও একটি অকাট্য সত্য এবং উল্লিখিত স্তরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যে-বিভেদ তার মধ্যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌল পার্থক্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ—উচ্চতর সমাজ নিম্নতর সমাজকে যতটুক প্রভাবিত করতে পারে তার দৌরাত্ম্যেই লোকজীবনের স্তরেও এই বিভেদের অস্তিত্ব ছিল, প্রকৃতপক্ষে লোকজীবনে সমন্বয় সাধনার অনেকখানিই নিয়োজিত হয়েছিল উক্ত সাংস্কৃতিক বিভেদের মধ্যে সাযুজ্যের অন্বেষণে। এখানে একথাটা স্পষ্ট করে বলা উচিত যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে বিভেদের শক্তির চাইতে লোকসত্য হিসেবে সমন্বয়ের শক্তিটাই ছিল অধিকতর প্রবল।

সমন্বয়ের ওই লোকসত্য যখন ক্রমশ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছিল তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক শক্তির আগমন এবং তা অচিরেই আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে বাধা পেয়ে আবিষ্কার করে যে দেশীয় স্বার্থগুলোর সমন্বিত শক্তিকে ধ্বংস করতে না পারলে এদেশে নিজেদের কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন সফল হতে পারে না ; উপরন্তু পাশ্চাত্য রাজনৈতিক শক্তির চতুর দৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে পাশ্চাত্য ভাষায় ও ভাবনায় শিক্ষিত সম্প্রদায় আদর্শ ও জীবিকার আকর্ষণে ক্রমশ সব দিক থেকেই ভারতবর্ষের লোকজীবন তথা লোক-সত্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আর সেসঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সমন্বয়ের সাধনার ধারা থেকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকেও এবং এই সত্য অনুধাবনের পরে ব্রিটিশ শক্তি মনোনিবেশ করল উক্ত অগ্রসর সমাজের বিচ্ছিন্নতার সদ্ব্যবহারে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থান দমন করে ব্রিটিশ শক্তি প্রথমে লোকজীবনের সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরই প্রীতি ও পক্ষপাত উৎপাদনে সচেষ্ট হয়—বিরানব্বই বছর আগে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষণার্থে যেমন এক জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়েছিল এবারে তেমনই জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু যখন ব্রিটিশ স্বার্থকে সমর্থন করার বিনিময়ে চাকুরি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সুবিধার জন্যে কংগ্রেস চাপ দিতে লাগল তখন বিরক্ত হয়ে ও কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শক্তির অনুগত ও ব্রিটিশ স্বার্থের রক্ষাকারী হিসেবে অগ্রসর মুসলিম সমাজকে গড়েপিঠে একটা শক্তিশালী সম্প্রদায় করে তুলতে উদ্যোগী হয় এবং একবার যখন ব্রিটিশরা হৃদয়ঙ্গম করল যে পাশ্চাত্য

শিক্ষার পথে উন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সহজ তখন তারা জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন তথা লোকসত্যের থেকে নিঃসম্পর্ক বিত্তবান মুসলিমদের প্ররোচিত করল মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বার্থবোধ জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে। এই সময় থেকে সমন্বয়ের শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যেতে থাকে আর প্রবল হয়ে উঠতে থাকে বিচ্ছেদের শক্তি।

একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ভাষায় ও ভাবনায় শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণী ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোকজীবনের তথা লোকসত্যের থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের আদর্শে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করতে লাগল তেমনই অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের উৎসাহে প্রতিপত্তিশালী মুসলিম শ্রেণী সমস্ত উদ্যম প্রয়োগ করল ভারতীয় লোকসত্যের থেকে সাধারণ মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করে নিতে এবং তাদের এই উদ্যমের ভিত্তি হলো পৃথক নির্বাচন প্রথা আর এই পৃথকীকরণের বিন্যাস হলো সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনুসারে, ফলে জল যেমন গড়িয়ে চলে নিচের দিকে তেমনই ব্রিটিশ সংসর্গে বসবাসকারী অগ্রসর শ্রেণীর দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা গড়িয়ে নামল জনসাধারণের জীবনে আর এই প্রক্রিয়াতে যেমন অনেকখানি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল তেমনই অনেকখানি ছিল আরোপিত ব্যাপার। অনুঘটক রূপে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির প্রতিক্রিয়ায় বিভেদ ক্রমশ রূপান্তরিত হতে থাকে বিরোধে এবং এই রূপান্তর একটা মাত্রাগত পরিবর্তন নয়, এটা নিশ্চিত রূপেই একটা গুণগত পরিবর্তন।

এই পরিস্থিতিকে আরও সংকটজনক করে তুলল ব্রিটিশ শক্তি কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রদত্ত ভারতবাসীর সম্মুখে প্রতিনিধিত্বমূলক বা দায়িত্বশীল বা গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ত শাসনের আশ্বাস বা প্রলোভন, কেননা উভয় সম্প্রদায়ের অগ্রসর সমাজ-ই এটা বুঝতে পারে যে স্বায়ত্তশাসন লাভ করলে তারাই ক্ষমতার অধিকারী হবে আর নিজেরা ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হয়ে দেশের লোকসত্যের আদর্শ দূরে থাক, তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করল অনায়াসে,—অন্যদিকে গান্ধীজীর আহ্বানে সাময়িক ভাবে বিশেষত পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে তো বটেই, সমগ্রত ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গেও সহযোগিতার নীতি বর্জিত হয়, কিন্তু অসহযোগিতার নীতি প্রত্যাহৃত হওয়ার অব্যবহিত পরেই উল্লিখিত বিভেদগুলো পুনরায় ভয়ঙ্কর বিরোধের আকার ধারণ করে এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের কায়েমী স্বার্থকে নিরাপদে রক্ষা করা ব্রিটিশের পক্ষে সহজতর হয়।

তাহলে এক কথায় বলা যায়, ভারতীয় লোকসত্যের থেকে অগ্রসর শ্রেণীর বিচ্ছেদ, ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উক্ত শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী-বৃত্তির অধিকতর অভিব্যক্তির প্রচেষ্টা এবং ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্যে প্রযুক্ত ব্রিটিশ রাজনীতির মর্মান্তিক পরিণতি হলো আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে বিভেদ থেকে বিরোধের উৎপত্তি। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে বিভেদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সমন্বয়ের সাধনাই ছিল প্রবলতর, কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির প্রতি-ক্রিয়ায় হিন্দু ও মুসলিমের সম্পর্ক মাত্র বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক বিদ্বেষ ও বিরোধের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একালের এই বিরোধ যতই গভীর ও প্রশস্ত হোক-না কেন তা যে সার্বভৌম সত্য নয় এবং কালোমেঘের রূপালী পাড়ের মতোই সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া যে কোনও সময়ই সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়নি একথা না বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না। সবশেষে বলা দরকার যে একবার যে-লোকজীবন সুযোগসন্ধানী অগ্রসর শ্রেণীর সংক্রামে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধিতে জর্জরিত হয়েছে তার হৃতস্বাস্থ্য ও হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে চাই নির্মল ও নির্মোহ আত্মসমীক্ষা এবং যেমন সুপরিকল্পিত উদ্যমে তার অন্তর্গূঢ় সত্যকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে তেমনই সুপরিকল্পিত উদ্যমে তাকে পুনর্বাসনের অটল প্রতিজ্ঞা।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট (ক)

১৯৩১-এর আদমসুমারি অনুসারে একনজরে ভারতবর্ষের ধর্মীয় চিত্র

(দশলক্ষের হিসাবে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে)

	হিন্দু	মুসলিম	বৌদ্ধ	খ্রীস্টান	শিখ	উপজাতি ও অন্যান্য ধর্মনীতি
ব্রিটিশ ভারতবর্ষ—	১৭৭.৭	৬৭	১২.৭	৩.৯	৩.২	১৬.৮
দেশীয় রাজ্য—	৬১.৫	১০.৭	.১	২.৪	১.১	৫৫
প্রধান প্রদেশগুলো						
বাংলা—	২১.৬	২৭.৫	.৩	.২	—	.৩
বিহার ও ওড়িশা—	৩১	৪.২	—	.৩	—	২
বোম্বাই—	১৬.৬	৪.৫	—	.৩	—	.৫
বর্মা—	.৬	.৬	১২.৩	.৩	—	১.৪
মধ্যপ্রদেশ—	১৩.৩	.৭	—	—	—	১.৪
মাদ্রাজ—	৪১.৩	৩.৩	—	১.৭	—	.৪
পাঞ্জাব—	৬.৩	১৩.৩	—	.৪	৩.১	.৪
যুক্তপ্রদেশ—	৪০.৯	৭.২	—	.২	—	.১
আসাম—	৪.৯	২.৮	—	.২	—	.৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—	.১	২.২	—	—	—	—

পরিশিষ্ট (খ)

এক নজরে শ্বেতপত্র অনুসারে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ

	মোট	সাধারণ (হিন্দু)	সাধারণ (অনুন্নতদের জন্যে সংরক্ষিত)	মুসলিম	ইউরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়	অন্যান্য ধর্মাবলম্বী	বিশেষ আসনচয়
ফেডেরল অ্যাসেম্বলি (ব্রিটিশ ভারতবর্ষ)	২৫০	৮৬	১৯	৮২	১২	১৪	৩৭
প্রভিন্সিয়ল লেজিসলেচর							
বাংলা	২৫০	৫০	৩০	১১৯	১৫	২	৩৪
বোম্বাই	১৭৫	১০৪	১৫	৩০	৫	৪	১৭
যুক্তপ্রদেশ	২২৮	১২৪	২০	৬৬	৩	২	১৩
মাদ্রাজ	২১৫	১২২	৩০	২৯	৫	১০	১৯
পাঞ্জাব	১৭৫	৩৫	৮	৮৬	২	৩৪	১০
বিহার	১৫২	৭৪	১৫	৪০	৩	৮	১২
মধ্যপ্রদেশ	১১২	৬৭	২০	১৪	২	১	৮
আসাম	১০৮	৪১	৭	৩৪	১	১০	১৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৫০	৯	—	৩৬	—	৩	২
সিন্ধু	৬০	১৯	—	৩৪	২	—	৫
ওড়িশা	৬০	৪২	৭	৪	—	৩	৪

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বলতে শিখ, ভারতীয় খ্রীস্টান এবং অনুন্নত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের বোঝানো হয়েছে। বিশেষ আসনচয় বলতে বোঝানো হয়েছে শ্রমিক, ভূস্বামী, বণিক প্রভৃতিদের। সিন্ধু এবং ওড়িশা—এই দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হবে বলে স্থির হয়।

পরিশিষ্ট (গ)

১৯৩৫-এর আইন অনুসারে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কাউন্সিল অফ স্টেটের গঠন বিন্যাস

প্রদেশ বা সম্প্রদায়	মোট	সাধারণ	তপশীল-ভুক্ত শ্রেণী	শিখ	মুসলিম	নারী
মাদ্রাজ—	২০	১৪	১	—	৪	১
বোম্বাই—	১৬	১০	১	—	৪	১
বাংলা—	২০	৮	১	—	১০	১
যুক্তপ্রদেশ—	২০	১১	১	—	৭	১
পাঞ্জাব—	১৬	৩	১	৪	৮	১
বিহার—	১৬	১০	—	—	৪	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	৮	৬	১	—	১	—
আসাম—	৫	৩	১	—	২	—
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—	৫	১	—	—	৪	—
ওড়িশা—	৫	৪	—	—	১	—
সিন্ধু—	৫	২	—	—	৩	—
ব্রিটিশ বালুচিস্তান—	১	—	—	—	১	—
দিল্লী—	১	১	—	—	—	—
আজমীর—	১	১	—	—	—	—
কুর্গ—	১	১	—	—	—	—
গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নির্বাচিত—	৬	—	—	—	—	—
ইঙ্গ-ভারতীয়—	১	—	—	—	—	—
ইয়োরোপীয়—	৭	—	—	—	—	—
ভারতীয় খ্রীস্টান—	২	—	—	—	—	—
মোট—	১৫৬	৭৫	৬	৪	৪৯	৬

পরিশিষ্ট (ঘ)

১৯৩৫-এর আইন অনুসারে বৃটিশ ভারতবর্ষের হাউস অফ অ্যাসেম্বলির গঠন বিন্যাস

প্রদেশ	মোট আসন	সাধারণ মোট আসন	সাধারণ তপশীলদের জন্য সংরক্ষিত আসন	শিখ	মুসলিম	ইঙ্গভারতীয়	ইয়োরোপীয়	ভারতীয় খ্রীষ্টান	বাণিজ্য ও শিল্প	জমিদার	শ্রম	নারী
মাদ্রাজ	৩৭	১৯	৪	—	৮	১	১	৩	২	১	১	২
বোম্বাই	৩০	১৩	২	—	৬	১	১	১	৩	১	২	২
বাংলা	৩৭	১০	৩	—	১৭	১	১	১	৩	১	২	১
যুক্তপ্রদেশ	৩৭	১৯	৩	—	১২	১	১	১	—	১	১	১
পাঞ্জাব	৩০	৬	১	৯	১৪	—	১	১	—	১	১	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৫	৯	২	—	৩	—	—	—	—	১	১	১
বিহার	৩০	১৬	২	—	৯	—	১	১	—	১	১	১
আসাম	১০	৪	১	—	৩	—	১	১	—	—	১	—
উঃ পঃ সীঃ প্রদেশ	৫	১	—	—	৪	—	—	—	—	—	—	—
ওড়িশা	৫	৪	১	—	১	—	—	—	—	—	—	—
সিন্ধু	৫	১	—	—	৩	১	—	—	—	—	—	—
ব্রিটিশ বালুচিস্তান	১	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—
দিল্লী	২	১	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—
আজমীর	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কুর্গ	৬	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
অ-প্রাদেশিক আসন	৪	—	—	—	—	—	—	—	৩	—	১	—
মোট	২৫০	১০৫	১৯	৯	৮২	৪	৮	৮	১১	৭	১০	৯

পরিশিষ্ট (ঙ)

১৯৩৫-এর আইন অনুসারে প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের গঠন-বিন্যাস

প্রদেশ	মোট আসন	সাধারণ আসন	মুসলিম আসন	ইয়োরোপীয় আসন	ভারতীয় খ্রীষ্টানদের আসন	লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি কর্তৃক পূরণীয় আসন	গভর্নর কর্তৃক পূরণীয় আসন
মাদ্রাজ	৫৪-র কম নয় ৫৬-র বেশি নয়	৩৫	৭	১	৩	—	৮-এর কম নয় ১০-এর বেশি নয়
বোম্বাই	৫৪-র কম নয় ৫৬-র বেশি নয়	২০	৫	১	—	—	৩-এর কম নয় ৪-এর বেশি নয়
বাংলা	৬৩-র কম নয় ৬৫-ব বেশি নয়	১০	১৭	৩	—	২৭	৬-এর কম নয় ৮-এর বেশি নয়
যুক্তপ্রদেশ	৫৮ র কম নয় ৬০-র বেশি নয়	৩৪	১৭	১	—	—	৬-এর কম নয় ৮-এর বেশি নয়
বিহার	২৯-র কম নয় ৩০-ব বেশি নয়	৯	৪	—	—	১২	৩-এর কম নয় ৪-এর বেশি নয়
আসাম	২১-র কম নয় ২২-র বেশি নয়	১০	৬	২	—	—	৩-এর কম নয় ৪-এর বেশি নয়

পরিশিষ্ট (চ)

১৯৩৫-এর আইন অনুসারে প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির গঠন বিন্যাস

প্রদেশ	মোট আসন	মোট সাধারণ আসন	তপসীলভুক্ত শ্রেণীর জন্যে সংরক্ষিত আসন	অনুন্নত অঞ্চল ও উপজাতিদের আসন	শিখ	মুসলিম	ইঙ্গ-ভারতীয়	ইয়োরোপীয়	ভারতীয় খ্রীস্টান	বাণিজ্য, শিল্প খনি, যোজনা	জমিদার	বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রম					
														সাধারণ	শিখ	মুসলিম	ইঙ্গ-ভারতীয়	ভারতীয় খ্রীস্টান
মাদ্রাজ	২১৫	১৪৬	৩০	১	—	২৮	২	৩	৮	৬	৬	১	৬	৬	—	১	—	১
বোম্বাই	১৭৫	১১৪	১৫	১	—	২৯	২	৩	৩	৭	২	১	৭	৫	—	১	—	—
বাংলা	২৫০	৭৮	৩০	—	—	১১৯	৩	১১	২	১৯	৫	২	৮	২	—	২	১	—
যুক্তপ্রদেশ	২২৮	১৪০	২০	—	—	৬৪	১	২	২	৩	৬	১	৩	৪	—	২	—	—
পাঞ্জাব	১৭৫	৪২	৮	—	৩১	৮৪	১	১	২	১	৫	১	৩	১	১	২	—	—
বিহার	১৫২	৮৬	১৫	৭	—	৩৯	১	২	১	৪	৪	১	৩	৩	—	১	—	—
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১১২	৮৪	২০	১	—	১৪	১	১	—	২	৩	১	২	৩	—	—	—	—
আসাম	১০৮	৪৭	৭	৯	—	৩৪	—	১	১	১১	—	—	৪	১	—	—	—	—
উঃ পঃ সীমান্ত-প্রদেশ	৫০	৯	—	—	৩	৩৬	—	—	—	—	২	—	—	—	—	—	—	—
ওড়িশা	৬০	৪৪	৬	৫	—	৪	—	—	১	১	২	—	১	২	—	—	—	—
সিন্ধু	৬০	১৮	—	—	—	৩৩	—	২	—	২	২	—	১	১	—	১	—	—

পরিশিষ্ট (ছ)

কৌতূহলীদের জন্য আরও কয়েকটি রচনা

Abdul Latif, Sayyid	An Outline of the Cultural History of India.
Ahmad, Aziz	Studies in Islamic Culture in Indian Environment
Arberry, A. J.	Sufism ; text and tr. The Koran Interpretated
Ahmad, Maqbul	Arabs in India.
Ahmed, Imtiaz	Muslims in India.
Ali, A Yusuf	Cultural History of India During the British Period
Ashraf, K. M.	Life and Conditions of the People of Hindusthan (reprinted from the Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol 1. 1935)
Ambedkar, B. R.	Pakistan or the Partition of India
Adhikary, G	Pakistan and National Unity
Beveridge, H	tr. Akbarnamah by Abul Fazl
Binyon, Laurence	Akbar ; Court painters of the Grand Mughals
Blochmann and Garett	tr. Ain-i-Akbari by Abul Fazl
Bose, M. M.	Post-Chaitanya Sahajiya Cult of Bengal
Brown, Percy	Indian Architecture : Islamic Period ; Indian Painting under the Mughals
Carpenter, J. E.	Theism in Medieval India
Chatterji, Dr S. K.	The Origin and Development of the Bengali Language ; Indianism and Indian Synthesis ;

	Al-Biruni and Sanskrit (in Al-Biruni Commemoration Volume) ;
	Islamic Mysticism : Iran and India (in Indo-Iranica)
	Irianianism ;
	Kirata-Jana-Kriti
Chowdhuri, S. B.	Civil Disturbances During the British Rule in India (1765-1857) ;
	Civil Rebellion in the Indian Mutunies ;
	Theories on the Indian Mutiny.
Crooke, W.	Islam in India
Dey, Amalendu	Roots of Separatism in the Ninteenth Century Bengal
Elliot and Dowson	ed & tr. History of India as Told by Its Own Historians, 8 vols (see specially vol II's Appendix : 'Mahmud's Expedition in India')
Fergusson, A	History of Indian and Eastern Architecture
Garatt, G. T.	ed. The Legacy of India ;
Guillaume, A	ed. The Legacy of Islam ;
	The Life of Mahammad ;
	Islam
Ghosh, Dr. P. C.	Indian National Congress (1892-1909)
Hunter, W. W.	The Indian Mussalmans ;
	Annals of Rural Bengal
Husain, W.	Conception of Divinity in Islam and Upanishad.
Hodivala, S. H.	Studies in Indo-Muslim History 2 vols.
Islam, Mustafa Nurul	Muslim Public Opinion as Reflected in Bengali Journals (Bangla Academy)

Kalhan	Rivers of Kings (Foreword by J. Nehru)
Kerala History Association and Cochin Synagogue Quarter Centenay Celebration Committe Krishna, K. B.	Commemoration Volume, The Cochin Synagogue 400th Anniversory Celebrations. The Problem of Minorities in India.
Kothari, Komal	Monograph on Langas
Lewis, Bernerd	Islam in History
Marx and Engels	The First Indian War of Independece.
Mazumdar. Dr. R. C.	ed. The History and Culture of the Indian people vols IV, V, VI, IX, X and XI ; History of the Freedom Movement in India 3 Vols : ed. History of Bengal Vol I
Mehta, A.	1857 : The Great Rebellion
Mukerji, Hiren.	India's Struggle for Freedom
Nicholson, R. A.	Studies in Islamic Mysticism
Nehru, J.	Autobiography ; The Discovery of India
Oman, J. C	Mystics, Ascetics and Saints of India
Pal, B. C.	Memoirs of My Life and Times
Prasad, Iswari.	History of Medieval India
Patwardhan, A and Mehta, A	The Communal Triangle in India
Picthall, Marmaduke	Text and tr. The Meaning of the Glorious Quran
Rahman, Dr. Hussainur	Hindu-Muslim Relation in Bengal (1905-1947)
Rolinson, M.	Islam and Capitalism
Rajendraprasad	Divided India
Raychowdhury, Tapan	Bengal Under Akbar and Jahangir
Sachau, E. C.	tr. Al-beruni's India (Kitab ul Hind of Al-biruni)

Saraswati, S. K.	Muslim Architecture in Bengal (in Journal of the Indian Society of Oriental Art Vol X)
Sarkar, Sir J. N.	ed. History of Bengal Voll II ; A Short History of Aurangzeb; Shivaji and His Times ; Mughal Administration ;
Sen, D. N.	The Problem of Minorities
Shah, K. T	Why Pakistan and Why not ?
Sarkar, Jagadish Narayan	Islam in Bengal.
Sharkir, Dr Moin	Secularisation of Muslim Behavirour ; Khilafat to Partition
Sinha, U. K.	Secularism in India
Smith, W. Cantwell	Modern Islam in India ; The Muslim League
Tagore, Rabindranath	Sadhana ; The Religion of Man ; Personality ;
Tarachand	Influence of Islam on Indian Culture
Thapar, Romila	A History of India (A Pelican book)
Thomas, F. W.	Mutual Influence of Mohammedans and Hindus in India
Titus, M. T.	Indian Islam
Watt, W. M.	Faith and Practice of Al-Ghazali
Wellesz, E	Akbar's Religious Thought Reflected in Mogul Painting
Williams, John A.	ed. Islam (an extensive selection of writings from the legalists, theologians and mystics of Islam)
Wise, James	Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal
Walt, M.	The Majesty That Was Islam
Yule, H and Cordier, H.	Cathay and the Way Thither of Ibn Batutah (Apart from this one there are several other English translations of the book by Ibn Batutah)

কাজী আবদুল ওদুদ—শাশ্বত বঙ্গ ;
বাংলার জাগরণ
ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার বাউল ;
বাংলার সাধনা ;
হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা ;
ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—বাংলার লৌকিক দেবতা
দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ;
বৃহৎ বঙ্গ
নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পা : ধর্মপূজা বিধান
পঞ্চানন মণ্ডল—চিঠিপত্রে সমাজচিত্র
প্রমথ চৌধুরী—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু মুসলমান
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া
বিপিনচন্দ্র পাল—নবযুগের বাংলা
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
মৌলানা আবু তাহের—কোরাণ বঙ্গানুবাদ ৫ খণ্ড
রমেশচন্দ্র মজুমদার—সম্পা : বাংলা দেশের ইতিহাস ২ খণ্ড
রাজ্যেশ্বর মিত্র—মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা
শঙ্কর সেনগুপ্ত—বাঙালী জীবনে বিবাহ
শিবশঙ্কর মিত্র—সুন্দরবনে আর্জান সর্দার
সুকুমার সেন—সম্পা : সেক শুভোদয়া ;
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৫ খণ্ড ;
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী
সুখময় মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ;
কৃত্তিবাস-পরিচয় ;
বাংলা সাহিত্যের কালক্রম
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য ;
সাংস্কৃতিকী ২ খণ্ড

(এ ছাড়া ভবন বাণী ১০৯ রাণীকটরা. লখনৌ থেকে প্রকাশিত কোরান শরীফ-এ মূল আরবীর সঙ্গে হিন্দীতে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।)

কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থ

কাঁদো, প্রিয় দেশ—অন্নদাশঙ্কর রায়

শিক্ষার সঙ্কট— ঐ

সাহিত্যের সঙ্কট— ঐ

ভাষার মূল্যায়ন—পুণ্যশ্লোক রায়

বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ—অমিয় কুমার সেন

অর্দ্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার—শঙ্কর ভট্টাচার্য

বাণী কল্যাণী—রজনীকান্ত সেন

বাঙ্গালীর নাট্যচর্চা—অহীন্দ্র চৌধুরী